কৃপাকুসুমাঞ্জলি

Vrindavan Das
Govind Kund, Vrindavan
Nityananda Baba Ashram

শ্রীভাগবতস্বামী

কৃপাকুসুমাঞ্জলি

ওঁ ভাগবত পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ রাধিকানাথ বিষ্ণুপাদানুগত

ভাগবত পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমদ্ গৌরগোবিন্দ ভাগবতস্বামী

বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক রচিত

তৃতীয় সংস্করণ

১৩৬১ সাল

মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র

বিষয়ঃ

হরিতুষ্টিঃ পরো ধর্ম্মঃ সদাচারঃ শুচির্ম্মতা ।
সত্যে ক্বচিদ্ভয়ং নাস্তি নাস্তি পুণ্যং দয়া সমম্ ॥

নাস্তি হিংসা সমং পাপম্ অহিংসা পরমন্তপঃ ।
হিংসাবিধিবিবেকশ্চ পাপপুণ্যনিরূপণম্ ॥

কলুষঘ্নমমাৎসর্য্যং ক্ষমা চেতোবিশোধনী ।
বিনয়ো ভূষণশ্রেষ্ঠে দৈন্যং গর্ব্বারিমর্দ্দনম্ ॥

সৎসঙ্গাৎ জায়তে শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা বিশ্বাস উচ্যতে ।
অসৎসঙ্গঃ পরিত্যাজ্যঃ শ্রদ্ধাতঃ শরণাগতিঃ ॥

গুরুপাদাশ্রয়ো দীক্ষা গুরুসেবা পরং ফলম্ ।
কীর্ত্তনং সাধনশ্রেষ্ঠং গোপীভাবঃ প্রয়োজনম্ ॥

প্রীতি র্ভগবতঃ সর্ব্বনৃণাং হ্যর্থপরা মতা ।
চিদানন্দময়ী ভক্তিঃ র্ভগবতঃ প্রকাশিকা ॥

অখণ্ডপরমানন্দরসাস্বাদনতৎপর-
গৌরাকৃতিপরব্রহ্মশ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥

সূচীপত্র



শ্রীগৌরগোবিন্দানন্দ ভাগবতস্বামী—

শ্রীশ্রীগুরুচরণকমলেভ্যো নমো নমঃ

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীভগবৎকারুণ্যঘনবিগ্রহ শ্রীভগবদভিন্নতনু শ্রীগুরুদেব জীবের দুঃখে কাতর হইয়া তাহাকে পরমানন্দ দানে কৃতকৃতার্থ করিবার জন্য অনাদি কাল হইতে এই পৃথিবীতলে বিচরণ করিয়া আসিতেছেন। কোনও অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যের ফলে তাঁহারই চরণতলে বসিয়া জীবনের কতকগুলি শুভ মুহূর্ত্ত অতিবাহিত করিতে পারিয়াছি। "অপারকরুণা-পারাবার," "পতিতজনৈকবন্ধু", "কোটিমাতৃস্নেহশীতলহৃদয়" প্রভৃতি যে সমস্ত গুণের কথা শ্রীগুরুপাদপদ্ম সম্বন্ধে শ্রবণ করা যায় তাহা সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছি। যদ্যপি পুঞ্জীভূত দুর্দ্দৈববশতঃ আমার কামকলুষাচ্ছন্ন নিরতিশয় পাপপঙ্কিল হৃদয়ের মলিনতা আদৌ দূরীভূত হয় নাই তথাপি যখনই সেই শুভ মুহূর্ত্তগুলির কথা স্মরণ হয় তখন মনে হয় অন্ততঃ সেই সেই মুহূর্ত্তের জন্য আমি সত্য সত্যই পরম পবিত্র হইয়াছিলাম, আমার চির তমসাচ্ছন্ন জীবনে বিদ্যুতের মত পরমানন্দ ক্ষণিক ক্রীড়া করিয়াছিল।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম সমীপে অবস্থান করিয়া শ্রীমুখকমলনিঃসৃত সুধামধুর শ্রীভাগবতীয় কথা যখন শ্রবণ করিতাম তখন অনেক সময় ইচ্ছা হইত যে পরাবিদ্যার পরম রহস্যোদ্ঘাটক এই সমস্ত উপদেশ যদি গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইত তাহা হইলে পরমমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিগণের বিশেষ উপকার হইত, পরন্তু মাদৃশ হতভাগ্য জনেরও আশ্রয়ের একটি বস্তু থাকিত। এইরূপ ইচ্ছা যে কেবলমাত্র আমারই ছিল তাহা নহে, গুরুভ্রাতাদিগের মধ্যে অনেকেরই প্রবল ইচ্ছা ছিল। পরম করুণাময় অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদের সেই ইচ্ছা পূরণ করিলেন। পরাবিদ্যার অভিনব নিপুণ শিল্পী অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব সন্নিবেশ করিয়া অপূর্ব্ব কুসুম সমূহ রচনা করিলেন এবং সমস্তই তদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা প্রসূত মনে করিয়া পরম মর্য্যাদা প্রকটন পূর্ব্বক কুসুমগুলি শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া এক একটি নির্ম্মাল্য পরমস্নেহে আমাদিগকে প্রদান করিলেন। শ্রীপাদপদ্মে আমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ কোনও দিনই শোধ যাইবে না, তবে এই নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া যদি শ্রীপাদপদ্মকৃপাবলে রক্ষা করিতে পারি তাহা হইলেই এই মনুষ্য জীবন পরম কৃতার্থ হইল মনে করিব।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমাশ্রিত প্রাচ্যবিদ্যায় পারদর্শী পাশ্চাত্যবিদ্যানিপুণ উচ্চশিক্ষিত সাধন-পরায়ণ সুযোগ্য বহু গুরুভ্রাতা বর্ত্তমান থাকিলেও এই গ্রন্থ প্রকাশের গুরুভার শ্রীগুরুপাদপদ্ম মাদৃশ নিতান্ত অসমর্থ জনের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার অপরিসীম স্নেহ এবং

পরম স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক এবং গুরুভ্রাতাদিগেরও পরম স্নেহের নিদর্শন। প্রদীপ জ্বলিলে চতুর্দ্দিকের অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া তাহার নিম্নদেশ আশ্রয় করে। এই পরাবিদ্যার স্নিগ্ধ আলোকের ছটায় দিগ্‌বিদিক্ উদ্ভাসিত হউক, তাহার নিম্নদেশে মূর্ত্ত অন্ধকার রূপেও আমি নিজেকে পরম কৃতার্থ মনে করিব যদি কেহ কুসুমসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া এই অপূর্ব্ব আলোকে শ্রীভগবৎকরুণা—শ্রীসাধুগুরুকরুণার পথে পদনিক্ষেপ করিতে পারেন।

পরমার্থেচ্ছু সুধীজন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এই গ্রন্থ আলোচনা করিলে ইহা হইতে শিক্ষণীয় অনেক বস্তু লাভ করিবেন বলিয়া মনে করি। জীবনে অনুভূত অনেক সাধু মহাপুরুষের অলৌকিক পূত চরিত্রাবলীর সহিত গ্রন্থকৃৎশ্রীগুরুদেব পরিচিত থাকিলেও অসামান্য সংযম বলে তাহা এই গ্রন্থে সন্নিবেশ করেন নাই। সাধারণ জনেরও চিত্তবৃত্তি যে সকল শিক্ষাবলে ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া শ্রীভগবদ্ভক্তি লাভে কৃতার্থ হইতে পারে সেই সকল শিক্ষামূলক উপদেশই মাত্র এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, অলৌকিক ঘটনাবলীর দ্বারা এই গ্রন্থ ভারাক্রান্ত হয় নাই।

এই গ্রন্থ প্রকাশে যাঁহারা অর্থাদি দ্বারা নানাপ্রকারে উৎসাহিত করিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে স্বাধীন ত্রিপুরার হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বাবু, আণ্ডার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বাবু, শ্রীযুক্ত হরিদাস বাবু এবং স্বাধীন ত্রিপুরার ৺মহারাজাধিরাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র প্রিন্স্ শ্রীলশ্রীযুক্ত রণবীর কিশোর দেব বর্ম্মা কর্ত্তা বাহাদুর প্রধান। আমি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বাবু এবং মহারাজকুমার প্রমুখ ত্রিপুরার এবং অন্যান্য স্থানের ভক্তবৃন্দের চরণে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে শ্রীনবদ্বীপ নিবাসী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যিক পূজ্যপাদ শ্রীল হরিদাস গোস্বামী প্রভুর এবং পূজ্যপাদ শ্রীল নৃত্যগোপাল গোস্বামী প্রভুর অজস্র আশীর্ব্বাদ মস্তকে বহন করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আজ গ্রন্থ মুদ্রণ সমাপনে তাঁহাদের শ্রীচরণোদ্দেশে পুনশ্চ দণ্ডবৎ প্রনাম করিতেছি।

শ্রীনবদ্বীপ রামসীতা পাড়াস্থ লীলাবতী ভক্তিশাস্ত্রপীঠ নামক সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত তর্কতীর্থ মহোদয় যুগলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ সহ দণ্ডবৎ প্রণাম।

বিশেষ যত্ন লওয়া সত্ত্বেও কয়েকটি অশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে, পাঠকপাঠিকাগণ অনুগ্রহ করিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন। নিবেদন ইতি—সন ১৩৪২ সালের ৩১শে বৈশাখ।

শ্রীগুরুশ্রীবৈষ্ণবচরণকৃপাপ্রার্থী
শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস।

নিবেদন

ওঁ শ্রীশ্রীগুরুবিষ্ণুপাদপদ্মের প্রথম প্রণীত "কৃপাকুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থখানা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অত্যল্পকাল মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। এতকাল উহার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে যথেষ্ট আগ্রহ লক্ষিত হইলেও কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও মুদ্রণের গুরু ব্যয় নিবন্ধন যথা সময়ে আমরা গ্রন্থখানার পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হই নাই।

কল্যাণাস্পদ শ্রীমান্ বিনীতকুমার দাস উক্ত গ্রন্থের জন্য সর্ব্বসাধারণের এই প্রকার প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া বর্ত্তমান সময়ে গ্রন্থাদি প্রকাশের বহুবিধ বিঘ্ন ও অসুবিধা সত্বেও উহার পুনঃপ্রকাশের নিমিত্ত প্রচুর ব্যয়ভার একাকী বহন পূর্ব্বক পুনরায় এই অমুল্য গ্রন্থখানা পিপাসু সুধীবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করার সুযোগ প্রদান করিলেন। শ্রীমান্ আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ নিত্যলীলা প্রবিষ্ট বৃন্দাবনচন্দ্র রায় মহাশয়ের দৌহিত্র এবং আমাদের প্রীতিভাজন পরম অমায়িক শ্রীযুক্ত বিপুলচন্দ্র দাস মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র। সদ্গ্রন্থ প্রচারের দ্বার দিয়া বহুজনের প্রভূত উপকার সাধনের সহায়তা করা হয়। এই অল্পবয়সে শ্রীমানের এই প্রকার জনমঙ্গল সাধনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা বস্তুতঃই তাঁহার স্বচ্ছ হৃদয়ের পরিচায়ক। আমি তো কাঙ্গাল, শ্রীমানের এই সৎ প্রচেষ্টার বিনিময়ে তাঁহাকে দেওয়ার মত কোন সম্বল আমার নাই; তাই আমি পরম কারুণিক শ্রীশ্রীমদিষ্ট বিগ্রহের শ্রীপাদপদ্মে শ্রীমানের সর্ব্বতো মঙ্গল বিধানের জন্য কাতর প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি এবং সহৃদয় পাঠকবর্গকেও বিনীতভাবে অনুরোধ করিতেছি যে আপনারাও শ্রীমান্‌কে তাঁহার এই সৎপ্রবৃত্তির জন্য আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করুন।

শ্রীমান্ এই গ্রন্থের সমগ্র উপস্বত্ব শ্রীশ্রীগুরুকুঞ্জের সেবায় নিবেদন করিয়া সজ্জন মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। অলমিতি।

ওঁ শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দানন্দ ভাগবতস্বামী
গুরুবিষ্ণুপাদপদ্মানুগত দীন কাঙ্গাল
......................দাসানন্দ স্বামী।

শ্রীশ্রীগুরুকুঞ্জ, নবদ্বীপ,
১লা মাঘ, ১৩৫১ সাল।

শ্রীশ্রীগুরুচরণকমলেভ্যো নমো নমঃ।

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশকের নিবেদন

গ্রন্থকার শ্রীশ্রীগুরুবিষ্ণুপাদ অপ্রকট হইবার কিছুকাল পূর্ব্বে স্বরূপগঞ্জে যখন অবস্থান করিতেছিলেন তখন এই কৃপাকুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের এক খণ্ডের স্থানে স্থানে অতি সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কোথাও কোন অংশ পরিস্ফুট করিবার জন্য, কোথাও বা প্রমাণ দর্শাইবার জন্য উহা লিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থ পুনঃ প্রকাশের সময় তিনি প্রকট থাকিলে ঐ সব সংক্ষিপ্ত বিষয়ের যথাযোগ্য বিস্তার এবং আরও নূতন কিছু আমরা অবশ্যই পাইতাম। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। শ্রীপাদপদ্মানুগত পরম পূজনীয় শ্রীমদ্ গৌরগোবিন্দদাসানন্দ স্বামীজি মহারাজের ইচ্ছায় উক্ত সংক্ষিপ্ত টিপ্পনীর বিস্তার আমাকেই করিতে হইল। উহা যথাযোগ্য স্থলে পৃষ্ঠার পাদদেশে (১) (২) (৩) প্রভৃতি সংখ্যাক্রমে দেওয়া হইল। আমার অযোগ্যতা নিবন্ধন ইহাতে যথেষ্ট ত্রুটি পরিলক্ষিত হইবে। ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া সুধীজন উহার সারমর্ম্ম গ্রহণ করিবেন এই প্রার্থনা। নিবেদন ইতি সন ১৩৫১ সালের ১লা মাঘ।

শ্রীগুরুশ্রীবৈষ্ণবচরণকৃপাপ্রার্থী
শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস।

শ্রীশ্রীগুরুচরণ কমলেভ্যোনমোনমঃ।

বিনীত বিজ্ঞপ্তি (৩য় সংস্করণ)

শ্রীগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রনাবসানে মাত্র কয়েকখণ্ড হস্তগত হইবার পরই পরস্পর বিরুদ্ধ মনোভাবের বিপরীত ক্রিয়ার অত্যধিক বহিঃপ্রকাশের ফলে কলিকাতার নাগরিক শৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে পরে যথাকালে মহানগরী স্থির শান্তাবস্থায় আসিলে পর অনেক অনুসন্ধান করিয়াও অবশিষ্ট খণ্ড সমুহের কোনই সন্ধান না পাওয়াতে আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীগুরুভ্রাতা ও অন্য সজ্জনবৃন্দ পুনর্মুদ্রনের আকুলাকাঙ্কা জ্ঞাপন করিলেও চিরদুষ্প্রারব্ধভুক্ এই হতভাগার শরীর মনের বিপর্য্যয়ের জন্য এই সুদীর্ঘকাল মধ্যেও তাহা সম্ভব হয় নাই।

সর্ব্ব মঙ্গলাধার অপারকরুণাপারাবার শ্রীশ্রীপাদপদ্মের নিঃসীম নির্হেতু স্নেহ-কৃপা-নুগ্রহই, স্বীয় স্বতঃ করুণায়, অধুনা সজ্জনগণের কাতরাকুলাকাঙ্কা পরিপূরণ পূর্ব্বক এই দীনাধমকে কৃত কৃতার্থ করিলেন।

বর্ত্তমান মুদ্রণ কার্য্যের আদ্যন্ত সমস্তই···৭নং বৈষ্ণব শেঠ ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬ নিবাসী তথা ২৭ সি (নং) কলেজ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা-১২, ইষ্টার্ণ সেনিটারী ষ্টোর্সের স্বত্বাধিকারী, আমার পরম স্নেহাস্পদ ডাঃ শ্রীযুক্ত যুগল চরণ সাহা ও শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ পাল—উভয়ে সমবেতভাবে সুনির্ব্বাহ করিয়াছেন। এজন্য আমি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ কাতর হৃদয়ে আমার এক সর্ব্বস্ব ও আশ্রয়—শ্রীশ্রীগুরুবিষ্ণুপাদপদ্মে শ্রীমানদ্বয়ের সর্ব্বতো মঙ্গল প্রার্থনানন্তর সজ্জনগণ সকাশে ও তাহাদের জন্য শুভাশীর্ব্বাদ-ভিক্ষা করিতেছি।

প্রকাশ করিতেছি যে, বিক্রয়লব্ধ মূল্য হইতে শ্রীগ্রন্থের মুদ্রন ব্যয় মাত্র সংগৃহীত হইবার পর অবশিষ্ট সমগ্রার্থ শ্রীধাম নবদ্বীপ রামসীতাপাড়াস্থ শ্রীশ্রীগুরু-কুঞ্জের সেবা নির্ব্বাহার্থে নিয়োজিত হইবে। উক্ত কার্য্যে কাহারও নিকটে কোন অর্থসাহায্য প্রার্থনা করা হয় নাই বা স্বতঃ প্রবৃত্তভাবে ও কেহ কিছু দান করেন নাই।

আমার পরম স্নেহাস্পদ ডাঃ শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু চট্টোপাধ্যায় ও তাহার স্ত্রী শ্রীমতী রাণী বালা দেবী (সাবাজপুর চা বাগান, শ্রীহট্ট) তাহাদের **একমাত্র** কন্যাসন্তান ২॥ বৎসর বয়সে পরলোকগতার নামে গচ্ছিত—১১২৲ ।

তথা শ্রীমান ধরনীকান্ত চৌধুরী স্ত্রী শ্রীমতী বিরাজ চৌধুরী—(বারই গ্রাম, কাছাড়) তাহাদের কন্যাসন্তান ১॥ বৎসর বয়সে পরলোকগতার নামে গচ্ছিত—৪০৲ টাকা।

তথা শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ পাল (ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া—জগবৎ বাজার)—১০০৲ টাকা আমাকে দিয়াছিলেন। ইহাদের প্রদত্ত অর্থসমূহ, তাহাদের স্বাভীষ্ট মঙ্গল, যথাশক্তি প্রার্থনা করিয়া উক্ত কার্য্যে, অর্পন করা হইল।

বিশেষ যত্ন লওয়া সত্ত্বেও কয়েকটী অশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে, পাঠকপাঠিকাগণ অনুগ্রহ করিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন। শ্রীগ্রন্থের পিছনে শুদ্ধিপত্র দেওয়া হইল।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে সকলের সর্ব্বশুভ ঐকান্তিকরূপে প্রার্থনা করিতেছি। ইতি।

ওঁ শ্রীশ্রীগুরুবিষ্ণুপাদপদ্ম—
দাসানুদাসাধমাভাস
দীনাধম দাসানন্দ স্বামী

সন ১৩৬১ বঙ্গাব্দ
তারিখ—শ্রীশ্রীরাসপূর্ণিমা।

সমর্পণম্

যাঁহার শ্রীশ্রীপাদপদ্ম গলিত কৃপামকরন্দ সুগন্ধ অনাদি বিষয়বাসনা পূতি-গন্ধময় মাদৃশ অধম জীবনকেও সুগন্ধময় করিয়া শ্রীমদনগোপাল পাদপদ্মে সমর্পণের যোগ্য করিতে সক্ষম সেই শ্রীগুরুবিষ্ণুপাদ রাধিকানাথের করুণ সন্ন্যাস বিগ্রহের প্রীত্যুদ্দেশে তাঁহারই কৃপাকল্পলতিকা প্রসূত আমার বাণী রূপে প্রস্ফুটিত উপদেশাবলী কুসুমাঞ্জলির ন্যায় তাঁহার অর্চ্চনের যোগ্য হউক।

শ্রীগৌরগোবিন্দ ভাগবতস্বামী



ওঁ ভাগবতপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য –

শ্রীলশ্রীরাধিকানন্দরাধিকানাথবিষ্ণুপাদা জয়ন্তি

কৃপাকুসুমাঞ্জলি

"হরিতুষ্টিঃ পরোধর্ম্মঃ"

ধর্ম্মঃ

পরম স্নেহাস্পদ—

মহারাজকুমার **শ্রীল শ্রীযুক্ত রণবীর কিশোর দেববর্ম্মা**

কর্ত্তা বাহাদুর, ত্রিপুরা রাজ্য।

মদীয় **শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে** অর্পিত **কুসুমাঞ্জলির** এই **নির্ম্মাল্য** আমার স্নেহাশীস্ রূপে আপনাকে প্রদান করিলাম। ইহা আপনাকে অমৃতময় জীবন দান করুক।

শ্রীভাগবতস্বামী।

卐

ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা মনুষ্যের জন্যই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুনি ঋষি এবং তদনুগত আচার্য্যগণ মনুষ্যকেই অধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া শাস্ত্রাদিতে ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের অভ্রান্ত জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার তত্তৎ শাস্ত্রাদি। যদি মানুষের ধর্ম্মের কোনও প্রয়োজন না থাকিত তাহা হইলে

তাঁহারা মানুষকে উদ্দেশ করিয়া ধর্ম্মের উপদেশ দিতেন না। **একমাত্র** মনুষ্যই ধর্ম্মের মুখ্য অধিকারী, পশু পক্ষী আদি তাদৃশ অধিকারী নহে। **মানুষ** যদি ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা বোধ না করে তাহা হইলে তত্তৎ আর্য শাস্ত্রের উপদেশ সমূহ ব্যর্থ ই হয়। পক্ষান্তরে আকৃতি আদিতে মনুষ্যপদবাচ্য হইলেও তাহাকে ঠিক প্রকৃত মানুষ বলা যায় না, কেননা ধর্ম্মাধিকারত্ব হেতুই মানুষের মনুষ্যত্ব। ধর্ম্মাধিকার না থাকিলে মানুষ হইবে কি প্রকারে ?

ধর্ম্ম কাহাকে বলে ? এস্থলে মানুষকে অধিকার করিয়া যে ধর্ম্মের কথা বলা হইতেছে তাহার অর্থ এই যে যাহা মানুষকে ধারণ পোষণ করে তাহাই মানুষের **ধর্ম্ম** বলিয়া কথিত হয়। ধর্ম্মসমূহ যথাযোগ্য ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে মানুষের দেহেন্দ্রিয় মনঃপ্রাণ বুদ্ধি আদি স্থিতি লাভ করিয়া পুষ্টি বা বিকাশ প্রাপ্ত হয়। **যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ**—অর্থাৎ যাহা হইতে অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ পরমাত্যন্তিক মঙ্গল হয় তাহাই ধর্ম্ম। অভ্যুদয় শব্দের অর্থ সুখ, তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে ঐহিক পারত্রিক সুখ এবং নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ নিত্যপরমানন্দ লাভ যাহা হইতে হয় তাহাই **ধর্ম্ম**। অভ্যুদয় শব্দের আর একটি তাৎপর্য্য আছে, অভি-উদয়, সর্ব্বতঃ উন্নত ভাবকে অভ্যুদয় বলা যায়। তাহা হইলে অর্থ হইল এই যে সর্ব্বতোভাবে দেহেন্দ্রিয় মনঃপ্রাণ বুদ্ধি প্রভৃতি উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ পরমানন্দ লাভে পূর্ণ হয় যাহা হইতে তাহার নামই **ধর্ম্ম**।

এই ধর্ম্ম বলিতে কি বুঝায় ? চৌর্যাদি দ্বারা অর্থাগম, মিথ্যাভাষণাদি দ্বারা লাভ যশঃ, পরস্ত্রীভোগাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়ারাম প্রভৃতিতেও সুখ উপভোগ হয়, সুতরাং যাহা হইতে সুখ হয় তাহাই ধর্ম্ম এই প্রকার অর্থ নহে। বস্তুতঃ সুখ যে কোথায় তাহার রহস্য ভ্রান্ত জীবের অগোচর। ভ্রান্ত মনুষ্য সুখের লালসায় উন্মত্ত হইয়া অজ্ঞতাবশতঃ রজ্জুলাভের আশায় সুপ্ত কালসর্প গ্রহণের ন্যায় তাদৃশ বিগর্হিত কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া পরিণামে শরীর মন প্রাণাদির ধ্বংস, বুদ্ধির বিক্ষিপ্ততা এবং লোকজগতের নিন্দাদি জনিত মহা দুঃখময় নরকই ভোগ করিয়া থাকে। অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স কোথায় ? সুতরাং কিরূপ আচরণকে ধর্ম্ম বলা যায় ইহা জানিতে হইলে কেবল মাত্র **নিত্য অভ্রান্ত কাহারও উপদেশ ভিন্ন অন্য উপায় নাই।** এই নিত্য অভ্রান্ত

উপদেশময় আর্য্যশাস্ত্রের মূল **বেদ**। সুতরাং **বেদবিহিত আচরণই ধর্ম্ম**—বেদপ্রণিহিতোধর্ম্মো, হ্যধর্ম্মস্তদ্‌বিপর্য্যয়ঃ। এই বেদবিহিত আচরণসমূহের মধ্যে কতকগুলি কায়িক, কতকগুলি বাচিক, কতকগুলি মানসিক। অনাদিকাল হইতেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহর্ষিগণ ঐ সকল আচরণ করিয়া উহাদের লোক-মঙ্গলকারিত্ব অনুভব করিয়া মানুষের মঙ্গলের নিমিত্তই শাস্ত্রে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং সাধুজন পরম্পরায় সেই বেদবিহিত সদ্ধর্ম্ম সকল জগতে ধারা-বাহিকরূপে আচরিত হইয়া আসিতেছে।

ধর্ম্মে পুণ্য হয়, ধর্ম্মবিরোধী কার্য্য করিলে পাপ হয়। পুণ্য বলিতে পবিত্রতা, স্বচ্ছতা বুঝায়; যাহা আচরণ করিলে কায়িক, বাচিক, মানসিক পবিত্রতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া দেহেন্দ্রিয় মনঃপ্রাণ আত্মাকে স্বচ্ছ করিয়া তুলে তাহাই মনুষ্যত্বের বিকাশ বা পুষ্টি। শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মসমূহের আচরণ বিনা মানুষের দেহেন্দ্রিয় মনঃপ্রাণ স্বচ্ছতা লাভ করিয়া উন্নত হওয়া ত দূরের কথা, কেবলমাত্র আহারনিদ্রাদি ও বিষয়বাসনা ভোগাদি দ্বারা ক্রমশঃ কলুষ-তমসাচ্ছন্ন হইয়া অধঃপাতের দিকেই অগ্রসর হইতে থাকে। **ধর্ম্মাচরণই মানুষকে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করায়।**

যথেচ্ছাচারে ধর্ম্ম হয় না, সুখ বা কল্যাণও হয় না। উচ্ছৃঙ্খল যথেচ্ছ আহার বিহারে দেহেন্দ্রিয়ের গতিও যথেচ্ছ উচ্ছৃঙ্খলই হয় এবং তাহার ফলে মন অতিশয় অসংযত হইয়া উঠে। পরিণামে অসংযত উদ্দামগতি মনের অধীন ইন্দ্রিয়, আবার উচ্ছৃঙ্খল চঞ্চল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মন অশান্ত হইয়া পড়ে। তখন মনুষ্য যাহা কিছু কর্ম্ম করে কিছুতেই আর সুখ পায় না। অশান্তস্য কুতঃ সুখম্। অধিক কথা কি, তখন সুখের লালসায় দান পরোপকার প্রভৃতি সৎকার্য্যের দ্বারা ধর্ম্মাচরণ করিতে গেলেও তাদৃশ যথেচ্ছাচারী চপলেন্দ্রিয় বিক্ষিপ্তমনা মনুষ্যের ধর্ম্মও প্রকৃত ভাবে আচরিত হয় না; সুতরাং সুখশান্তি সুদূরপরাহত।

ধর্ম্ম ভয়ের কারণ নহে। অবোধ লোকদিগকে কোন সদ্ধর্ম্ম আচরণের উপদেশ করিলে তাহারা ভীত হইয়া পড়ে, মনে করে, 'সর্ব্বনাশ! ধর্ম্মকর্ম্ম! সর্ব্বনাশ! আমার সময় কোথায়?' তাহারা মনে করে ধর্ম্মকর্ম্মে যেন সকল সুখশান্তি নাশ পাইবে। হায় অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন মনুষ্য! ধর্ম্ম তোমার সুখ-

ভোগের অন্তরায় নহে ; বরং দেহেন্দ্রিয় মনঃপ্রাণকে সতেজ সবল স্বচ্ছ রাখিয়া বিমল সুখভোগের জন্যই শাস্ত্রে ধর্ম্মের ব্যবস্থা—সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্।

ধর্ম্ম মানুষকে ছোট করে না, বরং বড়ই করে, মনের প্রশস্ততা বাড়ায় ; সাধুসজ্জনের আচরিত **সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষমা, সন্তোষ, সারল্য** প্রভৃতি অতিপ্রিয় গুণসকল মানুষের হৃদয়ের সংকীর্ণতা ঘুচাইয়া তাহাকে অতি-মানুষের স্তরে পৌঁছায়। সকল প্রাণীর মধ্যে মনুষ্যই বড় প্রাণী। বড়র নিকট সকলেই বড় আশা করে। যদি বড় মানুষের নিকট সত্য শৌচ দয়া ক্ষমা প্রভৃতি বড় গুণ না পাওয়া যায় তাহা হইলে তদপেক্ষা দুঃখ আর কি আছে? মানুষ গুণে বড় হইলেই বড় হয়। গাড়ী ঘোড়া বাড়ী বড় দেখিয়া অবোধ লোকেরাই বড় লোক বলে। সুবোধ যাহারা তাহারা মানুষের নিকট হইতে **বড় দান** না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে বড় লোক বলিতে কুণ্ঠিত হয়। আপনি কত বড় একবার ভাবুন ; আপনার মধ্যে আমরা বড়ই দেখিতে ইচ্ছা করি। মনে ভাবিয়া দেখুন, যথেচ্ছ উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়ভোগে প্রমত্ত হইয়া বা লোভ ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া অর্থসামর্থ্যাদির বলে দুর্ব্বল অসহায়ের প্রতি অত্যাচার করিয়া, গরীব দুঃখীকে দেখিয়া নিজকে অর্থশালী ধনী মনে করতঃ গর্ব্বে বক্ষ ফুলাইয়া, সাধু সন্ন্যাসী সজ্জনকে ধনের বা পদের বা কুলের গর্ব্বে তুচ্ছ বোধ করিয়া, বড় হওয়া যায় না। **ধনী ব্যক্তির ধন ধনীর জন্য নহে, উহা তাহার বিলাসবহ্নির ইন্ধন যোগাইবার জন্য নহে, উহা দুঃস্থ কাঙ্গালের দুঃখ নিবারণের জন্য ; বলবান্ ব্যক্তির বল দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারের জন্য নহে, উহা অত্যাচারীর অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার জন্য ; পদগৌরব লোককে তুচ্ছ বোধ করার জন্য নহে, লোকের পদমর্য্যাদা বর্দ্ধিত করিবার জন্য।** এই সকল বড় সদ্‌গুণরাশি হৃদয়ে থাকিলে তাহাকেই বড় বলা যায়। এই সদ্‌গুণরাশি তাহাকে উপার্জ্জন করিতে হইলে সাধুশাস্ত্রানুমোদিত সৎপন্থাই অবলম্বন করিতে হয়।

মানুষ যতই সুখের লালসায় ছুটাছুটি করে, যত নিজে বড় হইবার জন্য নানাবিধ ছলচাতুরী আশ্রয় করে, ততই সে দুঃখ উপভোগই করে এবং ততই নিজের নিকট নিজেই ছোট হইতে থাকে। যতকাল দেহেন্দ্রিয় মনঃপ্রাণ পবিত্র বৃত্তি ধারণ করিয়া নির্ম্মল প্রশান্ত প্রশস্ততার দিকে না ছুটে ততকাল

নিজের কাল্পনিক সহস্র চেষ্টাতেও মানুষ সুখী হইতে পারে না। সত্য শৌচ দয়া ক্ষমা অহিংসাদি শাস্ত্রবিহিত সদ্ধর্ম্ম আচরণেই দেহেন্দ্রিয় মনঃপ্রাণাদি নির্ম্মল প্রশান্ত প্রশস্ততার দিকে অগ্রসর হইয়া প্রশস্ততার চরম পর্য্যবসান **শ্রীভগবদ্ভক্তিকে** আশ্রয় করিয়া কৃতকৃতার্থ হয়। এই **ভগবদ্ভক্তিতেই মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণতা—ধর্ম্মো মদ্ভক্তিকৃৎ।** বিচক্ষণতার সহিত অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই অনুভব হইবে যে সত্য শৌচ দয়া ক্ষান্তি শম দমাদি ধর্ম্মসমূহ ভগবদ্ভক্তিকেই কেন্দ্র করিয়া জগৎ জীবের মঙ্গল বিধানের নিমিত্ত ভগবান্ হইতেই জগতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে—ভগবান্‌কে ভক্তি করার আবার প্রয়োজন কি? সত্য শৌচ দয়াদি সদ্ধর্ম্ম প্রতিপালনেই ত জীবনের উন্নতি হইতে পারে! আর ভগবানের অস্তিত্বের প্রমাণই বা কি?

ভগবান্‌কে ভক্তি করার প্রয়োজন কি ইহার উত্তর পরে বলিব। ভগবানের অস্তিত্বে প্রমাণ কি ইহার উত্তরে সামান্য দুইটি কথা বলিতেছি। ভগবানের অস্তিত্বের প্রমাণ **ঐ বৃক্ষতলায় ঐ নির্ম্মুক্ত প্রান্তরে নির্জ্জন নিরপেক্ষ নিঃসম্বল সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী ব্যক্তিই।** দেখুন আপনি মহারাজপুত্র, আপনার প্রচুর অর্থ আছে, গৃহে গোলায় গোলায় ধান্য আছে, আপনার দশ বৎসরের খাদ্য প্রচুর পরিমাণে ঘরে থাকা সত্ত্বেও একদিন যদি হঠাৎ একটু অনাবৃষ্টির বা অকালবৃষ্টির লক্ষণ দেখেন তাহা হইলে ভীত হইয়া চীৎকার করিতে থাকেন—'হায় সর্ব্বনাশ হইল, ক্ষেত্রে শস্য হইবে না, কি খাইব? স্ত্রীপুত্র সহ না খাইয়াই মরিতে হইবে, হায় উপায় কি?' আপনি উদর পূর্ণ করিয়াও আপনার ভাবী উদর পূর্ণ করিবার বস্তু থাকা সত্ত্বেও 'কি খাইব' ভাবিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়েন; আর ঐ নিরাহার নিঃসম্বল বৈরাগীকে জিজ্ঞাসা করুন, 'বাবা, ক্যা ভোজন হুয়া?' ঐ সাধুটি তখন প্রসন্নবদনে সহাস্যে বলিবে, 'আজ মালিক নেহি মিলায়ে, যব মিলাওবেঙ্গে তব্ খাওবেঙ্গে; আজ রামজিকি ইচ্ছাই হ্যায় ভোজন মিল্‌নে নেহি হ্যায়, আজ আনন্দই হ্যায়।' আহা কি শান্তি, কি ক্ষোভশূন্য অবস্থা। উহার এই নিঃক্ষোভতা কাহার বলে? ঐ নিঃসম্বল ব্যক্তির নিশ্চিন্ততার সহায় কে? কে উহার ভরণকর্ত্তা? কাহার উপর নির্ভর করিয়া অসহ বুভুক্ষাবস্থায়ও প্রসন্নবদন। আবার দেখুন,

আপনি একজন রাজকুমার, সুদৃঢ় প্রাচীরবেষ্টিত গৃহাভ্যন্তরে সাধারণ লোকের অগম্য উন্মুক্ততরবারিহস্ত প্রহরিরক্ষিত স্থলেও প্রাণের ভয়ে চমকিয়া চমকিয়া উঠেন, প্রাণের ভয়ে সুখে নিদ্রা হয় না; আর ঐ উন্মুক্ত প্রান্তরে নিঃসহায় একাকী বৈরাগী "রাম রাখবার্" জ্ঞানে নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। উহার এই নির্ভীকতা কাহার বলে? কে উহার অন্তরে অভয় দিতেছে? ভাবুন জীবনভরা প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াও এই 'হায় হায়' ঘুচিল না, এই বিশাল বিশ্বে অনন্ত রূপ, অনন্ত রস, অনন্ত গন্ধ নিরন্তর নানাবিধ প্রকারে উপভোগ করিয়াও তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইতেছে না, আরও চাই, আরও চাই। এই 'চাই চাই' রাক্ষসীর জঠরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত আহুতি দিয়াও ইহার ক্ষুধানলের শান্তি করিতে পারিতেছেন না। আর ঐ বৈরাগী সন্ন্যাসী সর্ব্বভোগত্যাগেও সর্ব্বদা পূর্ণ; 'খাই খাই, চাই চাই' মহারাক্ষসীর গ্রাস হইতে নিজকে নির্ম্মুক্ত করিয়া অত সুখে আছে কাহাকে পাইয়া? কাহার রূপে উহার চক্ষু নিমগ্ন হইয়া এ বিশ্বের যাবতীয় রূপকে তুচ্ছ বোধ করিতেছে? কি লাভ করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ভোগ্য পদার্থের তুচ্ছতা দেখাইয়া আপনাকে সে পূর্ণ বোধ করিতেছে? **এই পূর্ণতা সে কোথায় পাইল? এই পূর্ণতার গন্ধ তাহার নাসায় কে আনিয়া দিল?** ইহা **"ঈশ্বর"। শান্তি অভয় পূর্ণতা**—ইহাই আমাদের আর্য্যের ঈশ্বর, যাঁহার কল্পনায় মনুষ্যের **চিরশান্তি, অকুতশ্চিদ্ভয়, আনন্দের পূর্ণতা।** মহামহিম অনন্ত-কল্যাণগুণনিলয় পরমেশ্বরের কল্পনাতেই সর্ব্বথা পূর্ণতা। **শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থমিতি মন্যন্তে।** শান্তি চাওয়ার নামই ঈশ্বর চাওয়া, সুখানুসন্ধানই ঈশ্বরানুসন্ধান, পূর্ণতালাভের চেষ্টাই ঈশ্বর পাওয়ার চেষ্টা। শান্তি কোন্ মনুষ্য চায় না, সুখ কে অনুসন্ধান করে না, পূর্ণতা পাইতে কে চায় না? ইহাই ত ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ। এই শান্তির চিরশান্তি, এই সুখের বিমল নিত্য সুখ, এই পূর্ণতার চরম পর্য্যাপ্তি যে আধারে অবস্থান করে মেঘমন্দ্রস্বরে আর্য্য ঋষিগণ তাঁহাকেই **ঈশ্বর** বলেন। এই চিরশান্তি, বিমল নিত্য সুখ এবং পরিপূর্ণতা ধর্ম্মের নিরঙ্কুশ ধর্ম্মী যিনি তিনিই পরমেশ্বর। ধর্ম্মী বিনা ধর্ম্মের স্থিতি সম্ভব হয় না। অজ্ঞানান্ধ মনুষ্য সুখ শান্তি পূর্ণতা চায় বটে, কিন্তু প্রকৃত পথ পায় না, ধর্ম্মী

ঈশ্বরে বহির্মুখতা বশতঃ দুঃখ অশান্তি অপূর্ণতার দিকেই ছুটিতে থাকে।

ঈশ্বরের অস্তিত্বে দ্বিতীয় কথা এই যে আপনার অন্তরটিই ঈশ্বরাস্তিত্বের সাক্ষী; অজ্ঞান মোহান্ধকারে ভ্রাম্যমাণ মনুষ্য যতই ঈশ্বরে বহির্মুখতা আচরণে অভ্যস্ত হইয়া নিত্য সত্য স্বাভাবিক ঈশ্বরাস্তিত্বকে আবৃত করিতে চেষ্টা করুক না কেন, একেবারে লোপ করিতে সমর্থ হয় না। যিনি যত বড় নাস্তিকতার আশ্রয়ে মোহপ্রাপ্ত হউন না কেন, স্বভাবসিদ্ধ ঈশ্বরাস্তিত্ব সময় মত তাঁহার হৃদয়ে সাক্ষ্য দিবেই দিবে। আমার ধারণা নাস্তিক কেহ নাই। আপনি নিজকে তর্কবিতর্কের স্রোতে ভাসাইয়া যতই অবিশ্বাসের আবর্ত্তে ডুবাইয়া নিজের মনকে **"ঈশ্বরো নাস্তি"** বুঝাইয়া পাকা করিয়া রাখুন না কেন, যথাসময়ে ঐ মন **স্বভাবসিদ্ধ ঈশ্বরাস্তিত্বের** গন্ধের দিকে ধাবিত হইতে চেষ্টা করিবেই করিবে। যেমন মনে করুন, কোন মহান্ধকারপূর্ণ প্রবল তরঙ্গসঙ্কুল নানাপ্রকার গ্রাহব্যাপ্ত সমুদ্রমধ্যে যদি আপনি নিঃসহায় অবস্থায় পড়েন, তখন আপনার মনের অবস্থা কি প্রকার হয়? মনে হয় না কি, **হায়, এখন কি করি?** মনে করুন এমন কোন গুরুতর ভয়ানক অবস্থা আসিল যাহা হইতে উদ্ধারের কোনও উপায় দেখিতে পাইতেছেন না; নিজের জ্ঞান বিবেক, নিজের শারীরিক সামর্থ্য, অর্থ, বল, লোকজন, সহায়, সম্পত্তি প্রভৃতি কাহারও দ্বারা সে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন না। বলুন এমন অবস্থায় মনের গতি কি হয়? তখন মনে হয় না কি, হা হতোঽস্মি, কিং করোমি? এই প্রকার মনে উদয় হয় কাহাকে লক্ষ্য করিয়া? কেন, আপনি ত বেশ জানেন সেই মহা ঘোর সমুদ্রে বা সেই মহা বিপদে 'কি করি, উপায় কি' ইহার উত্তরদাতা কেহই নাই। মন ত আপনার নিরুপায়, একই মন। এক আপনি ভিন্ন ত সে মহা বিপদ স্থলে আর কেহই নাই। **নিরাশ্রয় নিঃসম্বল আপনার মন নিঃসহায় মহাবিপদ ক্ষেত্রে কোন্ অজ্ঞাত রক্ষকের গন্ধ পাইয়া বিহ্বলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি করি, উপায় কি?' আপনি যদি সেই সময় মনের অন্তস্থল খুঁজিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতেন, ঐ নিরাশ্রয় নিঃসম্বল মনের নাসায় আপনার অজ্ঞাত নিরাশ্রয়ের পরমাশ্রয় সর্ব্বসমর্থ কোন পুরুষের অস্তিত্বের গন্ধ প্রবেশ করিয়াছে।**

তাঁহারই অস্তিত্বের গন্ধে বিহ্বল মনের এই প্রশ্ন, 'হায় কি করি, উপায় কি ?' এই মনই ঈশ্বরাস্তিত্বের সাক্ষী। হায় মোহান্ধ ভ্রান্ত মনুষ্য ! এই অবকাশেও 'কি করি, উপায় কি', ইহার উত্তর তোমার মিলিল না।

এখন ভগবানকে ভক্তি করার প্রয়োজন কি ইহার উত্তর সংক্ষেপে বলিতেছি। দেখুন এই জগতে আমরা যাহা শিক্ষা পাই, তাহা সত্যই হউক আর অসত্যই হউক, তাহার মূলে একটি **আদর্শ** থাকে। এই আদর্শকে আশ্রয় করিয়াই সর্ব্বপ্রকার শিক্ষালাভ হয়। যাঁহারা অসৎ ভাব সকল শিক্ষা করেন, তাঁহাদের মনও কোন অসৎকে আদর্শ করিয়া তাঁহারই অসদ্‌গুণরাশির অনুকরণে তৎপর হয় ; আর সৎভাব সকল শিক্ষা করেন যাঁহারা, তাঁহারাও কোন সচ্চরিত্র সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেই আদর্শ করিয়া তাঁহা হইতে প্রবর্ত্তিত সদ্‌গুণ সমূহের অনুকরণে প্রবৃত্ত হন। সত্য দয়া ক্ষমা অহিংসা প্রভৃতি সদ্‌ভাবগুলি উপার্জ্জন করিতে হইলে কোন সৎ মহাপুরুষকে আদর্শ করিতেই হইবে। এখন দেখুন, সাংসারিক স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতের তাড়নায় আমাদের মনঃপ্রাণ যখন জর্জ্জরিত হইয়া উঠে তখন আদর্শের নিকট হইতে প্রবল কোন সাহায্য না পাইলে আমরা স্থির থাকিয়া সত্য দয়া প্রভৃতিকে স্থির রাখিতে পারি না। আবার আদর্শে বিশ্বাস রাখিতে হইলে আদর্শস্থানে কোনও অলৌকিক শক্তি ধারণা পূর্ব্বক শ্রদ্ধা বিশ্বাস রাখিয়া তদানুগত্যে স্থির থাকাই ভক্তির মূল। অনন্তশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবান্‌ই অনন্ত সত্য দয়া ক্ষমাদি কল্যাণ গুণের নিলয় স্বরূপ। আমার সত্য দয়া ক্ষমা প্রভৃতি ক্ষীণ হইতে থাকিলে এই প্রকার চিন্তনে ঈশ্বরে যদি শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে তাহা হইলে আমার ভরসা হইবে ঈশ্বর হইতেই এই সত্য দয়া ক্ষমাদির সাহায্য পাইব, কারণ জগতে যাহা আদর্শ তাহা আমাদের দৃষ্টিতে অপূর্ণ বিধায় গুরুতর ঘাত প্রতিঘাতে কখনই তাঁহার উপর বিশ্বাস রক্ষা করিতে পারিব না। পরিপূর্ণ সদ্‌গুণরাশি যাঁহাতে আছে এমন কোন **আদর্শ** দাঁড় না হওয়া পর্য্যন্ত এবং তাঁহার সাহায্য প্রার্থনাদি ব্যতীত অপূর্ণ নিরাশ্রয় জগতের ক্ষণিক আদর্শ হইতে সদ্ধর্ম্ম সদ্‌গুণ উপার্জ্জনে স্থির থাকা নিতান্ত **অসম্ভব**। অলৌকিক পূর্ণ কোন শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা চাই। **তিনিই ঈশ্বর, তাঁহার আশ্রয়ই ভক্তি।**

যস্যাস্তি ভক্তি র্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈ গু´ণৈ স্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥

এই সত্য দয়া ক্ষমা প্রভৃতির পূর্ণতা ভগবদনুগ্রহেই হয়। আর এই ধর্ম্ম সমূহ যদি শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থে তাঁহারই শ্রীপাদপদ্মে সমর্পিত হয় তাহা হইলে ইহারাই **পর ধর্ম্ম** হইয়া উঠে।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

হায় হায়! একবার ভাবুন, কেবলমাত্র ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখলালসা-পরায়ণতাই কি এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য জীবনের সার্থকতা? ইহা কখনই নহে।

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামপশবোঽপরে ॥

ধর্ম্মে মনুষ্যজীবনের পূর্ণতা। আশীর্ব্বাদ করি সকল ধর্ম্মের মূল পরম ধর্ম্ম শ্রীভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া মনুষ্য জীবনকে কৃতকৃতার্থ করুন।

"সদাচারঃ শুচিৰ্ম্মতা"

সদাচারঃ

পরম স্নেহাস্পদ—

রাজকুমার **শ্রীল শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দেববর্ম্মা**

কর্ত্তা বাহাদুর, ত্রিপুরা রাজ্য।

মদীয় **শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে** অর্পিত **কুসুমাঞ্জলির** এই **নির্ম্মাল্য** আমার স্নেহাশিস্ রূপে আপনাকে প্রদান করিলাম। ইহা আপনাকে অমৃতময় জীবন দান করুক।

শ্রীভাগবতস্বামী।

সদাচার বলিতে সাধুদিগের পবিত্র আচারকে বুঝায়। সাধারণতঃ ইহাকে শৌচ বলা যায়। এই শৌচ গুণটি মনুষ্যের অনুষ্ঠেয় সদ্ধর্ম্মসমূহের পবিত্র-কারক। মনুষ্য হইয়া যদি শৌচ প্রতিপালন না করেন, শৌচ নামক অনুষ্ঠানটির প্রয়োজন কিছুই নাই বলিয়া কুতর্কাশ্রয় পূর্ব্বক যদি পবিত্রতার উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? মানুষ যদি শৌচাচরণে বিমুখ হয় তাহা হইলে পশু পক্ষীর জন্যই কি শাস্ত্রে শৌচাচারের বিধান? এই শৌচ নামক ধর্ম্মটি উপার্জ্জন না করিলে কোন ধর্ম্মাচারণই দাঁড় হইতে পারে না। হায়, যিনি ধর্ম্মাচরণ করিবেন তিনি নিজে শৌচ পবিত্রতার প্রতি লক্ষ রাখিবেন না? এরূপ ধর্ম্মাচরণ বস্তুতঃ আত্যন্তিক

শ্রেয়স্কর নহে। ইহাতে দেহেন্দ্রিয় মনঃপ্রাণাদি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। পবিত্রতাহীন ধর্ম্মাচরণ আপাততঃ লোক দেখান মাত্রই হয়, জীবনকে উন্নতির পথে অগ্রসর করায় না।

শৌচ কাহাকে বলে ?—শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমান্তরমেব চ। শৌচ দুই প্রকার, একটি বাহ্য শৌচ, অপরটি আন্তর শৌচ। মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা শরীরাদির প্রক্ষালনাদিকে বাহ্য শৌচ বলে। আর অহঙ্কার গর্ব্বাদির পরিহার দ্বারা সর্ব্বভূতে সৌহার্দ্দ সারল্য দয়া ক্ষমাদি দ্বারা চিত্তের মালিন্যাপসরণকে আন্তর শৌচ বলে। বাহ্য শৌচ দ্বারা আন্তর শৌচের সাহায্য হয়। কেবল মাত্র বাহ্য শৌচাচরণ করিয়া অর্থাৎ ত্রিসন্ধ্যা স্নানাচমনাদি এবং পবিত্র আহারাদি দ্বারা শরীরকে পবিত্র রাখিয়া হৃদয়ে **"দম্ভের, অভিমানের"** প্রলেপ বাড়ান শৌচ নহে। শাস্ত্রে স্নান আচমনাদির ব্যবস্থা অপরকে 'ছুস্‌নে ছুস্‌নে' বলিয়া **ঘৃণা করিবার জন্য নহে,** দেহেন্দ্রিয়াদিকে পবিত্র রাখিয়া ধর্ম্মাচরণে শীতোষ্ণাদিসহন এবং পরিশ্রমাদিতে পটুতা লাভ করিয়া **বহিরিন্দ্রিয়সংযমের যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্যই বাহ্য শৌচের প্রয়োজনীয়তা, কেবল ছুৎমার্গ বাড়ানর জন্য নহে।**

আবার যাঁহারা 'মনঃশুদ্ধি, মনঃশুদ্ধি' বলিয়া বাহ্য শৌচাচার স্নানাচমনাদিকে বহিরঙ্গ আখ্যা দিয়া যথেচ্ছ আহার বিহারাদির স্রোতে শরীর ইন্দ্রিয় মনঃপ্রাণাদি ঢালিয়া দেন তাঁহারাও একবার ভাবুন যে ঐ প্রকার যথেচ্ছাচারে অসংযত দেহেন্দ্রিয়ে **মনঃশুদ্ধি** হয় কি? হরি, হরি, যথেচ্ছ-বিহারী চপলেন্দ্রিয় শৌচাচারবর্জ্জিত হইলেই কি মন পবিত্র হইবে? মন শুদ্ধ করিতে হইলে বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমের উপযোগী স্নান, আচমন, পবিত্র আহারবিহারাদি **বাহ্য শৌচ** অবশ্য প্রতিপালনীয়।

এ বিষয়ে কার্য্যকারণ বিচার করুন। জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মনঃশুদ্ধি হওয়া চাই। মনঃশুদ্ধি জ্ঞানোৎপত্তির কারণ; আবার এই মনের স্থিতির কারণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা **ভোগ,** আবার ঐ ইন্দ্রিয়ের ধৃতির কারণ **শরীর,** আর শরীরের ধৃতির কারণও ঐ **ইন্দ্রিয়ই;** শরীরের স্থিতির কারণ **আহার।** এখন দেখুন অশুদ্ধ যথেচ্ছ আহারাদির দ্বারা আহারানুযায়ী শরীরের স্থিতি হয়, শরীরানুযায়ী ইন্দ্রিয়চপলকর আহারাদির দ্বারা মনও চপল হইয়া উঠে।

ইন্দ্রিয়ের চপলতা বর্দ্ধিত হইয়া মনের উপর কাম ক্রোধ লোভাদির বেগকে বর্দ্ধিত করিয়া সর্ব্বদা বিষয়ভোগলালসা দ্বারা চিত্তকে অস্বচ্ছ ও ক্ষুব্ধ করিতে থাকিলে জ্ঞানলাভ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তাদৃশ অস্বচ্ছ বিষয়ক্ষুব্ধ চিত্তে সত্য দয়া ক্ষমা প্রভৃতির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

শৌচাচার প্রতিপালনে মন ক্রমশঃ শুদ্ধতার দিকে অগ্রসর হইলে আর যথেচ্ছভাবে অযথা বিষয়ভোগের লালসায় চিত্তে বিক্ষোভ হয় না। তখন অনাসক্তভাবেই যথাযোগ্য বিষয়ভোগটি সম্পন্ন হয়। এই অনাসক্ত ভাব হৃদয়ে যতই গাঢ় হইতে থাকে ততই হৃদয়ের ক্ষুদ্র স্বসুখকামনা তিরোহিত হইতে থাকে। তখন কর্ম্ম করিয়াও মনের কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান শিথিল হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ কর্ম্মফলে আসক্তি হ্রাস পাইতে থাকে। এই আসক্তি যাবতীয় দুঃখের কারণ। আসক্তি ত্যাগ করিতে পারিলে প্রকৃত কর্ম্মী হওয়া যায়, তখনই জনহিতকর কার্য্যে অধিকার লাভ হয়, প্রাণ তখনই পরার্থপরতার দিকে প্রসারিত হয়। অন্তঃকরণের এতাদৃশ যোগ্যতালাভই প্রকৃত শৌচ—**কর্ম্মস্বাসঙ্গমঃ শৌচম্।** সাধুজনাচরিত শাস্ত্রবিহিত বাহ্য শৌচাচার হইতেই পরম্পরায় আন্তর শৌচ লাভ করিয়া ভাগ্যবান্ মনুষ্য তখন "যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥" এই মহামন্ত্রের দীক্ষালাভে অধিকার পাইতে সক্ষম হয়।

এই প্রকার আন্তর শৌচ হইতে সন্তোষ উৎপন্ন হয়। তৃষ্ণাক্ষয় হইয়া চিত্তে যে স্বতস্তৃপ্তির উদয় তাহাকেই **সন্তোষ** বলে। যথালাভে সন্তুষ্ট থাকাই সন্তোষের কার্য্য। যাহার হৃদয়ে সন্তোষ বাস করে, তিনিই প্রকৃত তপস্বী। সন্তোষলাভের মত তপস্যা নাই, তৃষ্ণাক্ষয়ের মত সুখ নাই। পাতঞ্জল বলেন, "সন্তোষাদনুত্তমস্সুখলাভঃ।" সর্ব্বাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলে নিরতিশয় সুখ লাভ করা যায়। শাস্ত্রে বলেন, "যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখং। তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥" অর্থাৎ লৌকিক বিষয়জনিত যত প্রকার সুখ আছে এবং দেবাদি লোকে যত প্রকার দিব্য মহৎ সুখ আছে ইহাদের কোনটিই তৃষ্ণাক্ষয়সুখের ষোড়শ ভাগের এক ভাগের তুল্যও নহে। "যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভি র্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতাং। তাং তৃষ্ণাং সন্ত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ সুখেনৈবাভিপূর্য্যতে॥" অর্থাৎ বিষয়লিপ্সু, দুর্ম্মতিগণ যে তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিতে

পারে না এবং জরাগ্রস্ত বৃদ্ধজনেরও যে তৃষ্ণা ক্ষীণ হয় না, বুদ্ধিমান্ জন সেই তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিয়া সুখে পূর্ণ হইয়া কালাতিপাত করেন।

চিত্ত সত্ত্বগুণপ্রধান। সাত্ত্বিক আহার বিহার শৌচাচমনাদি সাত্ত্বিক আচরণ দ্বারা চিত্তের সত্ত্বগুণ মার্জ্জিত হইলে রজোগুণের তৃষ্ণা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তখন সুদ্দীপ্ত সত্ত্ব গুণের পরিণাম সন্তোষ উদিত হইয়া হৃদয়কে সুখে পূর্ণ করিয়া তুলে।

গীতায় শ্রীভগবান্ ভক্তিযোগের মধ্যে "সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ" বলিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক ভগবৎপ্রীতিকর সত্য দয়া ক্ষমা দৈন্য অহিংসা প্রভৃতি ব্রত আচরণে অগ্রসর হন, অনেক সময়ে লৌকিক জগতের কালকর্ম্মনিয়মানুযায়ী অভাব অভিযোগ অপমান অনাদর প্রভৃতি চিত্তক্ষোভক অবস্থা সকল সুশাণিত শেল সদৃশ হইয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ের মর্ম্মকে ক্ষতবিক্ষত করিতে উদ্যত হয়। তাই শরণাগত স্বভক্তপালক শ্রীভগবান্ নিজজনকে রক্ষা করিবার জন্যই অভেদ্য কবচ সদৃশ **"সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ"** এই উপদেশ বিধান করিলেন। ভগবদ্ভক্তগণ ভগবৎপ্রদত্ত এই অভয় কবচ হৃদয়ে ধারণ করিয়া **ভগবৎপ্রীতিকর সত্য দয়া ক্ষমা অহিংসা** প্রভৃতি মহাব্রত সর্ব্বাবস্থায় অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হয়েন।

দুঃখ তাপ অপমান নির্য্যাতন নিন্দা হিংসা দ্বেষাদি যখন হৃদয়ে নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠে তখন তাঁহারা 'আমারই মঙ্গলের জন্য এ সব শ্রীভগবানের করুণার দান' ইহাই মনে করিয়া সর্ব্বদা সন্তুষ্টই থাকিতে চেষ্টা করেন। **সন্তোষই শান্তির মুল, অশান্তস্য কুতঃ সুখম্।** সন্তুষ্ট থাকার নামই **আত্মারাম** হওয়া।

কিন্তু এই সকলের মূলই **সদাচার**। বিশেষতঃ প্রথমে যদি সৎদিগের আচরণই আমার শিক্ষণীয় না হয়, বরং তাহার বিরুদ্ধই আচরণ হয়, তাহা হইলে সৎ মহাপুরুষের কৃপা বা তাঁহাদের ধর্ম্ম সত্য দয়া ক্ষমাদি লাভ অসম্ভব, যেহেতু প্রথমেই সতের বিরুদ্ধাচরণ করিলে আর তাঁহাদের সদ্‌গুণ উপার্জ্জন কি প্রকারে হইবে? সতের আচারের বিরুদ্ধ আচরণই এবং তাঁহাদের আচারের প্রতি অবজ্ঞাই ত সতের বিরুদ্ধাচরণ হইল। **আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ।**

"সত্যে ক্বচিদ্ভয়ং নাস্তি"

সত্যম্

পরমস্নেহাস্পদ—

শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বসু, বি. এ.

আণ্ডার সেক্রেটারী, প্যালেস, ত্রিপুরা রাজ্য।

মদীয় **শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে** অর্পিত **কুসুমাঞ্জলির** এই **নির্ম্মাল্য** আমার স্নেহাশিস্ রূপে আপনাকে প্রদান করিলাম। ইহা আপনাকে অমৃতময় জীবন দান করুক।

শ্রীভাগবতস্বামী।

সত্যটি ভাল করিয়া বুঝা চাই এবং সত্যের আশ্রয় লইয়া সত্যের সেবা করিয়া সত্যব্রত হওয়া চাই। সত্যব্রত হইতে পারিলেই 'সত্যে ক্বচিদ্ভয়ং নাস্তি' এই বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি হয়।

সকল সত্যের পরম সত্য শ্রীভগবান্—**সত্যং পরং ধীমহি, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।** সেই মূল সত্য শ্রীভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া এবং তাঁহাতেই লক্ষ্য রাখিয়া, এই জগতের সত্যভাষণ, সত্য ব্যবহার, সত্যভাবনাদিকে তাঁহারই বিভূতি মনে করিয়া সত্যের সেবা করিতে পারিলে আর কদাপি কুত্রাপি ভয় থাকে না। নতুবা মূলসত্য ভগবান্‌কে ভুলিয়া, তাঁহাতে লক্ষ্য হারাইয়া, কেবল জাগতিক সত্যভাষণ এবং সত্য ব্যবহারাদি রূপ সত্যের আশ্রয়ে নির্ভয়

হওয়া যায় না। বস্তুতঃ মূল সত্য ভগবান্‌কে ভুলিয়া কেবলমাত্র এই জগতের ব্যবহারিক সত্যের আশ্রয় লইতে গেলেও প্রকৃত সত্যকে আশ্রয় করা হয় না। এই জাগতিক সত্যভাষণাদি ব্যবহারিক সত্যটি শাখাপল্লব স্থানীয়; মূল বৃক্ষের আশ্রয় না লইয়া শাখাপল্লবের আশ্রয়টি কচিৎ ক্ষণকালের জন্য হইলেও তাহা আত্যন্তিক স্থায়ী হয় না। সেইরূপ মূল সত্য শ্রীভগবান্‌কে আশ্রয় না করিয়া কেবলমাত্র সত্য কথা বলিব, মিথ্যা বলিব না, সত্য ব্যবহার করিব, মিথ্যা ব্যবহার করিব না, ইত্যাদি শত সহস্র প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক তাদৃশ সত্যপালনে সচেষ্ট হইয়া কিছু কিছু প্রতিপালন করিলেও এই দুর্ব্বার সংসার সমুদ্রের ক্ষুৎপিপাসা জরামৃত্যু শোকমোহাদি অনন্ত তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে স্থির থাকা সম্ভবপর নহে। কিন্তু ঐ ব্যবহারিক সত্যের মূলে পরম সত্য শ্রীভগবান্ আশ্রয় থাকিলে সত্যও স্থির থাকিবে। সুতরাং **সত্যে ক্বচিদ্ভয়ং নাস্তি** ইহা জীবনে সার্থকই হইবে। আবার যদি কেহ সকল সত্যের মূল সত্য শ্রীভগবান্‌কে আশ্রয় করেন, অথচ তাঁহারই বিভূতি স্বরূপ এই সত্যভাষণ সত্যব্যবহারাদির ব্যভিচার করেন, অর্থাৎ শ্রীভগবন্নামাদি সাধন জপ তপ আদি করেন, অথচ মিথ্যাভাষণ মিথ্যাচরণ প্রভৃতি কপট আচরণে সত্যের ব্যভিচার করেন, তাহা হইলে যেমন অঙ্গকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অঙ্গীকে বাঁচাইয়া রাখিলেও অঙ্গের অভাবে অঙ্গী পুষ্ট হইতে পারে না, তদ্রূপ তাদৃশ ভগবদাশ্রয়ও প্রকৃত ফলপ্রদ হয় না। বস্তুতঃ উহাকে পরমসত্য শ্রীভগবানের নিষ্কপট আশ্রয় বলা যায় না। সুতরাং সত্যরূপে অর্থাৎ নিষ্কপটভাবে সত্যের সেবা করা না হইলে সত্যের সেবাই হয় না, ইহা বুঝা উচিত।

সত্যের মর্ম্ম কি? কেবলমাত্র যথার্থ বাক্য অর্থাৎ যাহা দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি অথবা যাহা বুঝিয়াছি তাহাই সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষেত্রে বলার নাম সত্য নহে; কিম্বা তাহার ব্যবহারও সর্ব্বক্ষেত্রে সত্যাচরণ নহে। সব স্থলে সেই রকম সত্যাচরণে গুরুতর ধর্ম্মনাশ ও লোকনাশের সম্ভাবনা আছে।

মনে করুন কোনও স্থলে আপনি একাকী বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কোন বৃদ্ধ সদ্‌ব্রাহ্মণ ভয়কম্পিত কলেবরে প্রাণরক্ষার্থ আপনার নিকট দিয়া দৌড়াইয়া যাইয়া কোনও গুপ্তস্থানে লুক্কায়িত হইলেন—ইহা আপনি

দেখিলেন; পরক্ষণেই কতকগুলি দস্যু উন্মুক্ত তরবারি হস্তে আপনার সম্মুখে আসিয়া প্রশ্ন করিল, "এই পথে কোন ব্রাহ্মণকে যাইতে দেখিয়াছ? সে কোথায়?" এই স্থলে তাহাদিগকে দস্যু বলিয়া অবগত হইয়াও আপনি যদি বাক্যের সত্যতা রক্ষার জন্য সত্য কথা বলেন তাহা হইলে তাদৃশ ব্রহ্ম-হত্যারূপ গুরুতর অধর্ম্ম হইবে না কি? এই প্রকার পরোপকার প্রভৃতি স্থলেও ধর্ম্মবিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে কার্য্যের গুরুতা লঘুতা দ্বারাই ধর্ম্মের বলাবল বিচার করিতে হইবে। তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন, **"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।"** কেবলমাত্র যথার্থভাষণকে সত্য বলা যায় না। কেবল যথার্থ কথা বলাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে কোনও দোষকারী ব্যক্তির দোষকীর্ত্তন করাও সত্যের মধ্যে গণ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু তাদৃশ অপরের দোষকীর্ত্তনকে সাধু পুরুষেরা নিন্দা বলিয়াই মনে করেন এবং তাহাতে ঘৃণা প্রকাশ করেন। পরের দোষকীর্ত্তনটি সত্য ভাষণ হইলেও সাধু ব্যক্তির প্রিয় হয় না। যাহা সত্য এবং প্রিয় হইবে তাহাকেই সত্য বলিয়া সাধুপুরুষেরা স্বীকার করেন। প্রিয় বলিতে আপাততঃ শ্রুতিসুখকর মাত্র নহে, লোক-হিতকর এবং হৃদ্য এই উভয় অর্থই বুঝাইবে। সুতরাং হৃদ্য এবং লোকহিতকর যে সত্য বাক্য তাহাকেই সত্য বাক্য বলিয়া সাধুপুরুষগণ গ্রহণ করেন। **"সত্যঞ্চ সুনৃতা বাণী", "তস্মাৎ পরীক্ষ্য সর্ব্বভূতহিতং সত্যং ব্রূয়াৎ"** (ব্যাসভাষ্যম্)। **প্রকৃত সত্যের সেবা দ্বারা পরম সত্য শ্রীভগবান্‌কে সন্তুষ্ট করাই সকল সত্যের মূল তাৎপর্য্য।**

সত্য সেবার সম্বন্ধে আমার নিজের জীবনের বাল্যকালের একটি ঘটনা এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। আমার পূর্ব্বাশ্রমের সন্নিকটে সদাচারী বৈরাগ্যবান্ এবং সুপণ্ডিত একটি ব্রহ্মচারী ছিলেন। আমি যেখানে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতাম সেই স্থলে প্রায়শঃই তিনি আসিতেন। তিনি আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি বিদ্যার্থী বালকদিগকে 'সদা সত্যং ব্রূয়াৎ' এই উপদেশ দিতেন এবং বলিতেন, "সত্যকে সেবা কর, সত্য দেবতা তোমাকে রক্ষা করিবেন।" একদিন একটি বালক তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার একটি প্রিয় দ্রব্য অসাবধানতাবশতঃ নষ্ট করিয়া অতিশয় ভীত হইয়া পড়িল। আমি তাহাকে বলিলাম, "সত্য কথা বল্‌বি, সত্য কথা বল্‌লে সত্য দেবতা রক্ষা কর্‌বেন,

কোন ভয় নাই, ব্রহ্মচারীর নিকট শুনিস্ নাই?" বালকটি আমার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তাহার জ্যেষ্ঠের নিকট সত্যই বলিল। বলা মাত্রই তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সজোরে তাহার গণ্ডস্থলে চপেটাঘাত করিলেন, বালকটি অতিশয় আঘাত পাইয়া চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল। আমি অধিকতর মর্ম্মাহত হইয়া অন্যের অলক্ষিতে অশ্রুমার্জ্জন করিলাম; মনে হইতে লাগিল, "কোথায় সত্য দেবতা? কই তিনি ত বালককে রক্ষা কর্‌লেন না! ব্রহ্মচারীকে বড় ভক্তি শ্রদ্ধা করি, মহা সাধুপুরুষ ব'লে ধারণা করি, কিন্তু তাঁর বাক্য মিথ্যা হ'ল?" আমার ধারণা ছিল যে গোপাল নামক দরিদ্র বালকের "দীনবন্ধু" দাদার মতই সত্য দেবতাও দাদা হইয়া মানুষকে রক্ষা করেন। এ স্থলে সত্য দেবতার কোন উদ্দেশ না পাওয়ায় মনে বড়ই দুঃখ হইল। ক্ষোভে দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া সেই বালকটিকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মচারীর আশ্রমাভিমুখে রওনা হইলাম। তাঁহার নিকট যাইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বলিয়া প্রশ্ন করিলাম, "ব্রহ্মচারীজি, আপনার সত্য দেবতা ত রক্ষা কর্‌লেন না, আপনার বাক্য কি সত্য নহে?" ব্রহ্মচারী বলিলেন, **"তোমরা কি সত্যের সেবা ক'রেছ যে সত্য তোমাদিগকে রক্ষা কর্‌বেন?** তোমরা সত্য দেবতার ঘাড় ভেঙ্গেছ, নাক মুখ চোখ ক্ষত-বিক্ষত ক'রেছ, তাঁর হাত পা ভেঙ্গে খোঁড়া ক'রেছ; সেই জ্বালায় আমার সত্য দেবতা ছট্‌ফট্ কর্‌ছেন; খোঁড়া পায়ে আস্‌তে পার্‌লেন না ব'লে কি সত্য দেবতার দোষ?" আমি ত অবাক্— ব্রহ্মচারী বলেন কি? বড় আশ্চর্য্য কথা! সঙ্গীয় বালকটি প্রশ্ন করিল, "আমরা দেবতার হাত পা ভাঙ্গ্‌লাম কেমন ক'রে? দেবতাকে কেহ কি কখন কাণা খোঁড়া কর্‌তে পারে?" ব্রহ্মচারী বলিলেন, হাঁ, পারে; তোমরাই "দেবতাকে কাণা খোঁড়া কর। মানুষেই দেবতাকে গড়ে, আবার মানুষেই ভাঙ্গে, কাণা খোঁড়াও করে।" ব্রহ্মচারী বলিতে লাগিলেন, "ভাল ক'রে মন দিয়ে শোন; জীবনে যদি কখন দেবতার দর্শন লালসা মনে উদয় হয় তখন এই উপদেশগুলিকে স্মরণ ক'রো এবং যদি ঠিক ঠিক মত কায কর্‌তে পার তা হ'লে দেবতার দর্শন লাভে কৃতার্থ হবে।" আমি তখন ব্যাকুল হইয়া বিনয় সহকারে বলিলাম, "বলুন, বলুন, ভাল ক'রে বলুন।" ব্রহ্মচারী আমার প্রতি সস্নেহ করুণ নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "শোন, সত্য কথা বলাই সত্য দেবতার

চরণ, সত্যের সঙ্কল্প করাই সত্য দেবতার বক্ষঃস্থল, সত্য ব্যবহারটি তাঁহার চক্ষুঃকর্ণাদি সমন্বিত মস্তক, সদ্বিবেক অর্থাৎ জ্ঞান তাঁহার বাহুযুগল, ধৈর্য্য তাঁহার করদ্বয়, ক্ষমা তাঁহার অঙ্গুলি সমূহ, বিনয় তাঁহার জঘন, শৌচ তাঁহার উরুদ্বয়, আর সমদর্শন এই সকল অবয়বের একমাত্র ধারক মেরুদণ্ড। এই সকল পদার্থ দিয়ে সত্য দেবতাকে তোমার মধ্যে গঠন কর দেখি।" আমি বলিলাম, "প্রাণ প্রতিষ্ঠা কই? এই দেবতার আত্মা কে?" ব্রহ্মচারী গদ্‌গদ কণ্ঠে **'নারায়ণ, নারায়ণ'** উচ্চারণ করিলেন। তিনি বলিলেন, "সর্ব্বজীবের পরমাত্মা বিশ্বাধার **নারায়ণই এই সত্য দেবতার আত্মা, শ্রীভগবদ্ভক্তিই প্রাণ, ভগবৎপাদপদ্মে আত্মসমর্পণই প্রাণপ্রতিষ্ঠা।** এই দেবতাই সত্য-নারায়ণ দেবতা, এই দেবতাকে তোমার নিজের মধ্যে স্থাপন কর, তোমার মনকে পুরোহিত ক'রে পূজা কর। দেখ, 'নাদেবো দেবমর্চ্চয়য়েৎ' এই শাস্ত্র-বাক্য বলে, 'দেবতা না হইয়া দেবতা পূজা করিবে না।' 'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ', 'নিজে দেবতা হইয়া দেবতাকে পূজা করিবে।' নিজের মনঃপ্রাণাদিকে সত্যে ভাবিত করার নামই দেবতা হওয়া।" ব্রহ্মচারী অশ্রুপ্লাবিত নয়নে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বল, **সত্যং শিবং সুন্দরম্।**" আমিও অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে বলিলাম, **"সত্যং শিবং সুন্দরম্।"** ব্রহ্মচারী তাঁহার সেবিত শালগ্রামশিলারূপী নারায়ণের প্রতি স্থির দৃষ্টিপাত করিয়া কেমন বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

কিয়ৎকাল পরে তিনি আবার আরম্ভ করিলেন, "এমন সুন্দর ঠাকুরকে তোমরা কাণা খোঁড়া ক'রে দেও, তোমাদের মনে দুঃখ হয় না? তোমাদের বুকে বাজে না? দেখ দেখি তোমরা কত নিষ্ঠুর!" এবার আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম; ব্রহ্মচারী আমাকে কোলের কাছে টানিয়া নিলেন; আমি কিছু স্থির হইয়া বলিলাম, "দেবতাকে কাণা খোঁড়া করিলাম কি দিয়ে বুঝ্‌তে পারি নাই।" তিনি বলিলেন, "তোমার মধ্যে যে হিংসা দ্বেষ গর্ব্ব প্রভৃতি দুষ্ট প্রবৃত্তি সকল আছে সেইগুলিই শাণিত অস্ত্র, ঐগুলির দ্বারায় তোমরা অঙ্গহানি ক'রে থাক।" আমি বলিলাম, "ভাল বুঝি নাই।" ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার সমবয়স্ক কোন বালক তোমাকে হিংসা কর্‌লে বা তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কর্‌লে বা গর্ব্ব প্রকাশ কর্‌লে বা ক্রোধ কর্‌লে তুমি মনে ব্যথা পাও

কি ?” আমি উত্তর করিলাম, “পাই।” “তোমার মনে জ্বালা হয় কি ?” “হয়।” “প্রতিকারের চেষ্টা কর ?” “করি।” এবার হাস্য সহকারে তিনি বলিলেন, “বল দেখি ঐগুলি কেমন ধারাল অস্ত্র।” আমি বলিলাম, “খুব ভয়ানক।” তখন আমার পৃষ্ঠে মৃদু আঘাত করিয়া তিনি বলিলেন, “তাই বুঝি তোমাকে কেহ কিছু একটু মন্দ বল্‌লে একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠ, না ?” আমি লজ্জায় অভিভূত হইলাম। ব্রহ্মচারী বলিলেন, “শোন, তোমরা দৈনিক রাশি রাশি মিথ্যা কথা ব'লে থাক, নিজে অন্যায় কর্ম্ম ক'রে সেই অন্যায় কর্ম্মের দণ্ড হ'তে ফাঁকি দিয়ে ত্রাণ পাবার লালসায় দৈবাৎ এক আধটা সত্য কথা ব'লে ত্রাণ পেতে চাও এবং ঢাক পিটিয়ে সত্য বলেছি ব'লে নিজের গর্ব্বের দাবীও কর্‌তে চাও। কিন্তু নিজের অন্যায় কর্ম্মের ত কোন প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে চাও না! এই হরিচরণ যদি তখন সত্যহৃদয়ে সত্যকে আশ্রয় ক'রে তার দাদাকে বল্‌ত, 'আমি দৈবাৎ অন্যায় ক'রে ফেলেছি, অন্যায়ের যা দণ্ড হয় তা আমি ভোগ কর্‌তে বাধ্য, আমাকে যে দণ্ড দিলে আপনি সুখী হন সেই দণ্ডই আমার প্রতিবিধান করুন,' তা হ'লে বস্তুতঃ তার সত্য বলাই হ'ত। তা হ'লে দেখ্‌তে সত্য দেবতা তার দাদার অন্তর্যামী রূপে তাঁর হৃদয়কে দ্রবীভূত ক'রে দণ্ড ক্ষমা করা'তেন। তেমন ভাবে তোমরা সত্য কথা বলও না, ফলও পাও না। সত্য দেবতার দোষ কি ? দেখ তুমি কাহারও সত্য কুৎসাই কর্‌লে—ইহা ত আর সত্যের সেবা করা হ'ল না; মনে কর যেমন এই হরিচরণ কোন দুষ্ট কর্ম্ম কর্‌ল, কোন সময়ে হরিচরণের সঙ্গে তোমার ঝগ্‌ড়া হ'ল, তুমি সেই হিংসায় হরিচরণের দাদার নিকট তার দুষ্ট কর্ম্মের কথাগুলি ব'লে দিয়ে তার পিঠের উপর দাদার হাতের দেওয়া তোমার সত্যের ফল দেখ্‌বার লোভে বেড়ার আড়ালে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে লুকিয়ে থাক্‌লে; বল দেখি এই কি সত্যের সেবা ? হরিচরণের দুষ্ট কর্ম্মের কথা ত সত্যই বলেছ,—এইরূপ সত্যকথা বলায় সত্য দেবতা কি তোমার উপর সন্তুষ্ট হবেন ? তোমরা অন্তরে সত্য দেবতার চারি পাশে মনের হিংসা আগুন জ্বালিয়ে সত্য দেবতাকে দগ্ধ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লে সেই দেবতা তোমাদিগকে রক্ষা কর্‌বেন কেন ? **সত্য দেবতার দোষ দিও না, নিজেদের দোষ খোঁজ, বুঝ্‌লে ?”** আমি বিস্মিত নেত্রে ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিলাম। সত্যের অপলাপ করিয়া সত্যকে কত দুর্দ্দশাগ্রস্ত

করিয়াছি তাহাও মনে করিয়া ব্যথিত হইলাম, আর কিছু বলিতে পারিলাম না। নারায়ণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ব্রহ্মচারীর চরণধূলি গ্রহণ করিলাম, তিনি আমার মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সত্যকে আশ্রয় করিলে শান্তিতে অবস্থান করা যায়। বৃথা ক্রোধ অভিমান দম্ভাদি সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তিকে অভিভূত করিতে পারে না। যেমন মনে করুন কোন ব্যক্তি আপনাকে শঠ প্রবঞ্চক ইত্যাদি প্রতিপন্ন করিয়া আপনার কোন বন্ধুর নিকট নিন্দা করিল; আপনি তাহা শ্রবণ করিয়া সেই নিন্দুক ব্যক্তির প্রতি নিশ্চয়ই অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনার মনে কতরকম দম্ভ গর্ব্ব হিংসাদির তরঙ্গ প্রবলবেগে উদিত হইবে; কিন্তু সে স্থলে সত্যকে আশ্রয় করিয়া যদি বিচার করেন তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই শান্তিলাভ করিবেন। বিচার করুন, নিজের ভিতর বাহির ভাল করিয়া অনুসন্ধান করুন,—সত্যই আপনি শঠ প্রবঞ্চক কি না। যদি অনুসন্ধানে সত্যই ঐ দোষ সমূহ নিজেতে দেখিতে পান তাহা হইলে আর ক্রোধাদির আবির্ভাবের অবকাশ থাকিবে না, তখন মনে হইবে, 'সত্যই ত আমি দোষী, আমি যখন দোষ করিয়াছি তখন লোকে আমাকে দোষী বলিবে না কেন? লোকে না বলিলেও ত আমি জানি আমি কত দোষী, তবে আমি ক্রোধাদি করি কেন? আমি দোষ করিয়া বাহিরে দোষ ঢাকিবার জন্য ক্রোধাদি প্রকাশ করিয়া মিথ্যা সাধুর সাজ পরিতেছি, ইহা ত গুরুতর কাপট্য।' আর যদি অনুসন্ধানে তাদৃশ দোষ নিজেতে দেখিতে না পান তাহা হইলেও আপনার ক্রোধাদির অবসর থাকিবে না। কারণ তখন আপনার হৃদয় সত্যের বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিবে। তখন আপনি সত্যানন্দের স্নিগ্ধ ধারায় সিঞ্চিত হইয়া শীতলই থাকিবেন, ক্রোধাগ্নির উষ্ণ জ্বালায় উত্তপ্ত হইবেন না, মনে হইবে, 'আমি ত সত্য দোষী নহি, আমার নিকট ত আমি দোষী নহি, বিশ্বতশ্চক্ষু সর্ব্বদ্রষ্টা ভগবান্ ত জানেন আমি দোষ করি নাই, তবে আমার ভয় কিসের? যাঁহারা সাধু ব্যক্তি তাঁহারাও আমার ব্যবহার দেখিবেন, বুঝিবেন আমি দোষী কি নির্দ্দোষ। ক্রোধ দম্ভাদি প্রকাশ করিয়া নিজেকে নির্দ্দোষ স্থাপনের বৃথা চেষ্টা করিব কেন? এই সমস্ত মনে হওয়ায় আপনার অন্তর স্নিগ্ধ থাকিবে, আপনি শান্তিও লাভ করিবেন।

যদি বলেন,—সেই মিথ্যা নিন্দাকারীকে শাসন করা ত উচিত? তাহার উত্তরে বলি,—কেন আপনি তাহাকে শাসন করিবেন, নিন্দার ভয়ে কি সত্যের জয় হউক এই অভিপ্রায়ে? নিন্দার ভয়ে নিন্দুককে দমন করিবার জন্য নিজের সত্যতা খ্যাপনের চেষ্টা **দম্ভ মাত্রই**। প্রকৃত সত্য-সেবক ব্যক্তি নিজের ক্ষুদ্র অতিসঙ্কীর্ণ লাভ যশঃ প্রতিষ্ঠার লালসায় সত্যতা খ্যাপনের চেষ্টা করেন না, কেননা উহা সত্যের সেবা নহে, সত্যের নামে নিজেরই সেবা। উহাও কাপট্য, সুতরাং সত্য নহে। সত্যে নিন্দার ভয় থাকে না। যে সত্যের মূলে **বিদ্বেষ ক্রোধ দম্ভ জিগীষা** প্রভৃতি অন্তঃকরণের হীনবৃত্তি সকল বৃদ্ধি পাইয়া নানারূপ অশান্তি আনয়ন করে তাদৃশ **সত্যের মূল্যই** বা কি? ইহা বাহিরে সত্যের মত দেখাইলেও প্রকৃত স্বরূপে সত্য নহে। কারণ সত্যে বৈষম্য থাকিতে পারে না। **"সত্যঞ্চ সমদর্শনম্।"** সমদর্শন কাহাকে বলে? ঈর্ষা অসূয়া প্রভৃতি বৈষম্যভাবকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বভূতের সুখদুঃখের সমান আলোচনা (অনুভব) করার নামই সমদর্শন। নিজের পদে কণ্টক বিদ্ধ হইলে যেমন দুঃখ অনুভব করা যায় তদ্রূপ অন্যের পদে কণ্টক বিদ্ধ হইলে তাহার মুখবিকৃতি আদি সূচিত দুঃখ দর্শনে যদি নিজ দুঃখের সমান দুঃখ বোধ হয় তাহা হইলে তাহাকে সমদর্শন বলা যায়।*

আর যদি বলেন,—সত্যের জয় দেখাইবার জন্যই নিজের যে দোষ নাই তাহা ত প্রকটন করা উচিত? ইহার উত্তরে বলি,—সত্যের জয় হউক ইহা অতি উত্তম অভিপ্রায়। সেটি কিন্তু নিজের প্রৌঢ়িবাদের দ্বারায় কর্ত্তব্য নহে। নিজের আচরণে যখন সজ্জনেরা অবগত হইবেন যে বস্তুতঃ আপনি শঠ বা প্রবঞ্চক নহেন তখন তাঁহারা তাদৃশ নিন্দুকের নিন্দায় আর বিশ্বাস করিবেন না। তখন আপনার সত্যের জয় সত্যই স্বয়ং ঘোষণা করিবেন। ক্রোধ বিদ্বেষ দম্ভ প্রভৃতি হীন বৃত্তি সমূহকে প্রশ্রয় দিয়া বস্তুতঃ পক্ষে সত্যের জয় ঘোষণা হয় না, বরং সত্যটি অশান্তিকলুষাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। সত্যের স্বরূপ কিন্তু তাহা নহে। **সত্যং শিবং সুন্দরম্**—ইহাই সত্যের স্বরূপ।

---

* আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং……………… ॥ শ্রীগীতা।

যদি সত্যের আলোকে হৃদ্‌গত মিথ্যা অন্ধ তমিস্রকে বিধ্বস্ত করিয়া সত্যের সর্ব্বতোমঙ্গল পরম সুন্দর স্বরূপের উপলব্ধি করিবার বাসনা হয় তাহা হইলে সকল সত্যের মূল পরম সত্য **শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দে** সর্ব্বতোভাবে প্রপন্ন হউন।

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যং ঋতসত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত।

সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতং।
সত্যাৎ সত্যো হি গোবিন্দ স্তস্মাৎ সত্যো হি নামতঃ॥
উদ্যমপর্ব্ব, মহাভারত।

"নাস্তি পুণ্যং দয়াসমম্"

দয়া

পরমস্নেহাস্পদ—

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

উকিল, হাইকোর্ট, ত্রিপুরা রাজ্য।

মদীয় **শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে** অর্পিত **কুসুমাঞ্জলির** এই **নির্ম্মাল্য** আমার স্নেহাশিস্ রূপে আপনাকে প্রদান করিলাম। ইহা আপনাকে **শ্রীগুরু-করুণামৃতে** অভিষিঞ্চিত করুক।

শ্রীভাগবত স্বামী।

দয়া কাহাকে বলে? পরের দুঃখনাশের ইচ্ছাকেই দয়া বলে। অন্যের দুঃখে চিত্ত দ্রবীভূত হইলে সেই দুঃখনাশের উদ্দেশ্যে কায়িক বাচিক মানসিক চেষ্টার দ্বারা তাহার উপকার করিবার নিমিত্ত যে ইচ্ছার প্রবৃত্তি তাহাকেই দয়া বলে। পরোপকার কথাটি শুধু পরের উপকার নহে। পরের উপকারের সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও "পর" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ উপকার হয়। কেবলমাত্র কিছু অর্থ দান বা যৎকিঞ্চিৎ শারীরিক কার্য্য অথবা বাচিক সাহায্য করিলেই যে হইল তাহা নহে, প্রধান লক্ষ্য পরের দুঃখে কাতরতা। পরের দুঃখ দর্শনে অন্তঃকরণের এই দ্রবাবস্থাটি একটি অমৃতের ধারা। যাহার হৃদয়ে এই দ্রবাবস্থার অভিব্যক্তি যত বেশী পরিমাণে হয় তাহার হৃদয় তত পরিমাণে অমৃত ধারায় অভিষিক্ত হইতে থাকে।

বাহিরে পরের উপকারের মত কার্য্য করিলেও যদি চিত্তদ্রবাবস্থার পরিপন্থী ভাবসমূহ হৃদয়ে লুক্কায়িত থাকে তাহা হইলে আর এই অমৃত ধারায় অভিষিক্ত হওয়া যায় না।

পরিপন্থী ভাবগুলি কি?—প্রত্যুপকারের আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া পরের উপকার করা, উপকার করিয়া প্রত্যুপকার না পাইলে খেদ করা, লাভ যশঃ প্রতিষ্ঠাদির বশবর্ত্তী হইয়া অন্যের উপকার করা, এমন কি স্বর্গাদি পরলোকসুখাকাঙ্ক্ষায় উপকার করা, ইত্যাদিই চিত্তদ্রবের পরিপন্থী। এই পরিপন্থী ভাবসমূহ প্রখর কামনাতাপে হৃদয়কে শুষ্ক করিয়া রাখে। ইহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া যে পরের উপকার তাহাই **"পর"** অর্থাৎ **"নির্ম্মল" উপকার।** আর ঐ সকল ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া যে উপকার করা হয় তাহা **"সমল" উপকার।** তেমন সমল উপকারে এই লোকজগতে লাভ যশঃ প্রতিষ্ঠাদি জনিত সাময়িক কিছু কিছু সুখের আভাস প্রাপ্ত হইলেও সঙ্গে সঙ্গে লাভ যশঃ প্রতিষ্ঠা ভঙ্গের ভয়ে ভীত হৃদয়ে স্থায়ী সুখের অনুভব হয় না, প্রকৃত অমৃত ধারায় অভিষেক যে হয় না তাহাতে সন্দেহ নাই। শুদ্ধ সর্ব্বভূতহৃদিস্থিত শ্রীভগবানের সন্তোষার্থে যাঁহারা পরোপকার করেন তাঁহারাই এই নির্ম্মল পরোপকারের অধিকারী হয়েন। বস্তুতঃ শ্রীভগবান্ জীবের হৃদয়ে যে সকল স্বাভাবিক সৎবৃত্তি দান করিয়াছেন সেই বৃত্তিগুলির পরিমার্জ্জন হইলেই জীব পরমানন্দ উপভোগ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারে। মনুষ্য হৃদয়ে **সর্ব্বভূতানুকম্পিতা** নামক যে বৃত্তিটি আছে তাহা পরমেশ্বরের একটি মহা দান বলিয়াই বুঝিতে হইবে। এইজন্য মনুষ্য সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণ কেবল নিজ নিজ, বড় বেশী হইলে নিজ সন্তানের, দুঃখাদি সাময়িক কথঞ্চিৎ মাত্র অনুভব করিয়া তাহার প্রতিকারাদির উপায় কথঞ্চিৎ অবলম্বন করে। কিন্তু মনুষ্যই একমাত্র সর্ব্বজীবের দুঃখাদি অনুভব করিতে সমর্থ। এইজন্যই মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। এই মনুষ্যে যদি পরোপকারিতা না থাকে তাহা হইলে মনুষ্যত্বেরই বিকাশ হয় না। অনেকে অর্থদান, শারীরিক চেষ্টা প্রভৃতির দ্বারা অন্যের সাহায্য করেন, কিন্তু অন্যের দুঃখানুভূতির অভাবে তাঁহাদের চিত্ত কঠিনই থাকে, সর্ব্বভূতহৃদয়ে ভগবান্ই বিরাজ করেন এই ভাব তাঁহাদের হৃদয়ে না থাকায় পরোপকার

করা সত্ত্বেও চিত্ত তাদৃশ কোমল হয় না। মোট কথা পরের দুঃখের অনুভূতি না হইলে চিত্ত দ্রবীভূত হয় না। আবার অন্যের দুঃখে অনেকের হৃদয় সাময়িক একটু দ্রবভাব ধারণ করিলেও কিন্তু কার্পণ্যস্বভাববশতঃ বা আলস্যাদিবশতঃ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অন্যের দুঃখনিবৃত্তির জন্য তাঁহারা কোনও প্রয়াস পান না। এই উভয়টিই প্রকৃত উপকার নহে।

যেটি 'আত্মার' উপকার সেইটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার। জীব শ্রীভগবদ্বহির্মুখ হওয়ায় ভগবন্মায়ার অবিদ্যারজ্জুতে আবদ্ধ হইয়াই সাংসারিক নানাবিধ ক্লেশ পাইয়া থাকে। ইহার মূল কারণ ভগবদ্বিস্মৃতি। এই ভগবদ্বিস্মৃতি অন্ধকার হইতে অন্যকে ভগবৎস্মৃতির আলোকে আনয়নের চেষ্টাই মহা পরোপকার। মনে করুন খঞ্জ বা অন্ধ কোন ব্যক্তিকে দেখিয়া আপনার মনে দয়ার উদ্রেক হইল, আপনি তাঁহাকে কিছু দান করিলেন; কিন্তু ঐ দানের সঙ্গে সঙ্গে আপনার মনে যদি ভগবৎস্মৃতির উদয় হয়, যদি মনে হয়—'হা ভগবন্, হে দীনবন্ধো, এই আতুর জনের প্রতি প্রসন্ন হও, ইহার দুঃখ মোচন কর', এবং যদি ঐ আতুর জনকে বলেন, 'বাবা, সর্ব্বদুঃখনাশন শ্রীভগবান্‌কে ডাক, তিনি তোমার দুঃখ মোচন করিবেন', তাহা হইলে বস্তুতঃই তাহার **পরম উপকারই** করা হইল।

অন্তরে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত দাম্ভিকতা লাভ যশঃ প্রতিষ্ঠাদির লালসারূপ কপটতাকে দূরে পরিহার করিয়া যাঁহারা অপরকে শ্রীভগবদুন্মুখ করিবার উদ্দেশ্যে সদুপদেশ দান করেন তাঁহারা বস্তুতঃ শ্রেষ্ঠ উপকারই করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই দানের তুল্য দান নাই, এই উপকারের সমান আর উপকার নাই; তবে মনে রাখিতে হইবে যেন কপটতা না হয়। মনে করুন, কোনও দুঃখী অসমর্থ দরিদ্র ক্ষুধাতুর ব্যক্তি আপনার নিকটে কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রার্থী হইল। আপনি তাহাকে বলিলেন, "বাবা, ভগবৎ সাধন ভজন কর, সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ কর, সর্ব্বদুঃখের মোচন হইবে।" এই প্রকার সদুপদেশ দান করিয়া বিড়ি সিগারেট ক্রয় করিয়া ধূমপান করিতে করিতে চলিয়া গেলেন, অথবা নিজের দেহেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর বিলাসদ্রব্যাদি ক্রয় করিতে গেলেন, গৃহে যাইয়া চর্ব্ব্যচোষ্যাদির দ্বারা নিজের উদর তৃপ্ত করিলেন, কিন্তু সেই ক্ষুৎপীড়িত ব্যক্তির কথা স্মরণ হইয়া চিত্ত বিগলিত হইল

না, বা তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য কোনও চেষ্টা আপনার হৃদয়ে স্থান পাইল না। এই প্রকার ভগবত্তত্ত্বোপদেশ **বিত্তশাঠ্যের অপূর্ব্ব কৌশল বিশেষ, গুরুতর কপটতা মাত্র।**

বস্তুতঃ ভগবত্তত্ত্বোপদেশাদি দান করিতে হইলেও জীবের দুঃখের অনুভূতি স্বহৃদয়ে আনা চাই। নতুবা উপদেশটি কেবল অভিনয়েই পর্য্যবসিত হয়।

কোন কোন সাধু সন্ন্যাসী বলেন,—অর্থাদি দ্বারা পরের উপকারে যে দয়া প্রকাশ করা হয় তাহা মায়ারই খেলা। ইহা স্থল বিশেষে আংশিক সত্য হইলেও সর্ব্বত্র সত্য নহে। **দয়া** অনেক স্থলে মায়ারই কার্য্য। যেমন মনে করুন, আপনার স্ত্রীপুত্রাদির কিঞ্চিৎ মাত্র দুঃখ দেখিলে হৃদয় বিগলিত হইয়া উঠে এবং তাহাদের দুঃখমোচনের জন্য অশেষ বিশেষ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই যে দয়া ইহা মায়াই বটে, ইহা মায়ারই কার্য্য।

জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতগাঞ্ছাবচঞ্চুষু।
কণমোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা॥ শ্রীচণ্ডী।

এই দয়াটি আপনার অতি সংকীর্ণ ক্ষুদ্র দেহেন্দ্রিয় মনঃপ্রাণের উল্লাসকর নিজ স্বার্থসুখলালসাপ্রবণ চিত্তেরই ক্রিয়া বিশেষ। বস্তুতঃ ইহা পরসুখ-তাৎপর্য্যে শুদ্ধ পরোপকারের নিমিত্ত কাতর প্রাণের দয়া নহে। **ভগবান্‌কে ভুলিয়া যাহা করা যায় তাহাই মায়া, আর ভগবান্‌কে উদ্দেশ্য করিয়া তাঁহারই সন্তোষ কামনায় জীবহৃদয়ে তাঁহারই অবস্থানজ্ঞানে যে জীব প্রতি দয়া তাহা মায়া নহে।** সাধু সন্ন্যাসী হউন, আর গৃহস্থ বিষয়ী হউন, সকলের পক্ষে ইহা সমান। যে কার্য্যদ্বারা হৃদয়ে ভগবদ্ভাবের বিমল প্রকাশকে আচ্ছন্ন করে তাহাই মায়ার কার্য্য, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। এই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে একটি বিশেষ আখ্যান বর্ণিত হইয়াছেন। শ্রীভগবদবতার ঋষভদেবের পুত্র রাজর্ষি ভরত সসাগরা পৃথিবীর সাম্রাজ্য সুখৈশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্যমার্গ অবলম্বন করিয়া যখন পুলস্ত্যাশ্রমে শ্রীভগবদ্ভজনে নিরত ছিলেন, সেই সময়ে কোন একদিন তিনি একটি সদ্যোজাত মাতৃহীন হরিণশিশুর জীবন রক্ষা করিয়া স্বয়ংই তাহার লালন পালনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে ক্রমশঃ ভগবদ্ভজনে তাঁহার শৈথিল্য আসিতে লাগিল, পক্ষান্তরে মৃগশিশুর প্রতি মমতায় আবদ্ধ হইয়া তাহার

প্রতিপালনে অধিকতর অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। এইরূপে মৃগশাবকের প্রতি ক্রমশঃ স্নেহতন্ময়তা হেতু ভগবদিচ্ছায় তাঁহাকে দেহান্তে মৃগশরীর ধারণ করিতে হইয়াছিল। এই শাস্ত্রীয় উপাখ্যান হইতে সুস্পষ্টই বুঝা যায় যে **দয়া প্রভৃতি সৎকার্য্য সকল হরিবিমুখ হইয়া করিলে তাহাতেও মায়ায় আবদ্ধ হইতে হয়। আর যাঁহারা হরিস্মৃতি রাখিয়া হরিজনের সেবা মনে করিয়া পরোপকার করেন তাঁহারা মায়ায় লিপ্ত হন না।**

বড়ই পরিতাপের বিষয় আজকাল অনেকেই প্রশ্ন করেন, অন্ধ খঞ্জ আতুরজনদিগকে সাহায্য করিয়া দয়া প্রকাশ করা কি ঈশ্বরের প্রতিকূল কার্য্য করা নহে? ঈশ্বর উক্ত ব্যক্তিদিগকে স্বীয় কর্ম্মফলের দণ্ড দিতেছেন। কেহ যদি তাহাদের উপকাব করে তাহা হইলে ঈশ্বরের কার্য্যের প্রতিকূল আচরণ করা হয় না কি?

আজকালই এই জাতীয় প্রশ্নের উদয় হয়। কিন্তু যাঁহারা এই প্রকার প্রশ্ন করেন তাঁহারা একটু স্থির ধীর হইয়া সামান্য বিচার করিলে বুঝিবেন যে আমরা প্রত্যহই প্রতি মুহূর্ত্তেই একে অপরের নিকট কোন না কোন প্রকারে উপকৃত হইতেছি। পিতা পুত্র, স্বামী স্ত্রী, ভ্রাতা ভগিনী পরস্পর পরস্পরের প্রয়োজনীয় আদানপ্রদান দ্বারা পরস্পরকে সাহায্য করিতেছে। আমরা যাহাকে অদৃষ্ট বলি সেই অদৃষ্টটি পরস্পরে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। আমার অদৃষ্টের সঙ্গে আমার পিতার অদৃষ্টের সংযোগ আছে। পিতা পুত্রের সুকার্য্য বা কুকার্য্যাদির দ্বারা সাক্ষাৎ রূপে এবং পরম্পরা রূপে অদৃষ্টের ফল সুখদুঃখাদি ভোগ করেন। পুত্রও পিতার কার্য্যাদি দ্বারা ঐরূপে অদৃষ্ট নিবন্ধন সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে। শুধু ফলভোগ করা মাত্র নহে, ভাবী জন্মেও সুখদুঃখাদি ফলভোগের বীজ স্বরূপ কর্ম্ম ও তত্তৎ বাসনা প্রভৃতিও পরস্পরের সাহায্যেই পরস্পরের সম্পন্ন হয়। অদৃষ্ট বড় বিচিত্র পদার্থ। জীবের এই অদৃষ্ট সংযোগটি ব্রহ্মলোক হইতে রসাতল পর্য্যন্ত দেশ এবং সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত কাল ব্যাপিয়া ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ দেশে কোন্ ক্ষণে কোন্ বস্তু বা ব্যক্তির সহিত কিরূপ আশ্চর্য্যজনক ভাবে আছে তাহা জীবজ্ঞানের অগোচর। এই 'অদৃষ্ট'সমুদ্র তরঙ্গের উপর তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া

আবার তরঙ্গের উপর তরঙ্গের লয় বিধান করিয়া অনন্ত অদৃষ্টের সৃষ্টি এবং লয় করিতেছে। এইরূপে আমাদের প্রত্যেকের অদৃষ্ট চক্র ঘূর্ণায়মান হইতেছে। এখন বিচার করুন একটি খঞ্জ বা অন্ধ আতুর জন আপনার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, আপনি এখানে নিজভাবোচিত কর্ম্মের দ্বারা বা বাসনার দ্বারা পূর্ব্ব অদৃষ্টের ক্ষয় বা বৃদ্ধি এবং ভাবী অদৃষ্টের বীজসৃষ্টিও করিতে পারেন। যদি আপনি ঐ আতুর জনকে তুচ্ছ বোধ করিয়া ঘৃণা সহকারে তিরস্কারাদি করেন তাহা হইলে আপনার পূর্ব্ব দুরদৃষ্টই বর্দ্ধিত হইবে অথবা ভাবী দুরদৃষ্টের বীজ সৃষ্ট হইবে। আর যদি তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহার প্রতি সহানুভূতির ভাব প্রকাশ করিয়া দুঃখমোচনের জন্য ব্যাকুল হয়েন তাহা হইলে পূর্ব্ব শুভাদৃষ্টই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে অথবা ভাবী শুভাদৃষ্টের বীজ সৃষ্ট হইবে। পরমেশ্বর কেবল ঐ ব্যক্তিরই দুষ্কর্ম্মফলভোগের জন্য তাহাকে অন্ধ খঞ্জ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। ঐ ব্যক্তির সঙ্গে আপনারও অদৃষ্টের শুভাশুভ সূচনা করিয়া দিয়াছেন; নতুবা ঐ আতুর ব্যক্তি আপনার সমীপে আসিয়া তাহার করুণ আর্ত্তনাদকে আপনার হৃদয়াভ্যন্তরের গুপ্তদ্বারে পাঠাইত না। আমার মনে হয় শ্রীভগবান্ যে তাদৃশ অন্ধ আতুর খঞ্জ জনকে আমার সমীপে পাঠাইয়া দেন তাহা নিরন্তর নিজ দেহেন্দ্রিয়-তর্পণ-লালসাপর ক্ষুদ্র স্বার্থসুখবিমুগ্ধহৃদয় ঈশ্বরবহির্মুখ হতভাগ্য আমারই মঙ্গলপ্রদ শিক্ষার নিমিত্ত। আমি ঈশ্বরবহির্মুখতার ফলে ঈশ্বরের দণ্ডস্বরূপ কালকর্ম্ম অদৃষ্টাদির তাড়না ভোগ করিয়াও চৈতন্য লাভ করিতেছি না। তাদৃশ শিক্ষার বিধান আমার চেতনতা সম্পাদনের জন্য, আমার মরুসদৃশ কঠিন হৃদয় একটু গলনোন্মুখ হইয়া 'হা ভগবন্' বলিয়া তাঁহার দিকে যাহাতে একটু অগ্রসর হয় তাহার জন্য, নিরন্তর কুকর্ম্মরত ভবিষ্যদন্ধকারাচ্ছন্ন আমার হৃদয় ঈশ্বরের শাসনদণ্ড দর্শনে ভীত হইয়া যদি তাঁহাতে একটু প্রপন্নতার দিকে অগ্রসর হয় তাহার জন্য। নতুবা আমি কি প্রকৃত পক্ষে তাদৃশ আতুর অন্ধ খঞ্জের যাবতীয় দুঃখ মোচন করিতে পারি? আমি যদি মোচন না করি তাহা হইলে জগতে আর কেহ কি নাই যে তাহার দুঃখ মোচন করিবে? সর্ব্বোপরি যিনি বিশ্বম্ভর সর্ব্বদুঃখহারী, তিনি কি তাঁহার সৃষ্ট অন্ধ আতুরের দুঃখ হরণ করিতে পারেন না? তথাপি তিনি যে আমার নিকটে তাহাকে পাঠাইয়া দেন ইহা কেবল

আমার মঙ্গলপ্রদ শিক্ষার নিমিত্ত। **আতুরের আর্ত্তনাদই অন্তর্যামীর করুণ আহ্বান।** তাই মনে হয় **নাস্তি পুণ্যং দয়াসমম্।**

এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে যাঁহারা বিষয়াদি কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীভগবদ্ভজনাদিতে নিরত থাকেন তাদৃশ সন্ন্যাসী সাধু মহাত্মারাও ভগবদ্ভজনের অবিরোধে যথাযোগ্য পরোপকারাদি করিয়া থাকেন। সর্ব্বভূতে অনুকম্পাই সাধুর লক্ষণ। নিজ যোগ্যতা অনুসারে যিনি যে ভাবে পারেন, অর্থাৎ কেহ শরীরের দ্বারা, কেহ বাক্যের দ্বারা, কেহ বা ভগবচ্চরণে প্রার্থনাদি করিয়া মনের দ্বারা, আগন্তুক দুঃখী জনের দুঃখ মোচনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। কেবলমাত্র বৈরাগ্যবেশ অবলম্বন করিয়া ভগবদ্ভজনের দোহাই দিয়া পরের দুঃখ দেখিয়াও তাহার প্রতিকারের যথাসাধ্য চেষ্টা হইতে যাঁহারা বিরত হন এবং যাঁহারা অর্থসামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ভগবদ্ভজনের নামে পরদুঃখ মোচনের কোনও চেষ্টা করেন না, তাঁহারা বিরক্তই হউন বা গৃহস্থই হউন, তাঁহাদের তাদৃশ ভগবদ্ভজন সাধুশাস্ত্রানুমোদিত নহে, উহা একরূপ প্রতারণারই নামান্তর। শ্রীবৃন্দাবনধামে কোন একটি মহাত্মা বৈষ্ণবের মুখে শ্রবণ করিয়াছি,—তাঁহার শ্রীগুরুদেব (কোন গোস্বামিসন্তান) একদিন শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনে রত আছেন, এমন সময় একটি ভিক্ষুক বৈষ্ণব তাঁহার দর্শনাদি-লালসায় তাঁহার সম্মুখে রৌদ্রে দণ্ডায়মান হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তিনি কৃষ্ণার্চ্চনে রত থাকায় সেই বৈষ্ণবকে দেখিয়াও তাঁহার সৎকারাদি করিলেন না। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার পরিচিত অন্য একটি সাধু মহাত্মা সেই স্থানে আগমন করিলেন। তিনি আসিয়াই বৈষ্ণবটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে দাঁড়াইয়া কেন?" বৈষ্ণব উত্তর করিল, "আমি গোস্বামী প্রভুর দর্শনে আসিয়াছি।" তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে আসিয়াছ তাহা গোস্বামী মহাশয় জানিয়াছেন কি?" বৈষ্ণবটি উত্তর করিল, "হাঁ, তিনি আমাকে দেখিয়াছেন, তবে তিনি আহ্নিক করিতেছেন, আমার সঙ্গে আলাপাদি হয় নাই।" তখন উক্ত মহাত্মা গোস্বামী মহাশয়ের পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া বলিলেন, "কি হে গোঁসাইজি, চোখ মুদিয়া কি চিন্তা করিতেছ? তুমি যাঁহার চিন্তা করিতেছ তিনি যে তোমার অঙ্গনে রৌদ্রে পুড়িয়া মরিতেছেন।" এই বাক্য শ্রবণ মাত্রই গোস্বামী প্রভুর চৈতন্য হইল,

তিনি তৎক্ষণাৎ রৌদ্রে দণ্ডায়মান বৈষ্ণবকে সমীপে আহ্বান করিয়া বসাইলেন এবং স্বহস্তে ব্যজন করিয়া তাহার ক্লান্তি দূর করিয়া তাহার সৎকারের ব্যবস্থা করিলেন। তখন উক্ত মহাত্মা সাধু বলিলেন, "এখন তোমার কৃষ্ণ শীতল হইয়াছেন, যাও শীতল কৃষ্ণের চরণ অর্চ্চন কর গিয়ে।" প্রকৃতপক্ষে পরোপকারবিমুখ জনের কৃষ্ণার্চ্চনও সিদ্ধ হয় না! নিতান্ত নিষ্কিঞ্চন সর্ব্বত্যাগী সাধু মহাত্মাগণও অর্থাদির দ্বারা অপরের সাহায্য করিতে না পারিলেও মানসিক শুভচিন্তন দ্বারা এবং শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনাদি দ্বারাও পরের উপকার করিয়া থাকেন।

নিষ্কপটভাবে জীবকে ভগবদুন্মুখ করিবার জন্য চেষ্টা করা রূপ যে পরের উপকার সেটি পরেরই উপকার,—পরের—পরমেশ্বরের, উপ—সাক্ষাৎ, কার—কার্য্য, অর্থাৎ এই প্রকার পরোপকারটি পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ কার্য্য। যাঁহারা এই পরোপকার রূপ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন তাঁহারা মহা ভাগ্যবান্। এই সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র আমিকে লইয়া যাঁহারা ব্যতিব্যস্ত তাঁহারা এই সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের কার্য্য বুঝিতে পারেন না। শ্রীমৎ প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন, "হে প্রভো, এই জগতের জীবসমুদয়কে দুঃখসাগরে নিমজ্জিত রাখিয়া আমি তোমার বৈকুণ্ঠে যাইতেও ইচ্ছা করি না। 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীবই ভগবদুন্মুখ হইয়া সুখী হউক,' এই ইচ্ছাই শ্রীমৎ প্রহ্লাদের শ্রীভগবানে অকৈতব প্রীতির নিদর্শন

"নাস্তি হিংসাসমং পাপম্"

হিংসা

পরম স্নেহাস্পদ—

শ্রীযুক্ত সীতানাথ দেব, বি, এল্,

উকিল, হবিগঞ্জ।

মদীয় **শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে** অর্পিত **কুসুমাঞ্জলির** এই **নির্ম্মাল্য** আমার স্নেহাশিস্ রূপে আপনাকে প্রদান করিলাম। ইহা আপনার জীবনকে ধন্য করুক।

শ্রীভাগবতস্বামী।

হিংসা প্রাণিপীড়নম্। শরীরের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা কিংবা মনের দ্বারা প্রাণীর পীড়া উৎপাদন করাই হিংসা। সদন্তঃকরণ মহাপুরুষগণ বলেন, **"হিংসার মত পাপ নাই, দয়ার তুল্য ধর্ম্ম নাই।"** জগতে যাঁহারা শান্তিলাভ করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা যেন মনে হিংসাবহ্নি প্রজ্বলিত না করেন। হিংসার জ্বালা বিষম জ্বালা। নিজেও পুড়িয়া মরে, অপরকেও পোড়াইয়া মারে। হিংসাবহ্নি হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইলে সত্য দয়া পরোপকার প্রভৃতি যাবতীয় সদ্‌গুণরাশি ক্রমশঃ ভস্মীভূত হইয়া হৃদয়টিকে শেষে শ্মশানভূমি সদৃশ করিয়া তুলে। হিংসা থাকিলে ক্রমশঃ মনুষ্যত্ব লোপ পায়। মনুষ্যত্বলোপের সঙ্গে সঙ্গে পশুবৃত্তি সমূহ বর্দ্ধিত হইয়া শেষে মনুষ্যকে পশুতে পরিণত করে। মানুষ তখন পশু

অপেক্ষাও হিংস্র এবং নৃশংস হইয়া উঠে। তাই মানুষের মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে হিংসা পরিবর্জ্জনের চেষ্টা করা উচিত।

মাৎসর্য্য নামক চণ্ডালের ঔরসে প্রতিষ্ঠাশা নাম্নী পিশাচীর গর্ভে অসূয়া এবং হিংসা যমজ ভগ্নীদ্বয়ের জন্ম হয়। হিংসা রাক্ষসী তুল্যা। ইহা সমস্ত সদ্‌গুণ গ্রাস করে। মাৎসর্য্য, প্রতিষ্ঠাশা, অসূয়া, হিংসা প্রভৃতির একত্র সমাবেশ হইলে তখন গুরুতর নৃশংসতায় হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তখন মানুষ পশুবৎ আচরণে আর সঙ্কোচ বোধ করে না, নিজের ক্ষুদ্র তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী কল্পিত সুখ লালসায় উন্মত্ত হইয়া অপর প্রাণীর প্রতি চরম নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে থাকে। তখন তাহার হৃদয়ে প্রাণিপীড়নের নানা প্রকার অভিনব কৌশল উদ্ভাবিত হইয়া থাকে। বাক্যের দ্বারা, ব্যবহারাদির দ্বারা অযথা অপরের মর্ম্মে সুদৃঢ় আঘাত করিয়া সে আনন্দ উপভোগই করে, পরের প্রতি দ্রোহাচরণ এক অপূর্ব্ব কৌতুকের সামগ্রী বলিয়া বোধ করে। আমার মনে হয় যেমন কোন ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অসহায় ক্ষুদ্র প্রাণী যতই ছট্‌ফট্ বা আর্ত্তনাদ করুক না কেন ঐ হিংস্র পশু তাহার মর্ম্মযাতনার আর্ত্তনাদ স্বীয় কর্ণে শুনিয়াও এবং স্বীয় চক্ষু দ্বারা তাহার আত্মরক্ষার নিমিত্ত অশেষ চেষ্টা এবং পীড়নের যন্ত্রণায় অস্থিরতা দেখিয়াও তাহা নিজের অনুভূতির স্তরে পৌঁছাইতে পারে না, বরং তাহার মুখের গ্রাস যাহাতে পলায়ন না করে তাহারই জন্য অশেষ বিশেষে চেষ্টা প্রকাশ করে, সেইরূপ হিংসাপরায়ণ নৃশংস মনুষ্য নিজ আক্রান্ত অপর প্রাণীর করুণ আর্ত্তনাদ শুনিয়াও এবং তাদৃশ অস্থিরতা দেখিয়াও অপরের দুঃখটি নিজের অনুভূতির স্তরে পৌঁছাইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে দেহস্থিত আত্মচৈতন্যের চিৎপ্রতিবিম্বে প্রকাশিত বুদ্ধিময় কোষটি যখন সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে তখনই অনুভূতি বিবেকাদি বৃত্তিসমূহ প্রকাশ পায়। পশু আদির শরীরে তাদৃশ বুদ্ধিময় কোষের পূর্ণতা নাই; পূর্ণতাই বা বলি কেন, নাই বলিলেই হয়, একটু আভাসমাত্রই আছে, যাহার দ্বারা কেবল নিজের সাময়িক স্থূল সুখ দুঃখ অতি অল্প সময়ের জন্য বুঝিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিময় কোষের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অবয়ব না থাকায় বিশেষ বিশেষ অনুভূতি বা বিচারাদির প্রকাশ পায় না। কোন কোন পশুতে

অপেক্ষাকৃত ঈষদধিক অনুভূতির বা বিচারাত্মক বুদ্ধির আভাস প্রকাশ পাইলেও তাহা স্থায়ী হয় না, ক্ষণস্থায়ী মাত্র; সুতরাং তাহাও একপ্রকার না থাকার মধ্যে। কাজেই অপরের হৃদয়ের যাতনা, দুঃখের কাতরতা, আর্ত্তনাদ প্রভৃতি তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। **পরের উপকার ইচ্ছার স্পন্দন পশুদের হৃদয়ে হয় না।** তবে যে পশু পক্ষী আদির নিজ নিজ সন্তানের প্রতি লালন-পালনের ইচ্ছা এবং তন্নিমিত্ত তাহাদের অতি সামান্য সাময়িক কথঞ্চিৎ সুখ-দুঃখের অনুভব দেখা যায় তাহা কেবল সাময়িক মমতা মোহাতিশয্যে আত্মতুল্য অভিমানবশতঃই হইয়া থাকে, বস্তুতঃ বুদ্ধিকোষের ক্রিয়া নহে, কারণ তাহা হইলে তাহা চিরকাল স্থায়ী হইত। বৃক্ষাদি স্থাবর শরীরের সম্বন্ধেও তদ্রূপই জানিতে হইবে। তবে স্থাবর শরীর অপেক্ষা তাদৃশ পশুপক্ষী কীটপতঙ্গাদি জঙ্গম শরীরে মনোময় প্রাণময় কোষের কিঞ্চিৎ ক্রিয়াধিক্য প্রকাশ পায়। হায়, ভগবৎসৃষ্ট এই মনুষ্যদেহই একমাত্র পঞ্চকোষসমন্বিত, এই জন্যই মনুষ্যশরীর শ্রেষ্ঠ এবং দুর্ল্লভ। এই মনুষ্য শরীরস্থিত বিজ্ঞানময় কোষই পূর্ণাবয়বসমন্বিত। স্বীয় পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ইহজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের সংস্কার দ্বারা ঐ বুদ্ধিময় কোষের সঙ্কোচ বা বিকাশ করিয়া থাকে। ইহা কর্ম্মানুসারেই হয়। মনুষ্য অনায়াসে নিজের প্রতি পীড়াদিজনিত দুঃখের সমান পরের দুঃখ বুঝিতে পারে এবং বিচার দ্বারা সেই দুঃখ প্রতীকারের উপায়ও উদ্ভাবন করিতে পারে। কিন্তু হায়, মাৎসর্য্য, গর্ব্ব, প্রতিষ্ঠাশা, অসূয়া, হিংসা, নৃশংসতায় যখন হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তখন সঙ্গে সঙ্গে ঔদার্য্য, দয়া, ক্ষমা, পরোপকারিতা প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তি-সমূহ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। ক্রমশঃ এইরূপ হইতে হইতে সদসৎ বিচারের উপযোগী বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যের অভাবে বুদ্ধিময় কোষের সদ্‌ভাগের দিক্‌টা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, ক্রমশঃ যেন সে দিক্‌টা অসাড়ের মত হইয়া যায়। সে দিকে আর দয়া দাক্ষিণ্য ক্ষমা ঔদার্য্য পরোপকারিতা প্রভৃতির সাড়া সহজে পাওয়া যায় না। তখন আর্ত্তের সহস্র আর্ত্তনাদে—অত্যাচারে পীড়িত নিঃসহায় আতুরের পাষাণভেদী শত শত কাতর চীৎকারেও তাহাদের হৃদয়াভ্যন্তরে বুদ্ধিময় কোষের সদ্‌ভাগটার দিকে স্পন্দনই হয় না, বরং অসদ্‌ভাগের দিক্‌টা সাহায্য পাওয়ায় পুষ্ট হইয়া নিজের বিক্রমই প্রকাশ করে। ইহাকেই বলে **মানুষের পশুতে পরিণতি।** এখন বিচার করুন এই নশ্বর

ক্ষণভঙ্গুর দেহের তৃপ্তির জন্য ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখলালসায় যাহারা পশু পক্ষী আদি নিরীহ প্রাণীর পীড়ন এবং প্রাণবিনাশ সাধনে তৎপর তাহাদের মনোবৃত্তি কতদূর ক্ষুদ্রতায় আবদ্ধ এবং বুদ্ধিময় কোষের সদ্‌ভাগের দিকে কেমন অসাড় ভাব আসিয়াছে।

বড়ই পরিতাপের বিষয় নিজকে জ্ঞানী বিচক্ষণ মনে করেন যাঁহারা তাঁহাদের তাদৃশ জ্ঞানের বা বিচক্ষণতার পর্য্যবসান কি এইরূপ নিরীহ পশু পক্ষী আদির হিংসন এবং ঘাতনপূর্ব্বক এই স্থুল দেহটার পুষ্টি এবং ইন্দ্রিয়ের ক্ষণিক আরাম ? ছার এই দেহ যতই মার্জ্জন ঘর্ষণ করিয়া পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন করা যাউক না কেন, নির্দ্দয় নির্ম্মম ভাবে পরের বক্ষে ছুরিকাঘাত তুল্য ব্যবহার করিয়া অর্থাদি সঞ্চয়পূর্ব্বক যতই লালন পালন করা যাউক না কেন, অহো তাদৃশ নিরীহ অসহায় পশুপক্ষীদিগের প্রাণ ঘাতন করিয়া নিজের মাংস-পিণ্ডের পুষ্টির চেষ্টা যতই করা যাউক না কেন, কিন্তু এই কুণপটি জরাজীর্ণ গলিত পলিত হইয়া, হয় চিতাভস্ম, না হয় কুক্কুরশৃগালাদির ভক্ষ্য, না হয় কৃমি আদিতে পরিণত হইবেই হইবে ; ইহা ভিন্ন এই দেহের পরিণাম আর কিছু আছে কি ?

অনেক সময় অনেক নিরীহ পশুপক্ষী প্রভৃতিকে খাদ্যাদি দান করিয়া সরল বিশ্বাসী তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া শেষে অতর্কিত ভাবে হঠাৎ বিশ্বাস-হন্তৃত্বের প্রকট মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অম্লানবদনে উৎসাহ ভরে তাহাদের গলদেশে ছুরিকাঘাত করি। হায়রে বিশ্বাসঘাতকতা ! অনেক স্থলে তাদৃশ নিরীহ পশু পক্ষী প্রভৃতিকে কিছুদিনের জন্য স্বহস্তে আহারাদি প্রদান দ্বারা এবং অন্য শত্রু হইতে রক্ষণ পূর্ব্বক তাহাদের লালনপালন, গাত্রমার্জ্জন, গলকণ্ডূয়ন, ক্রোড়ে স্থাপন প্রভৃতি নানাপ্রকার কোমল ব্যবহারে কপট স্নেহের অভিনয় করিয়া অবশেষে সেই শিশুতুল্য স্নেহমুগ্ধ পশুপক্ষী প্রভৃতিকে হত্যা করি,—যাহারা আমার লালন পালনের ভানে প্রবল বিশ্বাসী, যাহারা আমাকে নিজ পিতা মাতা অপেক্ষা অধিক লালক পালক পরম আশ্রয় মনে করে, হায়রে যাহারা অপরের নিকট হইতে কোন প্রকার কিঞ্চিৎ ভীত হইলে আত্মরক্ষার নিমিত্ত নির্ভয় হইবার ভরসায় প্রতিপালক আশ্রয়দাতা পিতা মাতার তুল্য মনে করিয়া সরল বিশ্বাসে ছুটিয়া

আমারই কোলে আশ্রয় গ্রহণ করে, হায়রে কামলোভাচ্ছন্ন মনুষ্যহৃদয়, আজ আমিই তাহাদের হন্তা, আজ আমারই লোভাহুতির দ্বারা বর্দ্ধিত জঠরানলের তৃপ্তির জন্য সন্তানতুল্য, নিজেরই গৃহে নিজ হস্তে লালিত পালিত পশুপক্ষী আদির শরীরটি খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইতেছে। হায়রে বিশ্বাসঘাতকতা! **এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শাস্তা কি কেহ নাই? এই বিশ্বাসঘাতকতার কি কেহ দণ্ডদাতা নাই? আছে, নিশ্চয়ই আছে, সময়ে আছে।**

হায়রে কামকলুষাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র হৃদয়! আমি চাই জগৎ আমার কাছে সত্য বলুক, তাহার হৃদয়ের গুপ্তদ্বার আমার নিকট উন্মুক্ত করুক, আমি কিন্তু মিথ্যা বলিব, শত অর্গলে আমার হৃদয়দ্বার রুদ্ধ রাখিব; আমি চাই জগৎ সুধার মত মিষ্ট বাক্যে আমার সন্তোষ বিধান করুক, আমি কিন্তু নিশিত বাক্যবাণে সকলের হৃদয় শতবিদ্ধ করিব; আমি চাই সারা জগৎ আমার বিলাসবহ্নির ইন্ধন বহন করুক, আমি কিন্তু আতুরের আর্ত্তনাদ আমার শ্রবণপথে প্রবেশ করিতেই দিব না; আমি চাই আমার জঠরানলের তৃপ্তির জন্য, আমার খেয়ালের জন্য, শত সহস্র নিরীহ প্রাণীর প্রাণ বধ হউক, আমি কিন্তু আমার অঙ্গে কাহারও তৃণের আঘাতও সহ্য করিব না। আমি একবারও ভাবি না যে সারা বিশ্বটাকে প্রতারিত করিতে পারি, কিন্তু যিনি বিশ্বতশ্চক্ষু তাঁহাকে প্রতারিত করিব কেমন করিয়া? **তাঁহার নিরপেক্ষ তুলাদণ্ডে আমার অনন্ত নরক যন্ত্রণার গুরুভার আর যে ধরে না!**

"অহিংসা পরমন্তপঃ"

অহিংসা

পরম স্নেহাস্পদ—

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার রায়, বি, এ, বি, এল্,

উকিল, হবিগঞ্জ।

মদীয় **শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে** অর্পিত **কুসুমাঞ্জলির** এই **নির্ম্মাল্য** আমার স্নেহাশিস্ রূপে আপনাকে প্রদান করিলাম। ইহা আপনার জীবনকে ধন্য করুক।

শ্রীভাগবতস্বামী।

সুধী জনেরা হাস্যকৌতুক ছলেও কাহারও পীড়া উৎপাদন করেন না। বস্তুতঃ মনে হিংসার প্রবৃত্তি না থাকিলেও হাস্যকৌতুকাদির ছলেও যে প্রকার বাক্য বলিলে, যে প্রকার ব্যবহার করিলে, অপরে পীড়া অনুভব করে, তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ বা ব্যবহার করা উচিত নহে। প্রথমতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবহার হইতেই অভ্যাসবশতঃ ঐ ভাবগুলি অন্তঃকরণের সংস্কারে পর্য্যবসিত হইয়া পরিণামে ভীষণ হিংসা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। যাঁহারা দয়া ক্ষমা অহিংসা প্রভৃতি হৃদয়ের সৎবৃত্তি সমূহের স্ফুরণে হৃদয়কে উজ্জ্বল করিয়া জগতে **হৃদয়বান্** মনুষ্য হইতে চান তাঁহারা হাস্যকৌতুক ছলেও যেন কাহারও প্রাণে ব্যথা প্রদান না করেন। মোট কথা এই যে **হৃদয় ক্রমশঃ কর্কশ না হইয়া যাহাতে কোমল শীতল থাকে হৃদয়বান্ ব্যক্তি সেই দিকেই সতত লক্ষ্য রাখিবেন।**

অনেকে অনেক সময় বলেন,—পরের দুঃখে কাতর হওয়া, পরের দুঃখ দেখিয়া চক্ষে জল আসা প্রভৃতি হৃদয়দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ। উহা স্ত্রীস্বভাব, এক প্রকার স্নায়ুদৌর্ব্বল্য রোগ বিশেষ, উহাতে হৃদয়ের শৌর্য্য বীর্য্য ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া মানুষকে ক্লীব করিয়া তুলে।

বড়ই পরিতাপের সহিত আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে যদি কেহ **পানের** সাদৃশ্য দেখিয়া **দুগ্ধপানকেও মদিরাপান** বলিয়া আবিষ্কার করেন তাহা হইলে ঋষিবিজ্ঞান উক্ত বিজ্ঞানের নিকট নিশ্চয়ই পরাস্ত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? **দৌর্ব্বল্য** আর **কৌমল্য** এক নহে; সদনুমোদিত শাস্ত্রবিহিত স্বপরমঙ্গলপ্রদ কর্ত্তব্য কর্ম্মের কঠিনতা এবং কষ্টকরত্বাদি দেখিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্তিবিমুখ জড়তাব্যঞ্জক তমোগুণাচ্ছন্ন চিত্তের ব্যাপারের নামই **হৃদয়দৌর্ব্বল্য,** যাহার ফল ভীরুতা, কর্ত্তব্য কার্য্যে বিমুখতা এবং অবসাদ প্রভৃতি। আর সদনুমোদিত শাস্ত্রবিহিত স্বপরমঙ্গলপ্রদ কর্ত্তব্য কর্ম্মে অগ্রসর উৎসাহবর্দ্ধক উজ্জ্বল সত্ত্বগুণোদ্ভাসিত চিত্তের যে ব্যাপার তাহাই **কৌমল্য,** অর্থাৎ দয়া ক্ষমাদি জনিত চিত্তের কোমলতা। পরস্পর বিভিন্ন চিত্তের ভাবদ্বয়কে এক মনে করা অদ্ভুত বিজ্ঞতা! দয়া ক্ষমা প্রভৃতি চিত্তবৃত্তিতে যে কোমলতা থাকে তাহা পরোপকারাদি কর্ত্তব্য কর্ম্মে অগ্রসরতা বর্দ্ধিত করে, বিমুখতা আনয়ন করে না। কোমলতাটি চিত্তের উপর ভীরুতার গাঢ় প্রলেপ না দিয়া বরং স্বীয় স্বার্থত্যাগের বীরতাই প্রকটন করে। দয়া ক্ষমাদি জনিত চিত্তের যে কোমলতা তাহা হৃদয়ে পুঞ্জীভূত অবসাদ আনে না, বরং পরহিতকর কার্য্যের গন্ধেও উৎসাহের তরঙ্গ তুলে। হায়, তমোগুণাচ্ছন্ন হৃদয়ের **দৌর্ব্বল্যই** বা কোথায়, আর উজ্জ্বল সত্ত্বোদ্ভাসিত মসৃণ হৃদয়ের **কোমলতাই** বা কোথায়! হায়রে পাণ্ডিত্য, হায়রে বিজ্ঞতা! যাহা শব্দের অর্থেও পরস্পর বিরুদ্ধ, যাহা তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণেও মিথোবিপরীত, যাহা কার্য্যকারণ ধর্ম্ম বিচারেও বিভিন্ন, এমন দৌর্ব্বল্য এবং কোমলতা এই পদার্থ-যুগলকে এক পর্য্যায় মনে করিয়া সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্রসাধুসম্মত নিজের এবং অপরেরও মঙ্গলপ্রদ দয়াদাক্ষিণ্যক্ষমাদি চিত্তবৃত্তির মস্তকে যাঁহারা কুঠারাঘাত করিতে সমুদ্যত, অভিনব মনস্তত্ত্ববিজ্ঞানবিৎ সেই সমস্ত পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যাভিমান ঘোর কলির নিদর্শন।

ক্রূরতা নির্দ্দয়তা কর্কশতা প্রভৃতি যদি শৌর্য্যবীর্য্যের ভূষণ হয়, আর তাহাই যদি শূরবীরদিগের উপার্জ্জনীয় হয়, তাহা হইলে ব্যাঘ্র সিংহাদি হিংস্রস্বভাব-সম্পন্ন পশুর ন্যায় ব্যবহার যাঁহারা যত বেশী করিতে পারিবেন তাঁহারাই তত বীর বলিয়া গণ্যমান্য হইবেন। আর তাহা হইলে বন্য সমাজ আর লোক সমাজ অচিরে স্বভাবে একাকার হইয়া উঠিবে। **দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার, নিরীহের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার বীরত্ব নহে। অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করা, নিরীহকে ক্রোড়ে স্থান দিয়া বাঁচাইয়া রাখাই বীরত্ব।**

কেহ কেহ এই প্রকার আপত্তি তুলেন,—পশুপক্ষী আদি মারিয়া খাইলে হিংসা হয়, আর ধান্য মুদ্গ শাক ফলাদি খাইলে হিংসা হয় না? জীবহত্যায় যদি পাপ হয় তবে উহাও ত পাপ? প্রাণরক্ষার নিমিত্ত পশু পক্ষী আদি বধ করিলে পাপ হইবে কেন? ইত্যাদি।

এস্থলে আমি অতি বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি,—এইপ্রকার কুতর্ক-কর্কশ হৃদয়ে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। স্থির ধীর ভাবে প্রাচীন আর্য্য ঋষি এবং তৎসদৃশ আচার্য্য মনীষিবৃন্দের বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস রাখিয়া গবেষণার পথে অগ্রসর হইতে পারিলে এ সমস্ত বিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। নতুবা ভ্রান্ত হইয়া বিপথেই পরিচালিত হইতে হয়।

ধান্য মুদ্গ প্রভৃতি জীবদেহঘাতনে পাপ হয় না, ইহা ঋষিজ্ঞান সমুদ্ভূত শাস্ত্রের আদেশ। আর যথেচ্ছ পশুপক্ষী আদির প্রাণঘাতনে **গুরুতর পাপই** হয় ইহাও ঋষিজ্ঞানপ্রসূত শাস্ত্রের বাক্য। ঋষিদিগের দৃষ্টিতে ঘাতনের সমতায় যদি উভয়ঘাতনের ফল সমান হইত তাহা হইলে শাস্ত্রাদিতে তাঁহারা ধান্য মুদ্গাদি ঘাতনকেও পশুপক্ষী আদির যথেচ্ছ প্রাণঘাতনের তুল্য গুরুতর পাপ বলিয়া নিন্দা করিতেন। বস্তুতঃ কিন্তু ধান্যমুদ্গাদি জীবঘাতনের তাদৃশ নিন্দা কোথাও শাস্ত্রে দেখা যায় না। তাঁহাদের কথিত শাস্ত্রাদি যথেষ্ট খাম খেয়াল নহে,—একটু ভাবিয়া দেখা চাই, ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করা চাই। এখন দেখুন ভগবান্ ধান্যমুদ্গযবাদি শস্য জাতীয় তাদৃশ গুল্ম লতা বৃক্ষাদির শরীরকে মানুষের জীবন ধারণ এবং বিশেষ রোগাদির নিবারণের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। অনন্ত অত্যদ্ভুত কর্ম্মফলানুযায়ী তাদৃশ ওষধিবর্গের দেহও তদ্রূপ

হইয়াছে, অর্থাৎ ভগবান্ লোক জীবনের উপায় ফলাদিধারণ এবং পক্কাবস্থাতেই ইহাদিগের স্বতঃই শরীর নাশের বিধান করিয়াছেন, শাস্ত্রেও ইহাদিগের বিনাশে বা তাদৃশ পীড়নে তাদৃশ পাপ হয় না ইহাই বলিয়াছেন। ভগবান্ মানুষের স্বাভাবিক জীবন ধারণ পোষণের উপায়ীভূত করিয়াই ধান্যাদি বৃক্ষগুল্ম-লতাদির সৃজন করিয়াছেন। কিন্তু পশুপক্ষী আদির শরীর মানুষের স্বভাবসিদ্ধ জীবন রক্ষার উপায়ীভূত নহে। পশুপক্ষী আদির দেহ ভক্ষণ বিনাও শস্যাদির ভক্ষণে মনুষ্য অনায়াসে দেহ যাত্রা নির্ব্বাহে সক্ষম হয়। এই স্বাভাবিক শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া অস্বাভাবিক যথেচ্ছ তাদৃশ খাদ্যের প্রতি ধাবিত হওয়া অতিশয় লোভপ্রবর্ত্তিত ইন্দ্রিয়ের **নিন্দনীয় চাপল্য লালসা** ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে এবং পশুপক্ষী আদির প্রাণঘাতনে তৎপরতাকে নিষ্ঠুর পাশবিক হিংসা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? হৃদয়ের এই প্রকার অস্বাভাবিক হিংসাদির বর্দ্ধন করিয়া নিজের দেহ প্রাণাদির গুরুতর ক্ষতি করাই হয়। ক্রমশঃ এই সকল হীন সংস্কারে চিত্ত দৃঢ়বদ্ধ হইয়া লোক জগতেরও ক্ষতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। **পাপ আর কাহাকে বলে?**

ভাল করিয়া বিচার করুন। কুতর্ক পরিত্যাগ করিয়া সত্য পদার্থ বুঝিবার জন্য নিজের মনে মনেই বিচার করিয়া বুঝুন। শুধু তর্কের ঝগড়ায় আপনার জয় হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত মনে প্রাণে সত্য নির্দ্ধারণে শান্তি পাইবেন কি?

দেখুন, একটি ধান্যবৃক্ষ হনন করায়, আর একটি ছাগশিশু নিধন করায় আপনার ক্ষতির পরিমাণে এবং জগতের ক্ষতির পরিমাণে কত তারতম্য আছে তাহা **বিচার** করুন। একটি ধান্য শরীর হনন কালে **হিংসা** এই ভাবটি আপনার প্রাণে সাড়াই দেয় না। কেননা ঐ ধান্যবৃক্ষটি আপনার ঘাতন কার্য্যের কোন প্রতিবন্ধকতা আচরণ করে না। হিংসা কি অহিংসা ইহার কোনও ভাবই আপনার বুদ্ধিতত্ত্বের উপর স্পন্দিত হয় না। একটি ধান্য বৃক্ষকে হনন কালে হননজনিত উহার দুঃখ বা পীড়া হইতেছে ইহা ঐ বৃক্ষটি আপনার নিকট প্রকাশ করে না, নিজকে রক্ষা করিবার জন্য কোনও প্রকার চেষ্টা বা বিকার দেখায় না, সুতরাং ধান্যবৃক্ষের হননে ঠিক আপনার

হিংসা হইল কি না ইহা আপনার বুদ্ধিগম্যই হইতেছে না। কাজে কাজে সেখানে হিংসা হইতেছে ইহা বলা যায় না। কিন্তু একটি ছাগশিশু হননকালে তাহার পলায়ন চেষ্টা, ভয়বিহ্বল চকিতদৃষ্টি, নিজ প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত অশেষ চেষ্টা এবং নিজ প্রাণভিক্ষার মর্ম্মন্তুদ কাতর আর্ত্তনাদে দিগ্‌বিদিক্ স্থিত যাবতীয় প্রাণীর অন্তরে করুণা জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করে। ঐ হন্যমান ছাগশিশুর তাৎকালিক প্রত্যেক চেষ্টার প্রতি স্পন্দনে স্পন্দনে করুণার প্রতিস্পন্দন উচ্ছলিত হইলেও ঘাতুকের লোভ-প্রবর্ত্তিত জিঘাংসাবহ্নিদগ্ধ হৃদয়কটাহে প্রবিষ্ট হইয়াও উহা জলবিন্দুবৎ শুকাইয়া যায়। এখন **দেখুন** ঐ ছাগশিশুর হনন কালে আপনার হৃদয়স্থিত পরদুঃখ-কাতরতা ধর্ম্মটিকে হঠাইবার জন্য করুণার সহিত যেন যুদ্ধ করিয়াই হৃদয়-খানিকে হিংসার উপযোগী নির্ম্মম নিষ্করুণ করিয়া তুলিতে হইতেছে। এই গুরুতর অনিষ্টকর লোভমূলক হিংসাদির দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে করুণহৃদয় সজ্জন-গণের হৃদয়েও ছুরিকা বিদ্ধ হইতেছে। **পাপ আর কাহাকে বলে ?** ফলে ক্রমশঃ ঐ লোভ, হিংসা, জিঘাংসা প্রভৃতি চিত্তের হীনবৃত্তি সকল বৰ্দ্ধিত হইয়া শেষে মনুষ্যাদি উত্তম প্রাণিবর্গের গুরুতর দুঃখেও তাদৃশ কঠিন হৃদয়ে করুণার স্পন্দন আনিবে না। ক্রমশঃ লোভ স্বার্থ সুখাদির ভোগ লালসায় জিঘাংসু হৃদয় পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনীর প্রতিও নির্ম্মম নিষ্ঠুর ব্যবহারেও কুণ্ঠিত হইবে না। চিত্তের এই প্রকার পরিণতির নামই ত **গুরুতর পাপ।**

হিংসাকে পাপ মনে করিয়া অনেকে মাংস আহার করেন না, কিন্তু পক্ষী আদির ডিম্ব ভক্ষণ করেন। তাঁহারা বলেন ডিম্ব ভক্ষণে হিংসা করা হয় না, কারণ ডিম্বাবস্থায় সুখদুঃখ বোধাদি এবং তাদৃশ স্বজীবনরক্ষার চেষ্টা প্রভৃতি দেখা যায় না। সুতরাং উহাতে প্রাণীপীড়নরূপ হিংসা নাই। তাঁহাদিগের এই একদেশদর্শিতা শাস্ত্রানুমোদিত নহে, কারণ তাঁহারা যদি সন্তানশোকাতুরা ডিম্বজননীদিগের অন্তরের ব্যাথার প্রতি দৃষ্টি প্রসারণ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিবেন যে জননীর স্নেহক্রোড় হইতে বলে ছলে সন্তানকে অপহরণ করায় সন্তানজননীর প্রতি কি জাতীয় হিংসা করা হয়। সেই হিংসা পাপ কি না তাহাতে তাঁহাদিগের হৃদয়ই সাক্ষী।

যে আচরণে নিরীহ প্রাণীর মর্ম্মন্তুদ বেদনার সৃষ্টি করে এবং যাহা

সাধারণ জনের অহিত করে এবং যাহা সজ্জনের হৃদয়ে ব্যথা প্রদান করে তাহাই পাপ। সুতরাং নাস্তি হিংসাসমং পাপম্। অহিংসাকে পরমধর্ম্ম বলিবার তাৎপর্য্য এই যে নিরবচ্ছিন্ন অহিংসা ধর্ম্মটি সার্ব্বভৌম মহাব্রত নাম ধারণ করে। দান ব্রত সত্য দয়া প্রভৃতি সকল ধর্ম্মভূমিকে পরম উজ্জ্বল করে বলিয়াই ইহা সার্ব্বভৌম এবং কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণাদি যাবতীয় ব্রতের মধ্যে এই অহিংসাটি মহাব্রত।

অপরকে দুঃখ দিলে সেই দুঃখ ভবিষ্যতে নিজেকে ভোগ করিতে হয়—"ভূঙ্‌ক্তে জনো যৎ পরদুঃখদস্তৎ।" আমরা অপরকে যে পীড়া প্রদান করি তাহা আমাদের ভাবী পীড়ার বীজ হইয়া থাকে। অহিংসা ব্রত উদ্‌যাপন করিলে ভাবী পীড়ার বীজ সৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ অহিংস ব্যক্তির হিংসা কেহই করে না, তাঁহাকে জীবজগৎ পীড়া প্রদান করে না। এমন কি তাঁহার নিকটে প্রাণিগণ স্বভাববৈরিতা পর্য্যন্ত ত্যাগ করে। অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে চিত্তভূমিতে দৃঢ়তা ধৈর্য্য প্রভৃতির সঙ্গে কোমলতার এমন অপূর্ব্ব সমাবেশ হয় যাহাতে শ্রীভগবৎসেবা স্বীয় অপরূপ উজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রকট করিয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বিস্তার করিতে পারে।

"হিংসাবিধিবিবেকশ্চ"

হিংসাবিধিঃ

পরম স্নেহাস্পদ—

শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন চন্দ্র পুরকায়স্থ, বি এ, বি টি,

য়্যাসিষ্ট্যান্ট্ হেড্ মাষ্টার, করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

মদীয় **শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে** অর্পিত **কুসুমাঞ্জলির** এই **নির্ম্মাল্য** আমার স্নেহাশিস্ রূপে আপনাকে প্রদান করিলাম। ইহা আপনার হৃদয়কে সুবাসিত করুক।

শ্রীভাগবতস্বামী।

অনেকে ক্বচিৎ ক্বচিৎ শাস্ত্রে সকাম যজ্ঞাদি বৈদিক ও কালিকাদি পৌরাণিক অর্চ্চনাদিতে পশুপক্ষিনিধনের ব্যবস্থা আছে দেখিয়া মনে করেন **হিংসায়** পাপ হয় না। বস্তুতঃ তাদৃশ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য তাহা নহে। **"মা হিংস্যেৎ সর্ব্বভূতানি"** এই বেদ বাক্যই হিংসায় অনর্থ ই উৎপন্ন হয় ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তথাপি শাস্ত্রে স্থলবিশেষে যে হিংসার বিধি দেখা যায় তাহার তাৎপর্য্য **"হিংসা অবশ্য কর্ত্তব্য" ইহা নহে।** ঐ বিধি অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নহে। কেবলমাত্র অত্যধিক রজস্তমোগুণসম্পন্ন যথেচ্ছস্বভাব উগ্রপ্রকৃতিক মাংসাদিপ্রিয় মনুষ্যদিগকে ক্রমশঃ ব্রতাচরণ, আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে যম নিয়মাদি, বিধিহিংসা ভিন্ন অন্য হিংসা নিবৃত্তি এবং দেবার্চ্চনাদি দ্বারা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন পূর্ব্বক **নিবৃত্তি মার্গে** উন্নীত করিবার জন্যই অভ্যনুজ্ঞা **পরিসংখ্যা বিধি** বলা হইয়াছে, **অপূর্ব্ব বিধি** নহে। অপূর্ব্ব বিধি অবশ্য কর্ত্তব্য রূপেই গৃহীত হয়। পরিসংখ্যা বিধির অবশ্যকর্ত্তব্যতা নাই।

মীমাংসা দর্শনাদিতে মোটামুটিভাবে প্রথমতঃ বিধিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে ; যথা 'অপূর্ব্ব বিধি', 'নিয়ম বিধি', 'পরিসংখ্যা বিধি'। এখানে পরিসংখ্যা বিধি বলিতে ইহাই বুঝা যায়—যেমন "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ" এই একটি বিধি আছে, অর্থাৎ শল্য শশক গোধা প্রভৃতি পঞ্চনখ বিশিষ্ট পাঁচ প্রকার পশুর মাংস ভক্ষণ করিবে, এই যে পাঁচ প্রকার পশুর মাংস ভক্ষণে বিধি ইহা "অবশ্য কর্ত্তব্য" বিধি নহে। তাৎপর্য্য এই যে যে সকল ব্যক্তি মাংস ভক্ষণে অনুরক্ত, তাহারা সর্ব্বপ্রকার পঞ্চনখের মাংস ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়। যাহারা স্বতঃ মাংসভক্ষণে প্রবৃত্ত তাহাদের প্রতি "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ" এইরূপ বিধি দেওয়ার কোনও প্রয়োজন থাকে না ; এই প্রকার বিধি বৃথা, কেননা তাহারা স্বতঃই অনুরাগবশতঃ মাংস খাইবে, ইহাতে আর বিধির অপেক্ষা কি ? যদি অনুরাগ-বশতঃ মাংসভক্ষণে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে বানরাদি পঞ্চনখ পশু ভক্ষণে গুরুতর অনিষ্ট হইবে বলিয়াই এই প্রকার বিধি হইয়াছে—"পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ", অভিপ্রায় এই যে শশক শল্যকী প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখ ভিন্ন অন্য পঞ্চনখ ভক্ষণ করিবে না। পরিসংখ্যা বিধি স্থলে বিধেয় পঞ্চ পঞ্চনখ ভক্ষণের সঙ্গে সম্বন্ধ না হইয়া ইতর নিবৃত্তি অর্থের সঙ্গেই সম্বন্ধ হইয়া থাকে।

আরও দেখুন, যজ্ঞাদি বৈদিক কার্য্যে ও কালিকাদ্যর্চ্চন পৌরাণিক তান্ত্রিক কার্য্যে যে হিংসা হয় তাহার ফল অনর্থ অবশ্যই আছে, অর্থাৎ তাদৃশ বৈধ হিংসা জনিত **পাপ** অবশ্যই হইবে। যদি তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত না করা হয় তাহা হইলে যজ্ঞের ফল স্বর্গাদি সুখভোগ কালেও ঐ পাপের ফল উদয় হইবে, ইহা সাংখ্য পাতঞ্জল দর্শনের দৃঢ় মত। "স্বল্পঃ সঙ্করঃ সপরিহারঃ সপ্রত্যবমর্শঃ" এই পঞ্চশিখাচার্য্যসূত্রের বিচারে দেখা যায়, যজ্ঞাদ্যনুকূল পশুহিংসা জনিত কিঞ্চিৎ মাত্র পাপের সহিত ঐ যজ্ঞ সঙ্কর হয় ; "সপরিহারঃ"—প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা সেই পাপের পরিহার হয় ; "সপ্রত্যবমর্শঃ"—যদি প্রমাদাদিবশতঃ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপের পরিহার না হয়, তাহা হইলে যাগকর্ম্মের বিপাকে অর্থাৎ ফলকালে ঐ হিংসা জনিত পাপও বিপাক অর্থাৎ দুঃখ ফল জন্মায়। তথাপি সুখসমুদ্র স্বর্গাদি ভোগকালে ঐ অল্পমাত্র দুঃখবহ্নিকণিকা কিঞ্চিৎ দুঃখ প্রদান করিলেও সহজেই সহ্য করা যায় বলিয়া যজ্ঞজনিত পুণ্যরাশির অপকর্ষ করিতে পারে না। এই সকল সিদ্ধান্ত পাতঞ্জল দর্শনে ব্যাসভাষ্য ও তাহার টীকাকারগণ এবং

সাংখ্যদর্শনে বাচস্পতি প্রভৃতি টীকাকারগণ বিশেষভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। প্রবাদ আছে সুরথ মহারাজকে লক্ষবলিদানের পর পরলোকে ভগবতীপ্রসন্নতা লাভ করিয়াও লক্ষ শস্ত্রাঘাত পাইতে হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতেও প্রাচীনবর্হি রাজার প্রতি দেবর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন, "ভো ভোঃ প্রজাপতে রাজন্ পশূন্ পশ্য ত্বয়াধ্বরে। সংজ্ঞপিতান্ জীবসঙ্ঘান্ নির্ঘৃণেন সহস্রশঃ॥ এতে ত্বাং সংপ্রতীক্ষ্যন্তে স্মরন্তো বৈশসং তব। সম্পরেতময়ঃকুটৈ শ্ছিন্দন্ত্যুত্থিতমন্যবঃ॥" অর্থাৎ হে রাজন্, হে প্রজাপতে, তুমি যজ্ঞস্থলে নিষ্ঠুর হইয়া সহস্র সহস্র যে সকল পশুকে নিধন করিয়াছ তাহাদিগকে ঐ দেখ, ইহারা তোমার কৃত পীড়াকে স্মরণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধভাবে তোমার মরণ কালকে অপেক্ষা করিতেছে, ইহারা লৌহময় শৃঙ্গের দ্বারা তোমাকে ছেদন করিবে। সুতরাং **যজ্ঞাদি স্থলে বৈধ হিংসাতেও কিঞ্চিৎ পাপ হয়।** (১)

এই হিংসা প্রথমতঃ তিন ভাগে বিভক্ত, 'কৃত' 'কারিত' এবং 'অনুমোদিত'। স্বহস্তে প্রাণিঘাতন কৃত হিংসা, অপরকে আদেশ দিয়া হিংসা করান কারিত হিংসা, আর অপরের হিংসাকার্য্যের অনুমোদন অর্থাৎ তাহাকে ভাল বলা অনুমোদিত হিংসা। এই ত্রিবিধ হিংসা আবার লোভ ক্রোধ মোহ বশতঃ ত্রিবিধ হয়, যেমন চর্ম্ম মাংস দন্তাদি পাইবার লোভে প্রাণী বধ করা, অপর কেহ নিজের অনিষ্ট করিয়াছে বলিয়া ক্রোধপূর্ব্বক তাহার জীবন নাশ করা, আর মোহবশতঃ যজ্ঞাদিতে পশুবধ করিলে পুণ্য হইবে মনে করিয়া পশু আদি বধ করা। এই লোভ ক্রোধ মোহ বশতঃ হিংসা আবার ত্রিবিধ, 'মৃদু', 'মধ্য', 'অধিমাত্র'। ইহা আবার ত্রিবিধ—মৃদু মৃদু, মৃদুমধ্য, তীব্র মৃদু ; সেই প্রকার মৃদুমধ্য, মধ্যমধ্য, তীব্রমধ্য ; পুনশ্চ সেই প্রকার মৃদুতীব্র, মধ্যতীব্র,

---

(১) বিষমমতি ন´যত্র নৃণাং ত্বমহমিতি মম তবেতি চ যদন্যত্র।
বিষমধিয়ারচিতো যঃ স হ্যবিশুদ্ধঃ ক্ষয়িষ্ণুরধর্ম্মবহুলঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত, ৬।১৬ ৪১।
শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা :—অনবদ্যতামেবাহ,—বিষমমতি যত্র যস্মিন্ ভাগবতে ধর্ম্মে নাস্তি যদন্যত্র যথান্যস্মিন্ কাম্যধর্ম্মে। ননু সোঽপি বেদোক্তত্বাদনবদ্য এব তত্রাহ। বিষমধিয়া শত্রুমারণাদিকামনয়া রচিতো বিহিতো যঃ স হ্যবিশুদ্ধঃ রাগদ্বেষাদিমত্ত্বাৎ। ক্ষয়িষ্ণুশ্চ নশ্বরফলত্বাৎ, অধর্ম্মবহুলশ্চ হিংসাদিবাহুল্যাৎ। তদুক্তং শবরস্বামিভিঃ,—উভয়মিহ চোদনায়াং লক্ষ্যতেঽর্থোঽনর্থশ্চেত্যাদি।

অধিমাত্রতীব্র। এই প্রকারে **হিংসার ভেদ** একাশীতি প্রকার হইয়া শেষে **অসংখ্য** প্রকার হয়। হিংসার এই ভেদ নিরূপণ ব্যাসভাষ্যে করা হইয়াছে।

হিংসক ব্যক্তি প্রথমতঃ নানাপ্রকার চেষ্টার দ্বারা বলপূর্ব্বক বধ্য পশুপক্ষী আদির বীর্য্য নাশ করে। তারপর শস্ত্রাদি নিপাতন করিয়া দুঃখ প্রদান করে, তদনন্তর তাহার জীবন বিনাশ করে। হিংসক ব্যক্তি প্রথমতঃ প্রাণীর বীর্য্য নাশ করে বলিয়া যে পাপ হয় তাহার ফলে ঐ হিংসকের চেতন অচেতন উভয় প্রকার ভোগের উপকরণও হীনবীর্য্য হয়। বধ্য প্রাণীকে শস্ত্রাদি দ্বারা পীড়া প্রদান করে বলিয়া নরক তির্য্যক্ প্রেতাদি যোনিতে দেহ লাভ করিয়া নানা প্রকার তীব্র যাতনা ভোগ করে। বধ্য পশুপক্ষী প্রভৃতির জীবন নাশ করে বলিয়া জীবিত থাকিয়াও মৃতবৎ হইয়া পুনঃ পুনঃ মরণ ইচ্ছা করে এবং মরণতুল্য দুঃখভোগ সহকারে অতি কষ্টে জীবন ধারণ করে। তাই **নাস্তি হিংসাসমং পাপম্।**

এই প্রকার আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রে যে স্থলে বিশেষ বিশেষ রোগ চিকিৎসার নিমিত্ত পশুপক্ষীর মাংসাদির ব্যবস্থা আছে তাহা গুরুতর জীবন রক্ষার নিমিত্তই লঘুতর প্রাণীর প্রাণনাশে স্বল্প পাপ স্বীকার পূর্ব্বকই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে; তাৎপর্য্য এই—একটি ক্ষুদ্র প্রাণীর শরীর অপেক্ষা জগতের মহা হিতকর শরীরের মূল্য অধিক, সুতরাং জগতের হিতকর মনুষ্য শরীর রক্ষার নিমিত্ত তদপেক্ষা স্বল্প হিতকর ক্ষুদ্র প্রাণীর শরীর নাশে হিংসা পাপ হইলেও লঘুগুরুভেদে তাহা শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ একটি ব্যাঘ্রকে নিধন করিলে হিংসাজনিত পাপ নিশ্চয়ই হইবে; তথাপি তদপেক্ষা জগতের হিতকর উৎকৃষ্ট বহু প্রাণীর জীবন রক্ষার নিমিত্ত বহু পুণ্য লাভ হয় বলিয়াই অধিকারী ভেদে তাদৃশ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র প্রাণীর বধবিধান শাস্ত্রে অনুমোদিত আছে। কিন্তু শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বা দেহরক্ষার নাম করিয়া যথেচ্ছ ইন্দ্রিয়বিলাসলালসায় যাঁহারা নিরীহ পশু পক্ষী নিধন করেন তাঁহাদের অতিশয় **গুরুতর পাপই** হয়। মনে করা উচিত—নিরীহ হরিণশিশু আর শশককুলের বিনাশেই **ক্ষাত্র বীরত্বের পর্য্যবসান নহে।**

মনুষ্যের শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট স্বতঃসিদ্ধ জীবনধারণের উপায় ধান্যমুদ্গাদি শরীর নাশেও স্বল্প পাপ হয়, ইহাকে মৃদুমৃদু হিংসা বলে। এই মৃদুমৃদু হিংসা জনিত পাপ নিত্য

দেবাদির অর্চ্চন, অতিথিসেবন ও পরোপকারাদি দ্বারাই ক্ষয় হয়, ইহা ত্রিকালদর্শী ঋষিদিগের ব্যবস্থা। আমাদের তুল্য স্থূলবুদ্ধি জনের ঋষিবাক্যের অনুগত থাকিয়া জীবনোন্নতির পথে অগ্রসর হওয়াই সমীচীন।

শমদম তিতিক্ষাদিতপস্যাসম্পন্ন পরার্থপ্রাণ ঋষিদিগের ভূয়োদর্শন বহুমনন নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা পরিশোধিত আর্য্যবিজ্ঞানের সঙ্গে কামলোভাদ্যুপহত চঞ্চলেন্দ্রিয় ক্ষুদ্র স্বার্থপর মতলবানুযায়ী সুবিধাবাদী আমাদের পদে পদে ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা ইন্দ্রিয়াপটুতা প্রভৃতি দোষগ্রস্ত জ্ঞানের যুদ্ধ ঘোষণা করিতে অগ্রসর হওয়া কতদূর সঙ্গত ইহা একটু ভাবা উচিত।

এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্যের রহস্য অতিদুর্গম, মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধি জনের পক্ষে ইহার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার করা সম্ভবপর নহে। **অধিকার** ভেদে **উদ্দেশ্য** ভেদে ধর্ম্মাধর্ম্ম বা পাপপুণ্যের নির্দ্দেশও শাস্ত্রযুক্তিতে দেখা যায়। মনে করুন কোন ব্যক্তির অঙ্গে পক্ক ব্রণের অস্ত্রোপচার কালে তাহাকে শারীরিক পীড়া নিশ্চয়ই দিতে হইবে। তাহার কাতর চিৎকার, আর্ত্তনাদাদি শ্রবণে যদি অস্ত্রোপচারাদি হইতে বিরত হওয়া যায় তাহা হইলে তাহার জীবননাশ হইবার সম্ভাবনা। বস্তুতঃ আপাততঃ অস্ত্রোপচারাদি দ্বারা তাহার তাৎকালিক পীড়াদান হইলেও উহা পরিণামে তাহার জীবনদানরূপ মহোপকারে পর্য্যবসিত হইয়া **পরম পুণ্যই হইবে।**

"পুণ্যং পরোপকারেণ পাপঞ্চ পরপীড়নে।"

“পাপপুণ্যনিরূপণম্”

পাপপুণ্যম্

পরম স্নেহাস্পদ—

শ্রীযুক্ত খেলেন্দ্রনাথ জোয়ারদার, বি এস্‌সি, বি টি,

তেরাইল, নদীয়া।

মদীয় **শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে** অর্পিত **কুসুমাঞ্জলির** এই **নির্ম্মাল্য** আমার স্নেহাশিস্ রূপে আপনাকে প্রদান করিলাম। ইহা আপনার সাধনপথের সহায় হউক।

শ্রীভাগবতস্বামী।

ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে **আর্ষবিজ্ঞানের** অনুগত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সাধুসঙ্গ শাস্ত্রানুশীলন চাই। দেখুন—মানুষের কায়িক বাচিক মানসিক এই ত্রিবিধ কর্ম্ম হইতে **ধর্ম্ম** এবং **অধর্ম্ম** নামক **অদৃষ্টের** সৃষ্টি হয়। সদসৎ উভয় কর্ম্ম হইতে উভয়বিধ অদৃষ্টের জন্ম হয়। সৎকর্ম্মের ফল সুখ, অসৎকর্ম্মের ফল দুঃখ। মনুষ্যদেহে যে সকল সদসৎ কর্ম্ম করা যায় সেই সেই কর্ম্মের অব্যবহিত পরক্ষণেই কর্ম্মটি থাকে না, সুতরাং কর্ম্মের ফল সুখ বা দুঃখ, স্বর্গ বা নরক ইত্যাদি যাহা কর্ম্মের বহু পরে ভোগ হয় তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? কেননা কর্ম্মটি কারণ স্থানীয়, সুখদুঃখভোগ কার্য্য স্থানীয়, কার্য্য সুখদুঃখভোগের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কারণ কর্ম্ম থাকা চাই। কিন্তু আমরা এই জন্মে এতদ্দেহে যে কর্ম্ম করিলাম তাহার ফল পরজন্মে ভিন্নদেহে পাইলাম, ইহা কি প্রকারে সম্ভবে? এবং এই জন্মে এই দেহে যে কর্ম্ম করিলাম “আমি অমুক” কর্ত্তা, আর পরজন্মে ভিন্নদেহে কর্ম্মফল ভোগ করিলাম পৃথক্ আর একজন “আমি

অমুক", ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? কেননা কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব একাধিকরণেই থাকে অর্থাৎ যে করে সেই ভোগ করে ইহাই নিয়ম, কিন্তু পরজন্মে ভিন্নদেহে ভোগ স্বীকার করিলে সে নিয়ম ভঙ্গ হইয়া যায়। ইত্যাদি সন্দেহ নিরসন করিতে হইলে সৎসঙ্গে সদুপদেশে সৎশাস্ত্রানুশীলন করিতে হয়।

এখন দেখুন—কায়িক বাচিক মানসিক যে সকল সৎ বা অসৎ কর্ম্ম করা যায় তাহা তৎপরক্ষণে নাশ পাইলেও সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই কর্ম্মের ব্যাপার স্বরূপে কর্ম্মেরই **সূক্ষ্মরূপ সূক্ষ্মশক্তি** উৎপন্ন হয়। কোন কর্ম্ম করিলে তাহা ঐ প্রকারে সূক্ষ্ম সংস্কার রূপে চিত্তে আহিত হইয়া চিত্তে কর্ম্মের ফলজনক শক্তিরূপে অবস্থান করে, ইহাই **অদৃষ্ট**। যথাকালে এই অদৃষ্ট হইতেই সুখদুঃখ ফল লাভ হয়। উক্ত ত্রিবিধ কর্ম্ম আবার কৃষ্ণ, শুক্ল, কৃষ্ণশুক্ল এবং অকৃষ্ণাশুক্ল ভেদে চতুর্ব্বিধ। কৃষ্ণ বলিতে শুদ্ধ পাপকর্ম্ম বুঝায়, যেমন দুরাত্মাদিগের অনুষ্ঠেয় শুদ্ধ হিংসাদি; শুক্ল বলিতে তপআদি নিরত সাধুব্যক্তিদিগের আচরিত শুদ্ধ দয়া সত্য জপ ধ্যানাদি শুদ্ধ পুণ্যকর্ম্ম বুঝায়; কৃষ্ণশুক্ল বলিতে যাহা অপরের পীড়নাদি পাপ এবং অপরের উপকারাদি পুণ্য মিশ্র কর্ম্ম তাহাই বুঝায়, যেমন যজ্ঞে পশুহিংসাদি; আর অকৃষ্ণাশুক্ল বলিতে বাসনারহিত যোগী ব্যক্তিদিগের প্রারব্ধ নিবন্ধন কর্ম্ম বুঝায়। এই চতুর্থ কর্ম্ম মনুষ্যের আর পুনর্জ্জন্মের কারণ হয় না। অন্য তিনটি কর্ম্মই সকাম, সুতরাং পুনর্জ্জন্মের কারণ।

এই প্রকার কর্ম্মের দ্বারা চিত্তের উপর আহিত সূক্ষ্ম সংস্কার রূপ ধর্ম্ম অর্থাৎ **শুভাদৃষ্টের** এবং অধর্ম্ম অর্থাৎ **অশুভাদৃষ্টের** ফল ত্রিবিধ—জাতি, আয়ুঃ এবং ভোগ। জাতি বলিতে মনুষ্যাদি জন্ম, আয়ুঃ বলিতে জীবন পরিমাণ কাল, ভোগ বলিতে সুখদুঃখ সাক্ষাৎকার, এই ত্রিবিধ কর্ম্মফল ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম হইতেই হয়। উত্তম মনুষ্যদেবাদি জাতি, দীর্ঘায়ুঃ এবং নানাবিধ সুখভোগাদি শুভকর্ম্মজনিত শুভাদৃষ্ট ধর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন হয়। আর অধম তির্য্যগাদি জন্ম, অল্পায়ুঃ ও নানাবিধ দুঃখভোগ অশুভাদৃষ্ট অধর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন হয়।

আবার মানুষের আচরিত কায়িক বাচিক মানসিক কর্ম্মের ফল দ্বিবিধভাবে ভোগ হয়—দৃষ্ট ফল, অদৃষ্ট ফল। যে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের ফল এই জন্মেই এই দেহে ভোগ হয় তাহা দৃষ্টফল কর্ম্ম। যাহার আচরণে এই জন্মে এই দেহে ফলভোগ হয় না, পরজন্মে ফলভোগ হয়, তাদৃশ কর্ম্মই অদৃষ্টফল। আবার

দৃষ্টাদৃষ্ট উভয়ফলজনক কর্ম্মও আছে। যেমন মনে করুন—"সাত্ত্ব্য পবিত্র আহার করিবে" ইহা শাস্ত্রের ব্যবস্থা। তাদৃশ আহারের ফলে সাত্ত্বিক মন, তদুচিত শরীর ইন্দ্রিয়াদি শুদ্ধ স্বচ্ছ প্রসন্ন ভাবে থাকিয়া দয়া ক্ষমা অহিংসাদি সদ্ধর্ম্মের আচরণে যোগ্যতা লাভই দৃষ্টফল, এবং পরম্পরাক্রমে সত্য দয়া ক্ষমাদি আচরণে পরজন্মে তদপেক্ষা উত্তম জন্ম উত্তম স্বভাব দীর্ঘায়ুঃ এবং সুখভোগাদি লাভের অদৃষ্ট লাভ হয়, ইহাই অদৃষ্টফল। এই প্রকার বিরুদ্ধ অমেধ্য আহার, যথেচ্ছ অসংযতবিহারাদির নিষেধ শাস্ত্রে দেখা যায়। তাদৃশ আহার বিহারাদির দ্বারা নানাপ্রকার শারীরিক রোগ, মানসিক বিক্ষেপ ও ইন্দ্রিয়ের চাপল্য জনিত নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করিতে হয়, ইহাই দৃষ্টফল; আবার তাদৃশ লোকশাস্ত্র-বিগর্হিত কার্য্যে ক্রমশঃ আসক্তি বৃদ্ধি পাইয়া এমন কতকগুলি কদর্য্য কর্ম্মবাসনা জন্মায় এবং কদর্য্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি আনয়ন করে যাহার ফলে পরলোকে বা দেহান্তরেও কর্ম্মের ফল নানাবিধ যন্ত্রণা উপভোগ করিতে হয়, ইহাই অদৃষ্টফল। একমাত্র আর্ষবিজ্ঞানের অনুমোদিত শাস্ত্রানুশীলনেই এই সমস্ত কর্ম্মরহস্য লাভ হয়।

এখন দেখুন—হিংসাদ্বেষ কামক্রোধাদি ভাবগুলি শরীর এবং মনের উপর একপ্রকার গুরুতর উগ্রতাব্যঞ্জক এবং বিক্ষেপকর অস্বাভাবিক উত্তেজনার সৃষ্টি করে। উক্ত উত্তেজনাকালে নানাভাবে শরীরের রক্তমাংসাদি পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া স্নায়ুমণ্ডলীতে একটা বিষম সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়, যাহার বাহ্যিক লক্ষণ শিরাস্ফীতি, মুখবিকৃতি, অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়চঞ্চলতা, আরক্তিম নয়ন প্রভৃতি প্রকাশ পায়। দৈনিক একবার বা ততোধিকবার এই ভাব সকল মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকিলে শরীরস্থ বায়ু অংশ, তেজ অংশ এবং শৈত্যাংশের কখনই সাম্য থাকিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে পরস্পর নানা-প্রকার বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়া শরীরে নানাবিধ রোগের সৃষ্টি হয়, যাহার পরিণাম শারীরিক মানসিক নানাবিধ দুঃখভোগ; **ইহাই ত পাপকর্ম্ম।** অথবা মনে করুন তাদৃশ উত্তেজনায় হৃদ্‌যন্ত্রাদির ক্রিয়ার বৈষম্যবশতঃ নিশ্বাস প্রশ্বাসের আয়ামের অস্বাভাবিকতা বা লঘুতা অর্থাৎ ঘনঘন নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা আয়ুর হ্রাস হওয়া, ইহা ত পাপকর্ম্ম। অথবা তমোরজোগুণবর্দ্ধক জড়তা নিদ্রা মোহাদি সম্পাদক এবং শরীরেন্দ্রিয়বিক্ষোভ অমেধ্য বস্তু সকলের যথেচ্ছ

আহার এবং তাদৃশ ব্যবহারাদি দ্বারা শরীরে গুরুতা অস্বচ্ছতা ক্লেদাদিপূর্ণতা এবং সঙ্গে সঙ্গে মনের চঞ্চলতা বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ অতিহীন প্রবৃত্তি সকলই হৃদয়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তাদৃশ হিংসাদিদ্বারা তাদৃশ কদর্য্য আহার-বিহারাদির সাফল্য সম্পাদনের জন্য কদর্য্য চেষ্টার দ্বারা অপরের সুখস্বাচ্ছন্দ্যাদির ব্যাঘাতকর কার্য্যে প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে! ফলে অন্যের প্রতি কুব্যবহারে চিত্ত অনুরক্ত হইয়া উঠে, ফলে লোকের অহিতকর কার্য্যে লিপ্ত হইয়া অধঃপাতের চরমসীমায় যাইতে হয় এবং বহু প্রাণীর অহিত আচরণের ফলে তাহাদের আক্রোশ অভিসম্পাত মস্তকে বহন করিয়া নিরন্তর দুঃখই উপভোগ করিতে হয়। আবার সঙ্গে সঙ্গে মনের উপর ঐ ভাবগুলির মুহুর্মুহু স্পন্দনে উহারা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম সংস্কার রূপে সঞ্চিত হইয়া **মরণকালে ভাবী দেহধারণের উপযোগী দেহারম্ভকরূপে দণ্ডায়মান হয়, যাহার ফলে পরজন্মেও দুঃখ পাইতে হয়।**

জন্ম এবং মরণের মধ্যবর্ত্তী কালে সদসৎ যে সকল নানাবিধ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহা চিত্তে দুই ভাবে অবস্থান করে, কতকগুলি প্রারব্ধ কর্ম্মের সহায় হইয়া **প্রধানরূপে,** আর কতকগুলি প্রারব্ধ কর্ম্মের দ্বারা অভিভূত হইয়া **অপ্রধানরূপে।**

যে কর্ম্মের ফল অবশ্য ভোগ করিবার জন্য এই মনুষ্য দেহ ধারণ করা তাহাকেই প্রারব্ধ কর্ম্ম বলে, বর্ত্তমান শরীর দ্বারা সেই প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় হইতেছে। তথাপি পূর্ব্ব পূর্ব্ব অসংখ্য জন্মকৃত হিংসা দ্বেষাদি ঘটিত অসংখ্য কর্ম্ম-সংস্কার অপ্রারব্ধরূপে চিত্তে আহিত আছে, আবার বর্ত্তমান শরীরেও হিংসা দ্বেষ কাম ক্রোধ লোভাদির ভাব প্রবল হইয়া তত্তৎ কর্ম্মের প্রতি বাসনা জন্মাইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান শরীরের প্রারব্ধ কর্ম্মের দ্বারা অভিভূত হইয়া ফলোন্মুখ হইতে না পারিয়া ঐ সব বাসনা চিত্তের উপর আহিত অবস্থায় আছে, প্রারব্ধ কর্ম্মশেষে মরণকালে চিত্তে পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মাশয়গুলি সমান সমান জাতির সহিত মিলিত হইয়া, অর্থাৎ পূর্ব্বসঞ্চিত বাসনার সহিত সমান জাতীয় এই বর্ত্তমান জন্মের বাসনাগুলি মিলিত হইয়া ফলোন্মুখ হইবার চেষ্টা করে। অর্থাৎ পূর্ব্বকৃত হিংসার সংস্কারের সহিত এই জন্মকৃত হিংসাবাসনা মিলিত হইয়া উক্ত হিংসাবাসনার সাফল্য যাহাতে হয় এমন দেহধারণের যোগ্যতা আনয়ন

করে। ইহাকেই **দেহারম্ভক প্রারব্ধ** বলে। এই প্রকার ক্রোধ দ্বেষ কাম লোভ প্রভৃতি পাপ কর্ম্ম এবং সত্য দয়া ক্ষমা অহিংসা প্রভৃতি পুণ্য কর্ম্ম সকলের সম্বন্ধেই এই নিয়ম। **মরণকালে** পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মাশয় সমূহের মধ্যে যাহারা অর্থাৎ যে জাতীয় কর্ম্মাশয়গুলি সর্ব্বাতিশয় বলবান্ হইয়া আছে তাহারই বর্ত্তমান মানুষশরীরের তজ্জাতীয় বাসনার সাহায্যে প্রবল উদ্বুদ্ধ হইয়া ফলজননে অভিমুখী হয় এবং তার ফলেই ভাবী পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া জীব তদুপযুক্ত প্রারব্ধ কর্ম্মফল সুখদুঃখাদি ভোগ করে, আবার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মের বাসনা বীজ সঞ্চয় করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ লাভ করিতে থাকে। **এই কর্ম্মই জন্ম মরণের কারণ, এই কর্ম্মই জগজ্জীবের বৈচিত্র্যের কারণ।**

রহস্য এই যে, ধর্ম্ম হইতে সুখ, অধর্ম্ম হইতে দুঃখ, সুখ হইতে রাগ (আসক্তি), দুঃখ হইতে দ্বেষ, আর এই রাগ দ্বেষ হইতে প্রযত্ন দ্বারা কায়িক বাচিক মানসিক পরিস্পন্দন অর্থাৎ ক্রিয়া হয়। এই প্রকারে ক্রিয়াবান্ মনুষ্য পরের প্রতি অনুগ্রহ বা নিগ্রহ করে, ফলে সেই অনুগ্রহ বা নিগ্রহ ক্রিয়া হইতে ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম, আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে সুখদুঃখ, সুখদুঃখ হইতে রাগদ্বেষ, রাগদ্বেষ হইতে প্রযত্ন, আর প্রযত্ন হইতে ক্রিয়া, এইরূপে **প্রবৃত্তমিদং ষড়রং সংসারচক্রম্;** অর্থাৎ ধর্ম্ম অধর্ম্ম সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষ এই ষট্‌শলাকাযুক্ত সংসারচক্র নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে। এই চক্রের পেষণে ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত যাবতীয় জীবনিচয় চূর্ণবিচূর্ণ হইতেছে। ইহার **নেত্রী অবিদ্যা**। জীবের এই অবিদ্যা অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্বের অজ্ঞান থাকিতে এ চক্রের নিবৃত্তি নাই। যদি জীব কোন সৌভাগ্যে **সু-দর্শন চক্রের সাক্ষাৎ পায়, তখন এই চক্রের নিবৃত্তি হইবে।** সু সুষ্ঠু দর্শনং জ্ঞানমিত্যর্থঃ। ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানই সংসার যাতনা নিবৃত্তির উপায়।

অহঙ্কারাসক্ত মনেই পাপপুণ্য আহিত হয়। পূর্ব্বদেহে অহঙ্কারাসক্ত মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অথবা তাদৃশ মনের চিন্তনাদি দ্বারা যে সকল সদসৎ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা সংস্কাররূপে মনেই সঞ্চিত হইয়া পরজন্মে কর্ম্মফল ভোগের উপযুক্ত মনুষ্য পশু পক্ষী আদি দেহে **ঐ অহঙ্কারাসক্ত মনের দ্বারাই** কর্ম্মের ফল সুখদুঃখ ভোগ হয়। বর্ত্তমান স্থূল দেহের নাশ

হইলে **মনঃপ্রধান সূক্ষ্মদেহের** নাশ হয় না, বদ্ধজীবমাত্রেই এই সূক্ষ্মদেহ-বিশিষ্ট। স্থূল দেহে যাহা আচরিত হয় **সূক্ষ্মদেহের সঙ্গে** তাহা **লিপ্ত** থাকে; মনুষ্য এই বর্ত্তমান শরীর ত্যাগ করিয়া এই সূক্ষ্ম দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে, পরে কর্ম্মানুযায়ী দেহ লাভ করিয়া ভোগ করে। "পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়-সমন্বিতং। অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্॥" এই সপ্তদশ অবয়ব-বিশিষ্ট সূক্ষ্মদেহই জীবের কর্ম্মফল ভোগের সাধন। সুতরাং এক স্থূলদেহে কর্ম্ম করিয়া অন্য স্থূলদেহে তাহার ফলভোগ হইলেও ভোগসাধনের মুখ্যদেহ সূক্ষ্মশরীরের ভেদ নাই, জীবের অহঙ্কারাসক্ত মনেরও ভেদ নাই, জীবচৈতন্যেরও ভেদ নাই। একই জীব তাহার সূক্ষ্মশরীর বিশিষ্ট হইয়া একই অহঙ্কারাসক্ত মনে একই **"আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা"** ইত্যাদি অভিমানে অধ্যস্ত হইয়া নানাপ্রকার স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া কর্ম্মের ফল সুখদুঃখ ভোগ করে। সুতরাং যে কর্ম্ম করে সেই ফল ভোগ করে, অন্যে করে না।

সৎসঙ্গে ঋষিদিগের শাস্ত্র অনুশীলন করিলে **পুনর্জন্ম** বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। দেখুন—আমরা যখন নিদ্রিত থাকি তখন আমাদের এই স্থূলদেহ অসাড় অবস্থায় পড়িয়া থাকে, কিন্তু স্বপ্নে রাজ্যলাভ, রাজ্যনাশ, অঙ্গনা-লিঙ্গনাদি জনিত সুখ দুঃখ ভোগ ঐ সূক্ষ্মদেহেই সম্পন্ন হয়। ঐ স্বপ্নাবস্থাতে "আমিত্ব" যেমন থাকে, মরণান্তে স্থূলদেহ ত্যাগের পরেও জীবাত্মার সূক্ষ্মদেহেও 'আমিত্বটি" তেমনই সমান ভাবে থাকে। এই "আমিত্বই" বন্ধের কারণ, 'আমিত্বকে" প্রকৃতির কবল হইতে মুক্ত করিতে পারিলেই জীবের **মোক্ষসুখ** উপভোগ হয়।

অনেকে মনে করেন মানুষ মরণের পর আর পুনর্জন্ম লাভ করে না, কারণ মানুষজন্মই চরম জন্ম। বস্তুতঃ আর্যবিজ্ঞানে তাহা বলে না; যাবৎ-কাল জীবের বাসনাবীজ নাশ না পায় তাবৎ জীবমাত্রই জন্ম হইতে জন্মান্তর লাভ করিবেই করিবে; মানুষই হউক বা পশুপক্ষী আদি হউক অথবা দেব যক্ষাদি হউক, বাসনাবিশিষ্ট জীবের মুক্তি হয় না। কেহ কেহ বলেন মানুষের মরণের পর ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধ লোকে তাঁহাদের আত্মা থাকেন, ইহারা মুক্তাত্মা, এই মুক্তাত্মাদিগের মধ্যে কর্ম্মানুসারে উন্নত অবনত স্তর আছে, তাহার মধ্যে যাঁহারা খুব উন্নতাত্মা তাঁহারা জগতের হিতার্থে দেহ পরিগ্রহ করিয়া কখন

কখন ভাগ্যবান্ লোকের গোচরীভূত হয়েন। সামান্যভাবে ইঁহাদিগকে প্রেতাত্মা বলা যায়। ইঁহাদের আর এই স্থূল জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া দেহধারণ হয় না। বস্তুতঃ এই মতও কোন আর্যবিজ্ঞানের অন্তর্গত নহে। শাস্ত্রে "মুক্তাত্মা" বলিতে যাঁহারা বাসনারহিত হইয়া ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানে মুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকেই বুঝায়। অন্য কোনও আত্মাকে মুক্তাত্মা বলা যায় না, প্রেতাত্মা মাত্রই মুক্ত ইহা অত্যন্ত ভ্রমসঙ্কুল মত। মানুষদেহ পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিলেই যদি আর ফিরিয়া জন্ম গ্রহণ করিতে না হয় তাহা হইলে যে সমস্ত তীব্র তীব্র বাসনা বীজ লইয়া মানুষ জীবন ত্যাগ করিয়াছে তন্নিমিত্ত উৎকট উৎকট ভোগের উপযুক্ত দেহ পাইবে কোথায়? যদি বলা যায় যে সেই পরলোকেই তাদৃশ বাসনা ভোগোচিত দেহ লাভ করিয়া সুখ দুঃখের ভোগাধিকারী হয়, তাহা হইলে সেই সেই পরলোকগত প্রেতাত্মাদিগের যে নূতন বাসনা উদয় হইবে তাহার ফল ভোগ করিবার জন্য অবশ্য দেহান্তর স্বীকার করিতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন মানুষদেহত্যাগে পুনর্জন্ম হইলে মানুষই হয়, অর্থাৎ মানুষ মরিয়া মানুষই হয়, অন্য কিছু হয় না। ইহাও আর্যশাস্ত্রানুমোদিত নহে। মানুষের বর্ত্তমান কর্ম্মবাসনা সমূহ এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনাবীজ উভয়ে মিলিত হইয়া যাহাদের ফলোন্মুখ ভাব প্রবল হইয়া উঠিবে, মানুষ দেহত্যাগের পর পুনরায় তদুপযুক্ত ফলভোগের যোগ্য দেহ লাভ করিবে। দেবভাবাপন্নহৃদয় মানুষের প্রবল সাত্ত্বিক ধর্ম্ম প্রতিপালন দ্বারা যে সকল সদ্বাসনা হয় তাহার উচ্চফলভোগ মনুষ্য শরীরে সম্ভবে না, তাদৃশ দেবোচিত সুদীর্ঘকাল সুখভোগের উপযুক্ত উপাদান মনুষ্য শরীরে নাই। আবার অতি নিকৃষ্ট পশু-উচিত কাম-ক্রোধ-হিংসাদির উৎকট বাসনাগ্রস্ত ব্যক্তির তাদৃশ পশু-উচিত চেষ্টার সাফল্য মনুষ্য শরীরে হইতে পারে না, তত্তৎ কর্ম্মের ফলভোগ তদুপযুক্ত পশুশরীরেই হইবে।

জন্মমরণ কেবল কর্ম্মনিবন্ধনই। অহো, একটি গোবৎস ভূমিষ্ঠ হইয়াই দুগ্ধপানে প্রবৃত্ত হয়। কে তাহাকে উক্ত কৌশল শিখাইল? বানরশিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষশাখা অবলম্বন করে, কে তাহাকে শিক্ষা দিল? পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বশতঃই তাহাদের এই প্রবৃত্তি সম্ভব হয়। ইহাকে **জীবনযোনি প্রযত্ন**

বলা যায়। ইহাকে অকস্মাৎ স্বভাব বলা যায় না ; যাহা স্বভাব তাহা নিত্য ; অগ্নির উত্তাপ স্বাভাবিক, উহা নিত্য, কখনও হয়, কখনও হয় না, এইরূপ হইতে পারে না। জাত মাত্র বালকের স্তন্যপান প্রবৃত্তি যদি স্বাভাবিক হইত তাহা হইলে নিত্য হইত, কখনও হয় কখনও হয় না, এই প্রকার হইতে পারিত না। প্রাণী মাত্রেই মরণের ভয় করে, এই ভয় প্রাণীকে কে শিখাইল, মরণের ভয়ে কম্পিত হয় কেন ? এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর লাভ করিতে হইলে আর্যশাস্ত্রের আলোচনা কর্ত্তব্য। তাহাতে জানা যায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অনুভবজনিত সংস্কার হইতেই স্মৃতি, সেই স্মৃতির ফলে তাদৃশ প্রবৃত্তি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে তাদৃশ গো-মনুষ্যাদি দেহে স্তন্যপানাদির উপযোগিতা জানা আছে ; সেই জানাটাই আজ ঐ জীবের তাদৃশ গবাদি জন্মেও জীবনধারণের উপযোগী যে স্তন্যপান তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম হইতেই মরণদুঃখের জ্ঞান আছে, তাই মরণ নাম শুনিলেও ভয়ে কম্পিত হইতে থাকে। এই সকলই পূর্ব্বজন্মের প্রমাণ।

এই মনুষ্য শরীরে অতি উৎকট লোভমূলক হিংসাবাসনা ক্রমশঃ যখন এতাদৃশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে যাহাতে লোভের দ্বারা ধৈর্য্যহারা হইয়া পশুবৎ হিংসা আচরিত হয় এবং ক্রমশঃ মাংসাদি ভক্ষণে লোভ বর্দ্ধিত হইয়া যখন চিত্তবৃত্তি লোভহিংসায় তন্ময় হইয়া উঠে, তখন তাদৃশ লোভহিংসার পূর্ণ সার্থকতা এই মনুষ্যদেহে সম্পন্ন হয় না, সঙ্গে সঙ্গে লোভপ্রাবল্যেও লোভের পূর্ণাহুতি না হওয়ায় চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। এই প্রকার চিত্তে উৎকট লোভ হিংসার সংস্কার লইয়া যাহারা দেহত্যাগ করে, দেহত্যাগকালে তাহাদের পূর্ব্বসঞ্চিত লোভ হিংসা তাহার সহিত মিলিত হইয়া উৎকট লোভ হিংসার সার্থকতা সম্পাদক ব্যাঘ্র কুক্কুর শৃগালাদি হিংস্র মাংসাশী পশুদেহের আরম্ভক প্রারব্ধ হয়। তাহার ফলে অতৃপ্ত মাংসপ্রিয়তা স্বভাব, পূর্ণভাবে মাংসাদি ভক্ষণের উপযুক্ত নখদন্তাদি ধারণ এবং মনুষ্যোচিত রন্ধনাদির অভাবেও সহজে জঠরাগ্নির সাহায্যে জীর্ণ হওয়া প্রভৃতি সুযোগ যাহাতে আছে এমন উৎকট লোভহিংসা সম্পাদক ব্যাঘ্র কুক্কুর শৃগালাদি জন্মই গ্রহণ করিতে হয়। এই প্রকার দেশ-কালপাত্রাদি বিবেচনা রহিত অতি উৎকট কামচেষ্টাপ্রবণ, নিরন্তর কামোপভোগ-লালসা দ্বারা কদর্য্য ব্যবহারে রত যে সকল মনুষ্য তাহাদেরও ঐরূপভাবে অতি হীন কামসার্থকতা সম্পাদক ছাগাদি পশুজন্ম হয়। এইরূপ কর্ম্মবৈচিত্র্যে জীবের

নানা দেহ ধারণ হয়। আবার যাঁহারা সৎকর্ম্মদ্বারা নিয়মিত যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করিতে করিতে ক্রমশঃ সাত্ত্বিকভাবের দিকে অগ্রসর হন এবং সত্য দয়া ক্ষমা অহিংসা পরোপকারাদি দ্বারা শরীর ইন্দ্রিয় মনকে উন্নত রাখিতে চেষ্টা পান, তাঁহারা তাদৃশ সংস্কারে সংস্কৃত চিত্ত লইয়া ক্রমশঃ উত্তরোত্তর উত্তম দেহ দেবাদিপদ লাভ করেন। **আর যাঁহারা সাধু মহাপুরুষের কৃপার ফলে সৎশাস্ত্রানুগত সাধনপর হয়েন এবং সত্য দয়াদি সদ্ধর্ম্ম সমূহ শ্রীভগবৎপরিতোষণের জন্য আচরণ করিয়া শ্রীভগবৎপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন তাঁহারা এই কর্ম্মগ্রন্থি ছিন্ন করিয়া মোক্ষসুখের ভাগী হয়েন।**

"কলুষঘ্নমমাৎসর্য্যম্"

অমাৎসর্য্যম্

পরম স্নেহাস্পদ—

শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস ভট্টাচার্য্য, তালুকদার, মার্চ্চেন্ট, ব্যাঙ্কার,
ভাইস্ চেয়ারম্যান্, আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি, ত্রিপুরা রাজ্য।

মদীয় **শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে** অর্পিত **কুসুমাঞ্জলির** এই **নির্ম্মাল্য** আমার স্নেহাশিস্ রূপে আপনাকে প্রদান করিলাম। ইহা আপনার জীবনোন্নতির পথে শুভ সম্পাদন করুক।

শ্রীভাগবতস্বামী।

পরোৎকর্ষাসহনং মাৎসর্য্যম্। মানুষকে পশুতে পরিণত করিতে হৃদয়ের এমন কদর্য্য বৃত্তি আর কিছুই নাই। এই মাৎসর্য্যের আভাস হৃদয়ে স্থান পাইলেও অতি বড় হৃদয়বৃত্তিকেও অতি শীঘ্র অতি সংকীর্ণতার মধ্যে আনয়ন করে। মাৎসর্য্য বলিতে পরের উৎকর্ষাসহনকে বুঝায়, অর্থাৎ পরের উৎকর্ষ দেখিয়া সহ্য করিতে না পারা, ভাল না লাগা, মনটি বিমর্ষ হইয়া আসা, ইত্যাদি হৃদয়ের ভাবসমূহকে **মাৎসর্য্য** বলা যায়। এই মাৎসর্য্য নামক হীন বৃত্তিটি যে স্থানে অবস্থান করে তাহার পার্শ্বে প্রতিষ্ঠাশাও অনুচরী হইয়া অবস্থান করে। আমি দশজনের মধ্যে গণ্যমান্য হইব, দশজন আমার পদানত হইবে, সকল কর্ম্মে আমি অগ্রণী হইয়া সকলের উপর প্রভুত্ব করিব, সর্ব্বাগ্রে যশোভাগী আমিই হইব, ইত্যাদি আকাঙ্ক্ষাময়ী মনোবৃত্তিকে প্রতিষ্ঠাশা বলা যায়। যদি

মনুষ্যহৃদয়ে চণ্ডালসদৃশ মাৎসর্য্য বাস করিতে স্থান পায় তাহা হইলে সেই স্থানে তাহার অনুচরী পিশাচীর ন্যায় প্রতিষ্ঠালালসাও আসিয়া উপস্থিত হইবেই হইবে। অথবা যদি প্রতিষ্ঠালালসা পিশাচীকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া যায় তাহা হইলে ঐ পিশাচীপ্রিয়তম মাৎসর্য্য চণ্ডালও সেই হৃদয়ভূমিকে আক্রমণ করিয়া অধিকার করিবেই করিবে। ইহাদিগের ভীম তাণ্ডবনর্ত্তনে হৃদয়ের যাবতীয় সদ্‌গুণরাশি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ইহাদের পদতলে পড়িয়া থাকিবে। ইহারা কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না।

দেখুন আমি কোনও দীনদরিদ্রজনকে কিছু দান করিলাম, আমার দেখাদেখি আর কোন সদাশয় ব্যক্তি আর কিছু বেশী দান করিলেন। তখন কোন ব্যক্তি তাঁহার গুণগান করিয়া বলিলেন, "মহাশয় বড় দয়াল;" আবার অন্য কোন সদাশয় ব্যক্তি ঐ দরিদ্রকে তদপেক্ষা কিছু বেশী দান করিলেন, তখন তাঁহাকেও লোকে ধন্যধন্য করিতে লাগিল। কিন্তু প্রথম দাতা যে আমি, সেই আমাকে কেহ কোন ধন্যবাদ দিল না। এক্ষেত্রে আমার অন্তঃকরণে যদি মাৎসর্য্য নামক চণ্ডাল থাকে, অর্থাৎ ইহাদের উৎকর্ষ আমি যদি সহিতে না পারি, তখন মনে হইবে, "ওঃ, ব্যাটা, ক্যাঙ্গ্‌লা খুব মার্‌লে ত! ব্যাটা দুহাতে লুট্‌ছে। এ লোকগুলোও ত বোকা কম নয়, একটা ক্যাঙ্গ্‌লাকে অত দেওয়া কেন বাপু? ঠাকুর দেব্‌তা হয় সাধু সন্ন্যাসী হয়, বা কোন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হয়, তা হ'লে দানের ফল আছে; একটা ক্যাঙ্গ্‌লা, তাকে আবার এত?" ইহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিষ্ঠালালসা আসিয়া উপস্থিত হইবে, মনে হইবে, "লোকগুলো ওদেরই যশ গাচ্ছে, আঃ—আজ আর ট্যাকে পয়সা নাই, থাক্‌লে আবার কিছু ওদের চেয়ে বেশী দিতাম।" ইত্যাকার প্রতিষ্ঠালিপ্সা আসা মাত্রই আমার মনে অসূয়ার উৎপত্তি হইবে, অর্থাৎ আমি তাঁহাদের গুণগুলি ত দেখিতে পাইবই না, পরন্তু তাহাতে দোষের আরোপ করিব। * মনে হইবে, "লোকগুলো একচোখো, না হয় দুটো পয়সাই বেশী দিয়েছে, তাতে অত কেন বাপু? প্রথম ত আমিই দিলাম, সেদিকে কেউ দেখে কি? যারা দিলে, আমার দেখা দেখি ত দিলে! ক্যাঙ্গ্‌লাটা ত একবার বল্‌তে পার্‌ত, 'ঐ বাবুই সকলের মূল, ওঁরই কৃপায় আমার সব।' না, এখানে মানুষ নাই, লোক চিন্‌বার মত লোক নাই, ছ্যাঃ ছ্যাঃ,

---

* অসূয়া গুণেষু দোষারোপঃ।

এখানে কোন ভাল মানুষ থাকে ? দূর ছাই চল। মনে হচ্ছে, ক্যাঙ্গ্‌লাটাকে ছুটো ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিই, সময় পেলে ওদেরও দেখে নিব—কে কেমন দাতা।" ইত্যাদি নানাভাবে অসূয়া বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া আমার হৃদয়ের দয়া ক্ষমা বিনয় সৌজন্য সদাশয়তা প্রভৃতিকে দগ্ধ করিয়া হৃদয়কে ভস্মস্তূপে পরিণত করিবে।

৺কাশীধামে কালভৈরবের সংলগ্ন ক্ষুদ্র একটি মঠে প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে ওঁ শ্রীমৎ পরমানন্দ তীর্থ স্বামী বিষ্ণুপাদ অবস্থান করিতেন। ইনি ভট্টপল্লীর প্রসিদ্ধ ঠাকুর সন্তান। যেমন জ্ঞানী তেমনই বিষয়বিরক্ত, অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রভা, অথচ অতি মনোমুগ্ধকর সৌম্য শান্ত বিগ্রহ; ইনি বয়সে অতি বৃদ্ধ হইলেও বলিষ্ঠ ছিলেন, যুবকসদৃশ উৎসাহে তীব্র বৈরাগ্য সহকারে নিজ সন্ন্যাসোচিত নিয়মসমূহ পালন করিতেন। তাৎকালিক কাশীর নরেশ, রাজা শিবশেখর, দ্বারবঙ্গের মহারাজ প্রভৃতি ইহার অত্যনুগত ভক্ত ছিলেন। কাশীর বিখ্যাত বৈদান্তিক সম্প্রদায়, পণ্ডিতমণ্ডলী এবং প্রসিদ্ধ দণ্ডী সন্ন্যাসিগণ ইঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও ত্রিসন্ধ্য গঙ্গাস্নান, মধ্যাহ্ন দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক জপ ধ্যানাদি সাধন, মধ্যাহ্নাতীত-কালে বিপ্রগৃহে মাধুকরী ভিক্ষা তাঁহার অপতিত নিয়ম ছিল। কোনও অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যফলে উক্ত মহাপুরুষের শ্রীচরণোপান্তে অন্তেবাসীর পদ লাভ করিয়া নিজকে কিছুকালের জন্য পরম ধন্য মনে করিয়াছিলাম। আমি তখন ব্রহ্মচারীর বেশে থাকিতাম। সেই সময়ে ৺শঙ্কর শৃঙ্গেরী মঠের তুই দণ্ডী সন্ন্যাসী তাঁহার নিকট পঞ্চদশী বেদান্তগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। আমি অযোগ্য হইলেও তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীপাদ স্বামীজির ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতাম। সেই দণ্ডী মহোদয়দ্বয়ের সঙ্গে সেবক একটি ব্রহ্মচারী ছিলেন। তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে আসিতেন। একদিন অপরাহ্ণে পাঠান্তে শ্রীপাদ স্বামীজি আমাকে উদ্দেশ করিয়া বঙ্গবাসীদিগের ভক্তিধর্ম্মের প্রতি স্বতঃই আকৃষ্টতা ভক্তিপ্রিয়তা ইত্যাদি প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিলেন, "এই বঙ্গীয় ব্রহ্মচারী বালকটি খুব নাম জপ করে" ইত্যাদি। দণ্ডী মহোদয়দ্বয় স্নিগ্ধ কৃপাদৃষ্টিতে আমার প্রতি অবলোকন করিয়া একটু মৃদু হাসিলেন মাত্র, কিছু বলিলেন না। কিন্তু ব্রহ্মচারীটি বলিয়া উঠিলেন, "ইয়ে ক্যায়সে ব্রহ্মচারী হ্যায়, ব্রহ্মচারীকে লক্‌ষণ দেখ্‌নে

নেহি পড়্তে হে, দেখ্ পড়্তি হি লম্বে লম্বে ফোটা অউর মোটে মোটে মালা কি আড়ম্বর। মহারাজ, এ কোন সম্প্রদায়ী ত নেহি হ্যায়।" একটু ক্ষুব্ধ হইয়া একটি দণ্ডী মহোদয় অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্বরে বলিলেন, "কেয়া, ফোটা মালা রাখ্‌নেসে ব্রহ্মচারী নেহি হো শক্‌তে হে ?" ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন, "সম্প্রদায়ী না হোনে পর ব্রহ্মচারী স্বীকার হাম্‌তো কভি করেঙ্গে নেহি।" শ্রীপাদ স্বামীজি তখন "শিব শিব নারায়ণ, অলমলম্" উচ্চারণ করিয়া উঠিলেন। দণ্ডী মহোদয়দ্বয় শ্রীপাদ স্বামীজির চরণসমীপে প্রণত হইয়া "ওঁ নমো নারায়ণায়" বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। আমি বিস্মিত হইলাম, তদপেক্ষা দ্বিগুণতর লজ্জিতও হইলাম। আমি তখনও এই সব সাম্প্রদায়িকতা রূপ মাকাল ফলের আস্বাদ পাই নাই। এই প্রথম নমুনা পাইলাম। অবশ্য জীবনে আরও ঐ প্রকার মাকাল ফলের গৌরব শত শত প্রকারে অবগত আছি। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম করুণায় এই প্রথম নমুনা আস্বাদনেই আমাকে পূর্ণ করিয়া দেওয়ায় জীবনে এযাবৎকাল আর আস্বাদনে অগ্রসর হই নাই। বলা বাহুল্য ব্রহ্মচারিবেশে থাকিলেও আমার শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন এবং তদঙ্গীয় সাধন গোপীচন্দনাঙ্কিত উর্দ্ধপুণ্ড্রধারণ, তুলসীমালাধারণ, এবং প্রকাণ্ড শিখাবিশিষ্ট মুণ্ডিত মস্তক ছিল ; কেবলমাত্র গৈরিক বসন পরিধান থাকায় আমি ব্রহ্মচারী হইতে পারি কি ? যাহা হউক পরদিন পাঠকালে ব্রহ্মচারীকে দেখিলাম না। পাঠান্তে সন্ন্যাসিদ্বয় আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং ব্রহ্মচারীর ব্যবহারে যাহাতে দুঃখিত না হই তজ্জন্য আমাকে সদুপদেশ দান করিলেন। শ্রীপাদ স্বামীজি মহারাজ আমার প্রতি কারুণ্যমসৃণনেত্রে চাহিয়া বলিলেন, "তুল্য-নিন্দাস্তুতি র্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।" আমি তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিলাম। পরদিন দণ্ডিদ্বয় এবং তাঁহাদের সঙ্গে ব্রহ্মচারীও আসিলেন। শ্রীপাদ স্বামীজি দণ্ডিদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "অস্তু কিঞ্চিৎ বিধিৎসামি শ্রীমদ্ভ্যাং যদি রোচতে।" সন্ন্যাসিদ্বয় তৎক্ষণাৎ নতজানু হইয়া দণ্ড উত্তোলনপূর্ব্বক "ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি" একজন উচ্চারণ করিলেন, অপরজন "ভগবৎপাদানাং যথেপ্সিতং শিরসি বিধার্য্যম্ ওঁ বিধার্যম্" বলিলেন। আমি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলাম। আমার নিকট সেই স্থানটি সেই সময়ের জন্য কি মূর্ত্তি ধারণ

করিয়াছিল তাহার স্মৃতি এখনও আমার হৃদয়কে আলোড়ন করে। কি নিস্তব্ধ, কি গম্ভীর অথচ প্রসন্নতাপূর্ণ শ্রীপাদ স্বামীজির মুখের আজ্ঞা, অথচ গৌরবপূর্ণ সম্মানসূচক আবার কি উচ্চমর্য্যাদাব্যঞ্জক ভক্তিপূর্ণ শিষ্যোচিত আজ্ঞাপালনে সম্মতিসূচক উত্তর দান। কি মধুর আদর্শ, কি চমৎকার মূর্ত্তিমৎ মর্য্যাদ! সকলেই আমরা শ্রীপাদ স্বামীজির মুখের প্রতি স্তব্ধদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া রহিলাম। একটু পরেই "শিব শিব নারায়ণ" উচ্চারণ করিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, **"ব্রহ্মচারিন্, রাহুগ্রস্তঃ শশী যথা," "গঙ্গায়াং স্নানমাচর্য্য গায়ত্রীং শতশঃ জপেৎ", "গচ্ছতু", "পশ্চাদিহাগত্য নমস্কর্ত্তব্যম্।"** ব্রহ্মচারী গাত্রোত্থান করিলেন, তার পর শ্রীপাদ স্বামীজি আমাদিগকে বসিতে আজ্ঞা দিয়া পাঠ আরম্ভ করিলেন। পাঠান্তে সকলেই ব্রহ্মচারীর অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ব্রহ্মচারী আর্দ্রবসনে উপস্থিত হইয়া শ্রীপাদ স্বামীজির চরণোপরি মস্তক রাখিয়া "ওঁ নমো নারায়ণায়" বলিয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। "শিব শিব নারায়ণ, শিব শিব নারায়ণ" উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীপাদ স্বামীজি ব্রহ্মচারীর মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন, দণ্ডিদ্বয় দণ্ডায়মান হইয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে "ওঁ শিবমস্তু, ওঁ শিবমস্তু" উচ্চারণ করিলেন। অন্যসম্বলরহিত আমিও অন্যের অশ্রুতভাবে আমার অনন্যসম্বল "শ্রীরাধামদনগোপাল, শ্রীরাধামদনগোপাল" উচ্চারণ করিলাম। শরীরে কম্প উপস্থিত হইল, হৃদয়ের মধ্যে কেমন একটা আনন্দ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। চক্ষে জল আসিল, আমার প্রাণ যেন কেমন ব্যাকুল-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে ব্রহ্মচারী গাত্রোত্থান করিলেন। দেখিলাম ব্রহ্মচারীর অবিরল নয়নধারায় প্লাবিত মুখমণ্ডল অতিশয় প্রসন্ন। শ্রীপাদ স্বামীজি মহারাজ তখন তাঁহাকে বসিতে বলিয়া কিছুক্ষণ পরে ববিলেন, **"চণ্ডাল-নির্ম্মুক্তোঽস্তি শ্রীমান্" "মাৎসর্য্যমেব চণ্ডালঃ।"** এই মাৎসর্য্যের চণ্ডাল সংজ্ঞা শ্রীমৎ স্বামীজির শ্রীমুখেই প্রথম শ্রবণ করিয়াছিলাম। আজ মানসে তাঁহারই শ্রীপাদপদ্মে মস্তক রাখিয়াই তাঁহার করুণাকাহিনী কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া এই হতভাগ্য অযোগ্য আমি আত্মশোধন লালসায় সেই জ্ঞানদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করিতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমেই দ্বিতীয় শ্লোকে ভাগবতের অধিকার দেওয়া হইয়াছে

"নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্",* অর্থাৎ যাঁহারা পরের উৎকর্ষ দেখিয়া দুঃখবোধ করেন না এবং সর্ব্বভূতের প্রতি অনুকম্পাবান্ তাঁহারাই এই ভাগবত ধর্ম্মের অধিকারী। হায়, আজীবন শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক কণ্ঠস্থ করিলাম, কত প্রকার ব্যাখ্যার পরিপাটি শিখিলাম, কত মান যশঃ অর্থ এই শ্রীভাগবত দ্বারা উপার্জ্জন করিলাম, কিন্তু নির্ম্মৎসর ত হইলাম না। মৎসররহিত ধর্ম্ম ভাগবত পারমহংস ধর্ম্ম। এই পরম ধর্ম্মগ্রন্থ ক্রোড়ে করিয়াও নির্ম্মৎসর হওয়া দূরের কথা, প্রত্যুত দেবদ্বিজ সাধুগুরু প্রভৃতির কিঞ্চিৎ উৎকর্ষ দেখিলেও, অর্থাৎ আমা অপেক্ষা ভাল কোনও পাঠক আছেন, তাঁহার পাঠ প্রত্যহ তিন চারি স্থলে হইতেছে, বেশ উচ্চ দরে ঘণ্টায় ৫।৭।১০ টাকা হিসাবে চলিতেছে, শিষ্যও প্রচুর হইতেছে, লোকমোহনও বেশ চলিতেছে, ইত্যাদি শুনিলে, অথবা কোন সাধু মহাত্মার উপদেশ আমার উপদেশ অপেক্ষা মূল্যবান্ হইতেছে এই প্রশংসা শুনিলে, মাৎসর্য্যে প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। যে কোন প্রকারে হউক অপরের উৎকর্ষনাশ না করিলে আমার শান্তি নাই। হায়রে আমার ভাগবতধর্ম্ম! হায়রে আমার ভাগবত অধ্যয়ন। যে মাৎসর্য্য চণ্ডালের গ্রাস হইতে জীবকে নিস্তার করিবার জন্য শ্রীভগবান্‌ই শ্রীভাগবত রূপ ধারণ করিয়া আছেন সেই ভাগবতের শ্লোকে শ্লোকে, পংক্তিতে পংক্তিতে, আমার ব্যাখ্যায় প্রতিষ্ঠাশা পিশাচীর করধারী মাৎসর্য্য চণ্ডালের প্রভাব ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। হা ধিক্! চির জীবন ধরিয়া দরিদ্র দুঃখী ব্রাহ্মণাদির জীবিকার গ্রাস কাড়িয়া, সাধু সন্ন্যাসীর ভিক্ষার গ্রাস কাড়িয়া ভাগবতের বিখ্যাত ব্যাখ্যাতা আচার্য্যপাদ, প্রভুপাদ, স্বামিপাদ, শ্রীপাদ কত কিছু সাজিতেছি, কিন্তু জীবনে একদিনের জন্যও, একক্ষণের জন্যও শ্রীমদ্ভাগবত বক্ষে ধারণ করিয়া নিষ্কপটে বলিলাম না, চাহিলাম না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা করিলাম না, **"হে শ্রীমদ্ভাগবত, দয়া কর, আমাকে নির্ম্মৎসর কর, আমার হৃদয়স্থ মাৎসর্য্য চণ্ডালকে অপসারিত করিয়া তোমার সেবার প্রকৃত অধিকারী কর।"**

---

* ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

আমার কোন অনির্ব্বচনীয় পুঞ্জীকৃত পরম সৌভাগ্যের চরম ফলে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগুরুবিষ্ণুপাদপদ্মসমীপে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন আরম্ভ করি। সেই সময় "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত" শ্লোক অধ্যয়ন কালে শ্রীপাদসমীপে নিবেদন করিয়াছিলাম, "মাৎসর্য্যপ্রতিঘাতায় কিমস্তি পরমৌষধম্?" শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম তখন আদেশ করিয়াছিলেন, **"ঔদার্য্যং ভেষজং পরং মাৎসর্য্য-প্রতিষেধকম্।"**

সর্ব্বভূতে মৈত্রীভাব (১) **হইতেই এই ঔদার্য্যের উৎপত্তি হয়। স্বার্থত্যাগই এই ঔদার্য্যের চরম লক্ষ্য।** মনে রাখা চাই **শ্রীভাগবতধর্ম্ম পরম ঔদার্য্যময়,** যে ধর্ম্মে মুক্তিসুখাকাঙ্ক্ষাকেও স্বার্থজ্ঞানে পরিত্যাগ করিবার উপদেশ।

---

(২) সর্ব্বভূতে প্রকৃত মৈত্রীভাবে শ্রীহরি প্রসন্ন হন। তিনি প্রসন্ন হইলে অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যের উদয় হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

যস্য প্রসন্নো ভগবান্ গুণৈর্মৈত্র্যাদিভির্হরিঃ।
তস্মৈ নমন্তি ভূতানি নিম্নমাপ ইব স্বয়ম্॥ ৪।৯।৪৪।

"ক্ষমা চেতোবিশোধনী"

ক্ষমা

পরম স্নেহাস্পদ—

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা

ঠাকুর সাহেব, সুবেদার, ত্রিপুরা রাজ্য।

মদীয় **শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে** অর্পিত **কুসুমাঞ্জলির** এই **নির্ম্মাল্য** আমার স্নেহাশিস্ রূপে আপনাকে প্রদান করিলাম। ইহা আপনার জীবনের পরম মঙ্গল বিধান করুক।

শ্রীভাগবতস্বামী।

ক্ষমা হৃদয়ের একটি বৃত্তি, যাহা মনুষ্যহৃদয়ের শোধনী সম্মার্জ্জনী। এই ক্ষমা সম্মার্জ্জনী দ্বারা হৃদয়ের আবর্জ্জনা সমূহ নিষ্কাসন করিতে পারিলে হৃদয় পরিষ্কৃত হইয়া **শান্তিশ্রী** ধারণের যোগ্যতা লাভ করে।

ক্ষমা কাহাকে বলে?—ক্ষমার মর্ম্মস্থল **সহিষ্ণুত্ব,** সহনশীলতার নামই ক্ষমা। ক্ষমাকে সম্মার্জ্জনী বলায় কেহ দুঃখ করিবেন না। দেবমন্দিরে মন্দির-সম্মার্জ্জনীও থাকে, তাহা বন্দনীয়াই। ক্ষমাগুণ বড় গুণ। অনেকে রাজ্য ঐশ্বর্য্য দান করিতে পারেন, নিজে নানাপ্রকার ভোগৈশ্বর্য্যাদি পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য মার্গ অবলম্বন করিতে পারেন, অনেকে নানাবিধ জ্ঞানযোগমার্গাদির রহস্য অবগত হইয়া মহাজ্ঞানী যোগী হইতে পারেন, কিন্তু দান পুণ্য ত্যাগ বৈরাগ্য জ্ঞান যোগ যাহা কিছু বলুন না কেন, এই ক্ষমা সুন্দরীর সৌন্দর্য্যালোক না পাইলে সকলেই যেন নিষ্প্রভ। **ধৃতি** অর্থাৎ **ধীরতার গর্ভে** এই **ক্ষমা** সুন্দরীর জন্ম হয়। মাতৃগুণদোহনকারিণী এই ধৃতিদুহিতা **ক্ষমার** সঙ্গে **মৈত্রী**

অর্থাৎ সর্ব্বভূতে মিত্রতার গর্ভজাত পুত্র **ঔদার্য্যের** সম্মিলন হইলে ক্ষমার সৌন্দর্য্যের ঝলক ঔদার্য্যের অঙ্গে লাগিয়া আবার ঔদার্য্যের মাধুর্য্য ক্ষমার প্রতি অঙ্গে প্রতিফলিত হইয়া হৃদয়মন্দিরে এক অপূর্ব্ব সুষমার সৃষ্টি করে। হৃদয়মন্দিরে ইহারা বাসস্থান লাভ করিলে সত্য দয়া বিনয়াদি সকলেই তখন উজ্জ্বল হইয়া নিজ নিজ স্নিগ্ধ অমৃতধারা বর্ষণ করে। তখনই হৃদয়ে **শান্তিশ্রী** ফুটিয়া উঠে। (৩)।

ধৃতি অর্থাৎ ধীরতা—"মনসোঽচাঞ্চল্যং ধৃতিঃ।" চিত্তবিকারের কারণ বর্ত্তমানেও যদি চিত্তবৃত্তির বিকৃতি না হয় তাহা হইলে এমন যে চিত্তের অবস্থা তাহাকেই **ধৃতি** বা ধীরতা বলে। এই মাতৃগুণসম্পন্না ক্ষমা বা **"ক্ষান্তির-ক্ষুভিতাত্মতা",** অর্থাৎ চিত্তক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও ক্ষোভের যে অভাব তাহাকেই ক্ষান্তি বা ক্ষমা বলে। মাতৃসঙ্গবর্জ্জিত হইয়া ক্ষমা কোন স্থানেই বাস করে না। যদি ক্ষমা সুন্দরীকে হৃদয়ে রাখিতে চান তাহা হইলে ক্ষমাজননী ধৃতিকে (ধৈর্য্যকে) খুব যত্ন করুন। হৃদয়ে ধৃতি বাস না করিলে ক্ষমা বাস করিবে না। ঔদার্য্যের সহযোগে ক্ষমার গর্ভে **শম দম** নামক যমজ পুত্র হয়। ইহারাও মাতৃগুণসম্পন্ন। **শম** বলিতে অন্তরিন্দ্রিয়সংযম বুঝায়। এই শম গুণটি যদি কোন অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যে কোনও মহাপুরুষের কৃপামৃত লাভ করে তাহা হইলে তখন ইহা ভগবন্নিষ্ঠ হইয়া নিজ আধার মনুষ্যহৃদয়কে চরম কৃতার্থের পথে উন্নীত করে। **"শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধিঃ।"** ভগবন্নিষ্ঠাতেই শমের প্রকৃত পর্য্যবসান। **দম** বলিতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযমকে বুঝায়। ইহারা উভয়েই স্বীয় মাতা ক্ষমার 'অক্ষুভিতাত্মতা' গুণে গুণবান্ হইয়াও স্বীয় মাতামহী **ধৃতির** ক্রোড়েই সর্ব্বদা লালিত পালিত হইয়া থাকে। এখন দেখুন আপনার হৃদয়মন্দিরে যদি এই প্রকার পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট **ধৃতি ক্ষমা মৈত্রী ঔদার্য্য শম দমাদির** মিলিত একটি পরিবার বাস করে তাহা হইলে দেখিবেন "মান অপমান" "নিন্দা স্তুতি" "রাগ দ্বেষ" "শীত উষ্ণ" "সুখ দুঃখ" ইত্যাদি দ্বন্দ্ব ধর্ম্মসমূহ আর আপনাকে উদ্বেগ দিতে সমর্থ

---

(৩) দয়াক্ষমাদি যদি ভক্ত্যুন্মুখ হয় তাহা হইলে তাহাতে ভগবান্ পর্য্যন্ত বশীভূত হন। যথা,—

বরঞ্চ মৎ কঞ্চন মানবেন্দ্র বৃণীষ্ব তেঽহং গুণশীলযন্ত্রিতঃ। শ্রীমদ্ভাগবত, ৪।২০।১৫।

গুণশীলাভ্যাং যন্ত্রিতো বশীকৃতঃ প্রাকৃতাভ্যাং তাভ্যাং বশীকারাসম্ভবাদপ্রাকৃতে ভক্ত্যুন্মুখে এব জ্ঞেয়ে। গুণো দয়াক্ষমাদিঃ শীলং বিনয়স্নেহাদিময়ঃ স্বভাবঃ।—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ।

হইবে না। আর এই প্রকারে হৃদয়মন্দির উদ্বেগশূন্য হইলে স্বয়ংই শান্তিশ্রীর উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

শ্রীগীতার মধ্যে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন **"ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্,"** ত্যাগ হইতে শান্তি লাভ হয়। এই ত্যাগের মূল মর্ম্মই **সহনশীলতা।** এই সহনশীলতাগুণ হৃদয়ে না থাকিলে প্রকৃত ত্যাগই হয় না। স্ত্রীপুত্রাদি ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য বেশ গ্রহণ পূর্ব্বক পর্ব্বতগুহাদি নির্জ্জন স্থলে বাস করিলেও তাহাকে প্রকৃত ত্যাগ বলা যায় না, যদি সহনশীলতা না থাকে। বরং মানাপমান স্তুতিনিন্দা শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব ধর্ম্মসমূহ সহিষ্ণুতাহীন তাদৃশ ত্যাগী বৈরাগীর দুঃখপ্রদ হইয়া হৃদয়ে ভীষণ অশান্তির সৃষ্টি করে। সুতরাং গীতায় উক্ত শান্তির মূলে যে ত্যাগ তাহাও সহনমূলক। এই সহনগুণের নামই ক্ষমা। ক্ষমা সুন্দরী বড়ই **স্নিগ্ধা,** দেহ মন প্রাণকে বড় স্নিগ্ধ রাখে। ক্ষমা হৃদয়বাসিনী হইলে শীতল প্রবাহ দ্বারা সর্ব্ববিধ উষ্ণতাকে প্রশমন করিয়া শরীরের পুষ্টি বিধান করে। ক্ষমা সুন্দরী সদাই প্রসন্নাননা, **হাস্যমুখী।** হৃদয়ে ইহার স্থান হইলে মানুষ সর্ব্বদাই প্রসন্নতা লাভ করিতে পারে। যতই উদ্বিগ্নকর অবস্থা আসুক না কেন এক ক্ষমা সুন্দরীর কৃপায় মনুষ্য সর্ব্বাবস্থাতেই হাস্যমুখে সর্ব্বপ্রকার উদ্বেগ সহ্য করিতে সক্ষম হয়। **উদ্বেগ** কাহাকে বলে ?—চঞ্চলতার নামই উদ্বেগ। সাংসারিক লাভ অলাভ, মান অপমান, রাগ দ্বেষ প্রভৃতির ঘাতপ্রতিঘাতের দ্বারা চিত্তের যে লঘুতা তাহাকেই **চাঞ্চল্য** বলা যায়। **চাপলং চিত্তলাঘবম্।** উহাই উদ্বেগ।

ক্ষমা ধরিত্রীর তুল্যা স্থিরা। জননীর ন্যায় ক্ষমা চিত্তকে ধারণ করিয়া জাগতিক নানাবিধ চিত্তচাঞ্চল্যকর ব্যাপার হইতে রক্ষা করে, অস্থির চিত্তকে স্থির ধীর এবং সুশীতল করে। সুধীগণ ইহাকে হৃদয়সিংহাসনে জননীতুল্য জ্ঞানে সেবা করেন।

"দণ্ডন্যাসঃ পরং দানম্।" ক্ষমাগুণটি হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে মনুষ্য দেবদুর্ল্লভ **দানের** অধিকারী হইতে পারে। এ দান যেমন তেমন দান নহে, যে দানের অধিকার দেবাদিরও দুর্ল্লভ। সর্ব্বজীবে **অভয়দান**—ইহাই শ্রেষ্ঠদান, এ দানের তুলনা নাই। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—দণ্ডন্যাসঃ পরং দানম্। দণ্ড অর্থাৎ পরদ্রোহ, ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ। পরের প্রতি দ্রোহত্যাগই

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান, আর এই পরদ্রোহত্যাগের নামই **অভয়দান।** আমার মনে হয় মানুষের পরম সৌভাগ্যে শ্রীভগবানের নিকট হইতে যখন **অভয়দান** পাইবার ভাগ্যোদয় হয় সেই সময়ই মানুষের হৃদয়ে ক্ষমার সাহায্যে **সর্ব্বভূতে অভয়দানরূপ মনোবৃত্তিরও উদয় হয়।** পরমার্থিক ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার স্থান সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বধর্ম্মনমস্কৃত। আমাদের আর্য্যশাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারিটি আশ্রম ধর্ম্ম স্বীকৃত হইয়াছে। এই আশ্রম সমূহের মধ্যে চরম সন্ন্যাস আশ্রমই সকলের পরম পূজ্য বলিয়া সন্ন্যাসিগণই একমাত্র "ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ" বিধানে নমস্কারের পাত্র। শাস্ত্র বলেন, "দণ্ডগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ।" হরি হরি, ইহার রহস্য অনুসন্ধান করুন, চমৎকৃত হইবেন। বিধিপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইলে নিজের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য, বিরজা হোম প্রভৃতি সমাপন করিয়া **প্রেষ মন্ত্র** উচ্চারণ করিয়া দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। এই দণ্ড গ্রহণকালে একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। মন্ত্রটি এই—**"অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো মত্তঃ স্বাহা।"** ইহার রহস্য এই যে আজ হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থাবর জঙ্গমাদি যাবতীয় ভূতগণ আমা হইতে **অভয়** লাভ করুক, আমি আর কাহারও ভয় উৎপাদন করিব না, এই দণ্ড গ্রহণ করিলাম, প্রাণী মাত্রেই যে কোন ব্যবহারই আমার প্রতি করুক না কেন আমি আর কাহারও প্রতি দণ্ড বিধান করিব না; আমার উপর সকলেরই দণ্ড দিবার অধিকার রহিল, আমার কাহারও উপর দণ্ড দিবার অধিকার রহিল না; এই দণ্ডই সকলের প্রদত্ত দণ্ডের সাক্ষী স্বরূপে গ্রহণ করিলাম; সর্ব্বজীবের দণ্ডধারণের প্রতীক স্বরূপ এই বংশদণ্ডকে নারায়ণরূপে গ্রহণ করিলাম।

মনোবাক্‌কায়দণ্ডই প্রকৃত দণ্ডধারণের মর্ম্মার্থ, অর্থাৎ নিজের মন বাক্ এবং শরীরকে দণ্ড করার জন্য সন্ন্যাসীর দণ্ডধারণ। মন বাক্য এবং শরীরের দ্বারা কাহারও দ্রোহ আচরণ না করাই মনোবাক্‌কায়ের দণ্ড। "বেণুভি র্ন ভবেদ্ যতিঃ", শুধু ত্রিখণ্ড বংশধারণ মাত্রই ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। "ত্যাগঃ সন্ন্যাস উচ্যতে।" এই সর্ব্বধর্ম্মনমস্কৃত পরমধর্ম্ম কেবলমাত্র ক্ষমা গুণের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। **ক্ষমাশীল ব্যক্তিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। শমদম তাঁহার নিত্য সহচর। তিনি সর্ব্বপূজ্য।**

"বিনয়ো ভূষণশ্রেষ্ঠঃ"

বিনয়ঃ

পরম স্নেহাস্পদ—

শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ দাস, এম্ এ, বি এল্,

নোয়াখালী।

মদীয় **শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে** অর্পিত **কুসুমাঞ্জলির** এই **নির্ম্মাল্য** আমার স্নেহাশিস্ রূপে আপনাকে প্রদান করিলাম। ইহা আপনার জীবনের পরম মঙ্গল বিধান করুক।

শ্রীভাগবতস্বামী।

মানুষের বিনয় নামক গুণটি উৎকৃষ্ট মধুময় গুণ। বিনয় গুণটি চিত্তের কোমলতা আনয়ন করে। বিনয়পূর্ব্বক যাহা কিছু ব্যবহারাদি করা যায় তাহা সকলেরই অতিশয় সুখপ্রদ হয়। **বিনয় কাহাকে বলে? "ঔদ্ধত্যপরিহারো যো বিনয়ঃ স প্রকীর্ত্তিতে।"** পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ঔদ্ধত্যপরিহারকেই বিনয় বলেন। ব্যবহারাদি স্থলে ঔদ্ধত্যভাবটি লোকের মনে অলক্ষিতে ব্যথাই প্রদান করে। ঔদ্ধত্য ব্যবহারে চিত্তের উপর ক্রমশঃ একটি গর্ব্বের প্রলেপ পড়িতে থাকে। বারংবার ঔদ্ধত্য ব্যবহারে ক্রমশঃ গর্ব্বের প্রলেপ পড়িতে পড়িতে চিত্তটি গর্ব্বপর্ব্বতায়মান হইয়া উঠে। সুধী জনেরা বিনয় নামক গুণকে অবলম্বন করিয়াই ঔদ্ধত্য ঘটিত গর্ব্বের প্রলেপকে মার্জ্জন করেন। বাল্যকালে পড়িয়াছি, **বিদ্যা বিনয়ং দদাতি**। বস্তুতঃ বিদ্যা তাহাকেই বলে যে বিদ্যা বিনয়ভূষণকে ডাকিয়া আনিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তিকে ভূষিত করে। বিদ্বান্ ব্যক্তি

যদি বিনয়ভূষণে ভূষিত না হইতে পারেন তাহা হইলে বিদ্যাসুন্দরী তাঁহার প্রতি প্রসন্নাই হইতে পারেন না, বরং কুপিতা হইয়া তাঁহাকে অভিসম্পাতই করেন। যিনি যত বড়ই বিদ্বান্ হউন্ যদি বিনয়ের পরিবর্ত্তে ঔদ্ধত্যই প্রকাশ পায় তাহা হইলে ইহলোকে লাভ যশঃ প্রতিষ্ঠাদি তাঁহার সুদূর পরাহত, এবং ঔদ্ধত্য ও দম্ভ হেতু শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন না হওয়ার পারলৌকিক সুখ ও তাঁহার অদৃষ্টে লাভ হয় না।

বিনয়কে মধুময় বলা হইয়াছে। সমস্ত কর্ম্মে নিজের মধুময়ত্বকে ঢালিয়া সকলকেই ইহা মধুময় করিয়া তুলে। মনে করুন আপনি একটি সত্য কথা বলিলেন, সেই স্থলে যদি বিনয় সহকারে সত্য কথাটি বলেন তাহা হইলে আপনার সত্য কথাটিও মধুময় হইয়া উঠিবে। শুধু তাহাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে আপনার হৃদয়কে এবং যাঁহাকে বলিতেছেন তাঁহার হৃদয়কেও উহা মধুময় করিয়া তুলিবে। ঐহিক এবং পারত্রিক শুভাকাঙ্ক্ষী জন অবশ্য এই বিনয় নামক মধুময় গুণটি উপার্জ্জনে বিরত হইবেন না।

এই মধুরস্বভাব বিনয়ের নিত্যসহচরী লজ্জা সুন্দরী বিনয়কে কোনও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দান করেন। **বিনয়গুণের সঙ্গে সঙ্গেই হ্রীমত্ত্বগুণ প্রকাশ পায়।** এই হ্রীমত্ত্বগুণ বিনয়ী ব্যক্তিতেই অবস্থান করে। লজ্জা সুন্দরীর করাবলম্বী **বিনয়** প্রতি ব্যবহারে নম্রতা প্রকটন পূর্ব্বক কোনও অনির্ব্বচনীয় সুষমায় পূর্ণ হইয়া উঠেন। **বিনয় যেমন ঔদ্ধত্য পরিহারী, লজ্জাও তেমন ধার্ষ্ট্যনাশিনী।** সত্যই চিত্তের উপর গর্ব্ববান্ধব ঔদ্ধত্য, ধার্ষ্ট্য প্রভৃতির উদ্ভট তাণ্ডব আরম্ভ হইলে সত্য দয়াদি কম্পিত হইয়া উঠে। এই স্থলে যদি **বিনয়** এবং সহচরী **লজ্জার** প্রবেশ হয় তাহা হইলে সত্য দয়া ক্ষমা প্রভৃতি চিত্তের সদ্গুণগুলি সুখের সহিত চিত্তের উপর বাস করিতে সক্ষম হয়।

মনে রাখা উচিত বিনয়সূচক কয়েকটি বাক্য শিখিয়া বা বিনয় ব্যবহারের উপযুক্ত করজোড় প্রভৃতি কয়েকটি অনুকরণ শিক্ষা করিয়া আমি বিনয়ী বলিয়া অভিমান করিলে চলিবে না। লোকের নিকট বিনয়সূচক দুইটি কথা বলিলাম, একটু হাতজোড় করিয়া অভিনয় করিলাম, কিন্তু তাদৃশ বিনয়াভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে আমার গুণগরিমা, আমার যশ খ্যাতি, আমার সৌভাগ্য খ্যাপনের আলোক বেশ প্রকাশ পাইতেছে। এই প্রকার চাতুর্য্যপূর্ণ ব্যবহারকে

গুপ্ত ধৃষ্টতা বলা যায়। উহা বিনয় নহে, কাপট্যমাত্র, উহাতে চিত্ত প্রসারতা লাভ করিতে পারে না। লোক ভাষায় যাহাকে 'বেলজ্জ' বলে, সেই বেলজ্জ অন্তঃকরণে প্রকৃত সদ্ভাব অবস্থান করিতে পারে না। আহা! প্রকৃত বিনয় গুণ বড়ই মধুর, নিজের অশেষ মহিমগুণরাশির কিরণচ্ছটায় নিকটস্থ সজ্জনের হৃদয়ে ইহা পরম সুখ দান করে। নিজে লুকাইয়া থাকিয়া অপরকে সুখদান করাই বিনয়ের ধর্ম্ম। যশঃখ্যাতিসাদ্‌গুণ্য মহিমায় লোক সাক্ষাতে বিনয়ী ব্যক্তির যতই উৎকর্ষ প্রকাশ পাইতে থাকে, ততই লজ্জা সহচরীর কর সজোরেই অবলম্বন করিয়া বিনয় তখন অতিশয় বিব্রতই যেন হইয়া পড়েন। অহো কি চমৎকার! বিনয়ী ব্যক্তির সদ্‌গুণমহিমা যখন প্রকাশ পায়, তিনি তখন লুক্কায়িত হন। ধৃষ্টের মত বিনয় করিয়াও তিনি নিজ মহিমা গান শুনিবার আশায় উৎকর্ণ হইয়া উঠেন না, নিজের প্রতিষ্ঠা নিদর্শন দেখিবার জন্য বীতনিদ্র হইয়া জাগরণ করেন না।

যদি কোনও কালে পরম সৌভাগ্যে এই বিনয় ভগবদ্ভক্তির অমৃত ধারায় স্নপিত হইয়া আপনার হৃদয় সিংহাসনে অধিরূঢ় হন তখন পরম মধুর মধুময় দৈন্য নাম ধারণ করিয়া আপনার মানব জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন।

বিনয় আর দৈন্যে কিঞ্চিৎ ভেদ আছে। শুদ্ধ মৃদু অন্তঃকরণের মৃদুতা বাহিরে কিঞ্চিৎ ব্যক্ত হইয়া কার্য্যের উপরে কোমলতার প্রাচুর্য্যই আনয়ন করে—ইহাই বিনয়। আর দৈন্যটি নিজকে সর্ব্বতোভাবে অসমর্থ বোধ করাইয়া অন্তরে বাহিরে উভয়ত্রই বিনয়ের উজ্জ্বল পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে।

অন্যান্য গুণ সকলের ন্যূনতা সত্ত্বেও, অর্থাৎ সত্য, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি গুণের ন্যূনতা থাকিলেও এই বিনয় গুণ যদি থাকে তাহা হইলে মানুষ মহাপুরুষের কৃপাদৃষ্টি লাভে সমর্থ হইতে পারে। বিনয়ী পুরুষের প্রতিই মহাপুরুষগণের কৃপা দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে পতিত হয়।

"দৈন্যং গর্ব্বারিমর্দ্দনম্"

দৈন্যম্

পরম স্নেহাস্পদ—

শ্রীযুক্ত বাবু অতুলকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা বিশ্বাস, বি এ, বি টি,

হবিগঞ্জ।

মদীয় **শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে** অর্পিত **কুসুমাঞ্জলির** এই **নির্ম্মাল্য** আমার স্নেহাশিস্ রূপে আপনাকে প্রদান করিলাম। ইহা আপনার চিত্তেন্দ্রিয়কে নির্ম্মল করিয়া ভগবৎপাদপদ্ম সাক্ষাৎ সেবায় নিয়োজিত করুক।

শ্রীভাগবতস্বামী।

দৈন্য বলিতে দীনতাকে বুঝায়। নিজকে সর্ব্বথা অসমর্থ অর্থাৎ অযোগ্য বোধ করাই প্রকৃত দৈন্য। **ভগবানে আত্মসমর্পণযজ্ঞে পূর্ণ আহুতির নামই দৈন্য।** শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ যতই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয় ততই ভাগ্যবান্ জীবের আত্মার গভীর অন্তস্তল হইতে **"তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা"** এই অমৃতময় মন্ত্রের মধুর মন্দ্রনাদ উত্থিত হইয়া হৃদয়স্থ ভগবৎপ্রেমসমুদ্রকে আলোড়ন করিয়াই বাহিরে দৈন্যরূপ ধারণ করিয়া প্রকাশ পায়। এই দৈন্য নামক সুগন্ধে ভগবান্ মধুসূদন উন্মত্ত হইয়া ভক্তহৃদয়-সরোবরের অগাধ প্রেম সলিলে প্রস্ফুটিত আত্মসমর্পণরূপ শতদলের কোষমধ্যে নিহিত প্রেমামৃত মধু আস্বাদন লালসায় ব্যাকুল হইয়া উঠেন। ভগবদ্ভক্তি-বাসিত ভক্তহৃদয়ের প্রেমামৃতময় দৈন্যটি বিষয়চতুর নিজ স্বার্থ সাধন প্রয়াসী

বিষয়ী জনের চাটুকারিতা নহে, অথবা কাপুরুষতা বা ভীরুতা নহে। ইহা কাপট্যও নহে। এই দৈন্য পরম সত্য আত্মতত্ত্বজ্ঞানোদ্ভাসিত **আত্মার স্বরূপাবির্ভাবের** স্বাভাবিক অবস্থা। বিচার করিলে দেখা যায় জীবের আত্মা স্বাধীন নহে। ইহা পরমাত্মার অধীন, বিশেষতঃ মায়িক জগতে কাল কর্ম্ম গুণাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সৎসঙ্গ ও সদ্‌গুরু কৃপায় জীব যখন এই রহস্যটি অবগত হয় তখন সেই আত্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্বাধীন কর্ত্তৃত্বাদির অভাব বোধে সর্ব্বকর্ম্মে নিজেকে অসমর্থ ও অযোগ্য বোধ করে এবং সর্ব্বকর্ম্মে ঈশ্বরেরই প্রবল কর্ত্তৃত্ব মনে করিয়া জীব তাঁহাতে সর্ব্বতোভাবে প্রপন্ন হয়। **ইহাই দৈন্য।** এই দৈন্য সামান্য দৈন্য নহে। ভাগ্যবান্ জীব সদ্‌গুরুকৃপায় যখন শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সাধন পথে অগ্রসর হইতে থাকে তখন ক্রমশঃই নিজের মায়িক কর্ত্তৃত্ব অন্ধকারটিও অপসারিত হইতে থাকে। "অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।" এই মোহান্ধকার বিদূরিত হইয়া যখন আত্মার স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়, অর্থাৎ নিজের মায়িক দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি আদির কর্ত্তৃত্বে আর বিশ্বাস থাকে না এবং আত্মার "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" ইত্যাদি মায়িক অভিমান লোপ পায়, তখন জীব নিজেতে এবং স্থাবর জঙ্গম কীটপতঙ্গাদি ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অণুপরমাণুতেও এক পরমেশ্বরেরই কর্ত্তৃত্ব অনুভব করে, তখন সেই মহাকর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব সমুদ্রে নিজের সমুদয় কর্ত্তৃত্ব বিসর্জ্জন দিয়া **"এই আমি স্বয়ং স্বতন্ত্র আমি নহি, কেবল তুমি ভিন্ন জগতে কিছুই নাই"** এই জ্ঞান লাভ করে। ইহাকেই **আত্মসমর্পণের পূর্ণাহুতি** বলে। "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" ইহাই জীবের জীবন্মুক্ত অবস্থা। এই প্রকার ভাগ্যবান্ জীব সংস্কারবশতঃ সাংসারিক কার্য্যে অর্দ্ধবাহ্যদশার ন্যায় অবস্থিত থাকিলেও সংসার ধর্ম্মে আর লিপ্ত হন না, দেহস্থিতি কাল পর্য্যন্ত যথাতথা প্রকারে সাংসারিক লোকের সহিত আলাপ বা আদান প্রদানাদি ব্যবহারিক কার্য্যাদির মধ্যে কোনও প্রকারে নিজ কর্ত্তৃত্বের লেশাভাসের সম্ভাবনা দেখিলে তাঁহারা অতিশয় বিচলিত হইয়া উঠেন। তখনই তাঁহাদের হৃদয়ে দৈন্যবেগ উচ্ছলিত হইয়া পড়ে। ব্যাঘ্রমুখগ্রাস হইতে কোন প্রকারে নির্ম্মুক্ত ব্যক্তি আবার কোন স্থানে ব্যাঘ্রাবস্থানের আভাসে, এমন কি ব্যাঘ্রের নাম মাত্র শুনিলেও অত্যন্ত ভীত হইয়া আর্ত্তনাদ করে। এই মায়িক দেহমনঃপ্রাণে-

ন্দ্রিয়াদির ধর্ম্মে অধ্যাস প্রাপ্ত জীবও প্রাকৃত কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অহঙ্কার ব্যাঘ্রের মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইয়া অশেষ বিশেষে চর্ব্বিত হইতেছে। ইহার মধ্যে দৈবাৎ সদ্‌গুরুর কৃপায় যদি কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি এই বিশ্বগ্রাসী অহঙ্কার-ব্যাঘ্রের কবল হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় সেই অহঙ্কারের আভাস মাত্রও দেখেন তাহা হইলে ব্যাঘ্রভয়ে ভীত জনের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে থাকেন। **এই আর্ত্তনাদই দৈন্য,** ইহা সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর বিষয়চতুরের **হীনবৃত্তি তোষামোদ নহে।**

যেমন মনে করুন হঠাৎ আপনার চক্ষুতে একটু কিছু ধূলিকণা প্রবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা মাত্রে আপনার স্থূল বুদ্ধি ইচ্ছার অজ্ঞাত সারেই স্বভাবতঃ চক্ষুর পল্লব পতিত হইয়া চক্ষুর বিঘ্নকর শত্রুতুল্য ধূলিকণাকে চক্ষুর ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে দেয় না, আবার যদি দৈবাৎ কোনও প্রকারে একটি ধূলিকণা চক্ষুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় তাহা হইলে ঐ বিঘ্নকর ধূলিকণাকে চক্ষু হইতে বহিষ্কৃত করিয়া চক্ষুকে রক্ষা করিবার জন্য তৎক্ষণাৎই চতুর্দ্দিকে অবস্থিত রক্ষক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ুমণ্ডলী জল ছাড়িয়া দেয় এবং চক্ষুকে প্লাবিত করিয়া ধূলিকণাকে বহিষ্কার করে এবং চক্ষুকে ধৌত করিয়া পরিষ্কৃত রাখে। ইহা যেমন আপনার স্থূল বুদ্ধি বিবেচনা বা ইচ্ছাদির অপেক্ষা না করিয়া চক্ষুর স্বভাবতঃই হয়, সেইরূপ শ্রীভগবানে সমর্পিতাত্মব্যক্তির হৃদয়স্থ আত্মসমর্পণের বিঘাতক বিরোধী শত্রুতুল্য নিজ স্বতন্ত্র কর্তৃত্বাভিমানরূপ অহঙ্কারটির গন্ধমাত্রও যদি স্বতঃ বা পরতঃ উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা হয় তাহা হইলে ঐ আত্মসমর্পণের রক্ষক পরম বন্ধু দৈন্যটি স্থূল বুদ্ধি বিচারাদির অপেক্ষা না করিয়া হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে স্বতঃই উত্থিত হইয়া তাদৃশ কর্তৃত্বাহঙ্কারটিকে তাড়াইয়া আত্মসমর্পণটিকে রক্ষা করিয়া পুষ্টি বিধান করিতে চেষ্টা করে। কেননা প্রত্যেক বস্তুতে নিজের অস্তিত্ব বিঘাতক বিরোধী শত্রুর আক্রমণ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবার যোগ্য অস্তিত্বরক্ষক কোন ধর্ম্ম বা শক্তি স্বভাবতঃই থাকে। ইহাই বস্তুর বস্তুত্ব। দৈন্যও আত্মসমর্পণের অস্তিত্বরক্ষক স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যে আত্মসমর্পণের গর্ভে দৈন্য নাই, তাহা বস্তুতঃ আত্মসমর্পণই নহে, উহা কাপট্য মাত্র; পক্ষান্তরে মৌখিক দৈন্যাত্মক বাক্য আছে, কিন্তু অন্তরে ভগবদ্বিশ্বাস নাই, **ইহাও কাপট্য।**

প্রশ্ন হইতে পারে,—দৈন্য না হয় ভগবানে আত্মসমর্পণের স্বাভাবিক ধর্ম্মই হইল, ভগবানের উদ্দেশ্যে এই দৈন্য প্রকাশ করাই ত উচিত, কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় সাধু সন্ন্যাসী বাবাজিরা সাধারণ লোকের নিকট অতিরিক্ত দৈন্য প্রকাশ করেন, ইহা কাপট্য নহে কি? **উত্তরে** বলা যাইতে পারে তাহা নহে। সাধারণ লোকের নিকট দৈন্য প্রকাশ করিলেই যে কাপট্য হইবে তাহা নহে। কাপট্য বা অকাপট্য মানসিক ব্যাপার। নিজের অন্তরে দাম্ভিকতা স্থায়ী ভাবেই আছে, কর্ত্তৃত্বাভিমান পূর্ণমাত্রায় আছে, অন্যান্য ব্যবহারে নিরন্তরই সেই দম্ভ অভিমান বেশ প্রকাশ পায়, অথচ সাময়িক কোন কার্য্যে নিজের অপটুতা বা অসামর্থ্য জানিয়া অপর ব্যক্তির দ্বারা নিজস্বার্থ সম্পন্ন করাইবার উদ্দেশ্যে বাক্যে এবং শরীরে চাটুকারিতার পরাকাষ্ঠা প্রকটন করিয়া কার্য্যোদ্ধারের পর 'বেশ ফাঁকি দিয়া কার্য্যোদ্ধার করিয়াছি' মনে করতঃ যাঁহারা আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেন এবং তাদৃশ দৈন্য ব্যবহারটিকে একটি ফাঁকি অর্থাৎ কার্য্যোদ্ধারের কৌশল বিশেষ জানিয়াই সাধারণের নিকট দৈন্য করেন, তাঁহাদিগকে আপনি কপটই বলুন অথবা হীন কাপুরুষ বা অকৃতজ্ঞই বলুন ইহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই। আমার কথিত দৈন্য ইহা হইতে স্বতন্ত্র। **প্রশ্ন** হইতে পারে,—সাধারণের নিকট অতিরিক্ত দৈন্যের ছড়াছড়ি মতলব সাধক ভিন্ন আর কি হইতে পারে? **উত্তরে** বলা যাইতে পারে,—না, এ ধারণাও ঠিক নহে, কারণ ভগবানে প্রকৃত আত্মসমর্পণকারী নিরহঙ্কার মহাপুরুষদিগেরও স্বভাবতঃ দৈন্যমূলক ব্যবহারই হয়, সুতরাং সাধারণ লোক সঙ্গে তাঁহাদিগের আদান প্রদান কথোপকথন ইত্যাদি ব্যবহারেও অস্মদাদির ক্ষুদ্র ধারণার অতীত প্রচুর দৈন্য ব্যবহার থাকে। এরূপ স্থলে অতিরিক্ত দৈন্যের ছড়াছড়ি কাপট্য বলিয়া মনে করিলে বিষম ভ্রমই হইবে এবং পরমার্থ সাধন পথে ক্ষতিগ্রস্তই হইতে হইবে। এখন শঙ্কা হইতে পারে ভগবানে আত্মসমর্পণকারী মহাপুরুষগণ অন্যের নিকট দৈন্য করিতে যান কেন। ইহাতে বক্তব্য এই যে ভগবানে সমর্পিতাত্মা মহাপুরুষগণেরও নিজের যথোচিত দেহযাত্রা নির্ব্বাহ এবং যথাযোগ্য লোক শাস্ত্র মর্য্যাদা রক্ষণ প্রভৃতি নির্ব্বাহের নিমিত্ত সাধারণ লোকের সঙ্গ হয় (শাস্ত্রে বলেন তাদৃশ মহাপুরুষগণ জীবের পরম কল্যাণ বিধানের জন্যই ভাগ্যবান্ লোকদিগের সহিত ব্যবহারাদি করেন), কিন্তু তাদৃশ

ব্যবহার স্থলেও তাঁহারা ভগবান্‌কে ছাড়িয়া ভুলিয়া কোনও ব্যবহার করেন না। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় দ্রব্যাদির মধ্যে সত্তা রূপে অন্তর্য্যামী রূপে সর্ব্বকর্ত্তা রূপে শ্রীভগবান্‌কে তাঁহারা অনুভব করেন। নিজেতেই হউক বা পরেতেই হউক, এক ভগবান্ ভিন্ন স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব কাহারও আছে ইহা তাঁহারা কখন ধারণাই করিতে পারেন না। **সর্ব্বত্র ভগবৎসত্তানুভূতি ভগবানে আত্মসমর্পণের স্বাভাবিক ফল।** সুতরাং তাদৃশ ব্যবহার কালেও সাধারণ লোকের মধ্যেও ভগবৎকর্ত্তৃত্ব, ভগবানেরই অন্তর্যামিত্ব, তাঁহাদের স্মরণ থাকে, ভুল হয় না। মহত্তম জ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বভূতে ভগবানের অধিষ্ঠান বোধে সকলকেই সম্মান ও সমাদর করেন, এমন কি প্রণামাদিও করেন। ইহা পরম ভাগবতের লক্ষণ। সাধারণ ব্যবহারাদি কার্য্যেও তাঁহাদের দৈন্য ব্যবহারটি সাধারণ লোকের নিকট প্রকট হইলেও অন্তর্যামিভগবদুদ্দেশ্যেই হয়, সুতরাং ভগবানের নিকটই তাঁহাদের দৈন্য করা হইয়া থাকে, ভগবানকে ছাড়িয়া বা ভুলিয়া অন্যের নিকট দৈন্য করা হয় না।

এই ভাগবতীয় দৈন্য যাঁহার হৃদয়ে আসন লাভ করিয়াছেন সাধারণ সর্ব্বভূতে তাঁহার ভগবদধিষ্ঠান জ্ঞান থাকায় তাহাদের সহিত সাধারণ ব্যবহারাদি কালেও তিনি ভগবৎপ্রেমামৃতই আস্বাদন করিয়া থাকেন।

দৈন্যের রূপ মধুময়, যার সঙ্গে দৈন্য মিশে সেও মধুময় হয়। অন্তঃকরণের যে কোনও সদ্ধর্ম্মের সঙ্গে এই দৈন্যের মিলন হইলে তাহাকে ইহা মধুময় করিয়াই তুলে। মনে করুন, আপনি সত্য কথা বলিলেন, সেই স্থলে যদি দৈন্য সহকারে সত্য কথাটি বলেন তাহা হইলে ঐ সত্য কথাটি মধুময় হইয়া উঠিবে। যদি কোন ব্যক্তির কিছু উপকার করেন বা কোনও দরিদ্র দুঃখীকে কিছু দান করেন, আর ঐ উপকার বা দান যদি দৈন্য সহকারে সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ উপকার বা দান করিয়াও যদি 'হায়, আমার কি আছে? আমি ক্ষুদ্র অসমর্থ, নিতান্ত অযোগ্য, আমি কি উপকার করিব? আমি কিই বা দান করিব?' ইত্যাদি দৈন্য ভাব আপনার মনে উদয় হইয়া বাহিরে বাক্যে বা আচরণের দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে ঐ উপকার বা দান কার্য্যটি মধুময় হইয়াই উঠিবে। যদি উপকার বা দান করিতে নাও পারেন তথাপি দৈন্যের দ্বারাই তাহার পূরণ হইবে। আপনি জপ তপ পূজাদি

যাহাই করুন, যদি তাহার সহিত দৈন্যের রূপখানি মিলাইতে পারেন, তাহা হইলে সকলেই মধুময় রূপ ধারণ করিবে আর সঙ্গে সঙ্গে মধুলুব্ধ মধুসূদনেরও উদ্দেশ পাওয়া যাইবে। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বতঃ মধুর হইতে শতশঃ মধুর শ্রীহরিনামের সাধনকেও আরও অধিকতর মধুময় করিয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে এই দৈন্যের মধুময় রূপখানি মিশাইয়া হরিনাম কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়াছেন।

ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে দৈন্য ব্যবহারটি কেবল বৈষ্ণবদিগেরই ধর্ম্ম, অন্য কাহারও নহে। বৈষ্ণব শাক্ত শৈব জ্ঞানী কর্ম্মী যোগী যে কোনও উপাসকই হউন না কেন, যদি সেই সেই উপাসনাতে উপাসকের হৃদয়ে দৈন্যের উদয় না হয় তাহা হইলে তাদৃশ রুক্ষ উপাসনায় চিত্তই শোধিত হয় না। ধর্ম্মই হউক, কর্ম্মই হউক, জ্ঞানই হউক, ভক্তিই হউক, চরিত্র স্বভাবাদি যাহা কিছুই হউক না কেন, একমাত্র দৈন্যই সকলকে মধুময় করিয়া তুলিতে পারে, নতুবা সকলেই রুক্ষ কর্কশ হইয়া থাকে।

এই দৈন্য পাপ নাশ করে, পুণ্য বর্দ্ধন করে। যদি পাপকর্ম্ম হইয়া থাকে, তবে অনুশোচনারূপ অগ্নিতে পাপকে দগ্ধ করিয়া দৈন্য বন্যার প্লাবনে হৃদয়কে ধৌত করিয়া শুদ্ধ করুন। দেখুন আপনি কোনও পাপ কর্ম্ম করিয়া যদি কেবল মাত্র সত্য কথাও বলেন যে 'আমি পাপ করিয়াছি', তাহা হইলেই যে আপনার পাপক্ষয় হইবে ইহা কোন শাস্ত্রে বা লোকব্যবহারে দেখা যায় না। কিন্তু অনুশোচনামূলক দৈন্য করিয়া বলুন, 'হায়, আমি বড় পাপিষ্ঠ, আমি বড় অধম, পাপকর্ম্ম করিয়াছি, আমার কি ক্ষমা হইবে?' তাহা হইলে আপনার পাপ ক্ষমা হইবে, ইহা শাস্ত্রে এবং লোকে প্রসিদ্ধ। আরও দেখুন আপনি ভূরি ভূরি দান পুণ্য পরোপকার করিয়া যদি বলেন 'আমি ভূরি ভূরি পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছি', তাহা হইলে কোনও লোক আপনার প্রতি প্রসন্ন হইবে কি? শাস্ত্রে আপনার পুণ্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিবে কি? বরং লোকে আপনাকে দাম্ভিক মনে করিয়া আপনার প্রতি বীতশ্রদ্ধই হইবে, এবং শাস্ত্রও আপনার পুণ্যবৃদ্ধির ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে পুণ্যক্ষয়েরই ব্যবস্থা করিবে। অথচ যদি সেই স্থলে নিজের অযোগ্যতা জ্ঞাপক দৈন্য করিয়া বলেন, 'আমি অযোগ্য, দীন ব্যক্তি, আমি কোনও পুণ্য কর্ম্ম করিতে পারি কি? এতাদৃশ

ভাগ্য আমার কোথায়?’ তাহা হইলে লোকেও আপনাকে ধন্য ধন্য করিবে, শাস্ত্রেও আপনার পুণ্য মহিমা কীর্ত্তন করিবে।

অনেকে ক্বচিৎ কোন মহাপুরুষের উপদেশের মর্ম্ম না বুঝিয়া মনে করেন এবং বলিয়াও থাকেন, ‘নিজেকে অত দীন হীন অধম দুরাচার ভাবিলে ক্রমশঃ অধম দুরাচার হইয়া পড়িতে হয়। নিজেকে অত অধম পাপী ভাবিবে না।’ এই স্থলে আমার মনে হয় মহাপুরুষদের উপদেশ বিশেষ বিশেষ স্থলে একটু বিশেষ করিয়া বুঝিয়া লইলে আর কোন ভ্রম হয় না। মহাপুরুষগণ অনেক সময় কোনও ব্যক্তি বিশেষের নিমিত্ত কোনও বিশেষ বিশেষ উপদেশ করিয়া থাকেন। সেই বিশেষ উপদেশের মর্ম্মার্থ অর্থাৎ অধিকারী এবং উদ্দেশ্য ভাল করিয়া না বুঝিয়া কেবলমাত্র পুস্তকে লিখিত দৃষ্টে অনেক স্থলে আচরণ করায় সুফল হয় না। যদি কোনও মহাত্মা ঐ প্রকার উপদেশ দেন তাহা হইলে সেই মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে উক্ত উপদেশ যাহাকে দেওয়া হইল উহা ব্যক্তিগত তাহারই আচরণীয় বা সর্ব্বসাধারণের আচরণীয়, ঐ উপদেশ কি সর্ব্বদাই প্রতিপালনীয় অথবা সাময়িক কিয়ৎকালের জন্য? ইত্যাদি বিষয়গুলি ভাল করিয়া অবগত হইয়া মহাত্মাদিগের উপদেশ প্রচার করিলেই ভাল হয়। যদি কোন মহাত্মা ঐরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, “নিজেকে দীন হীন অধম দুরাচার ভাবিয়া নিজ আচরিত অধম কর্ম্ম এবং দুরাচার স্বভাব হইতে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা না করিয়া অধম চরিত্রেই অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে যাহারা তাহাদিগের তাদৃশ বিমর্ষভাবকে অর্থাৎ সৎকর্ম্মাদিশিথিলীভূত অন্তঃকরণের অবসাদ ভাবকে দূরীভূত করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর করাইবার জন্য উৎসাহবর্দ্ধক উপদেশই দিয়াছেন।” তাই বলিয়া সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বদা ইহা প্রতিপালনীয় নহে। অন্যথা সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বাবস্থায় উক্ত উপদেশ গুরুতর শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং মহাপুরুষদিগের স্বভাববিরুদ্ধ হইয়া পড়ে।

প্রশ্ন হইতে পারে,—ইহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কি প্রকারে? উত্তরে বলি,—দেখুন, আমি যদি কোনও গর্হিত কর্ম্ম করি, (আমি কেন, যদি কেন, জগতের সাধারণ লোকও প্রায় কোন একটি কেন, দৈনন্দিন শত শত গর্হিত কর্ম্ম করিতেছে), আমি কি আমাকে গর্হিতকর্ম্মা বলিয়া মনে করি? আমরা

কয়জন কতবার আমাদিগকে গর্হিতকর্ম্মা অধম দুরাচার বলিয়া মনে করি ? বোধ হয় ভ্রমবশতঃ দৈবাৎও কেহই মনে করি না। সেই আমার গর্ব্বিত বুকের পাটা লইয়া, সেই হাসিখুসি, সেই পরিষ্কার ফিট্‌ফাট্ বেশের পরিপাটি, সেই পানভোজন হাসি তামাসা খেলা ধূলা রঙ্গ কৌতুকাদি লইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিরন্তর অতিবাহিত করিতেছি! নিজেকে অত অধম ত দূরের কথা, একটু অধমত্বের গন্ধ লাগিয়াছে বলিয়াও ভাবিবার সময় এ জীবনে একবারও হইয়াছে কি ? জগতের সাধারণ লোকের হয় কি ? কে কত নিজেকে অধম দুরাচার দীন মনে করিতেছে ? সত্যই যদি আমি নিজের গর্হিত কর্ম্ম সকলকে স্মরণ করিয়া নিজেকে অধম দুষ্কর্ম্মা মনে ভাবিয়া গর্ব্ব পর্ব্বত হইতে নীচে নামিয়া আসিতাম তাহা হইলে সৎমহাপুরুষের করুণায় আমার দুষ্কর্ম্মাদি থাকিত না। দুষ্ট আচরণ করিয়াও নিজেকে দুরাচার না ভাবাই উচিত ইহাই যদি সাধু মহাত্মাদের **সদুপদেশ** হয় তাহা হইলে আমার মনে হয় সাধু মহাপুরুষেরা নিজের সাধন ভজন ছাড়িয়া বৃথা উপদেশে সময় নষ্ট করিতেছেন। কারণ সাধুমহাপুরুষদিগের ঐরূপ উপদেশ বাণী না শুনিয়াও **ভগবন্মায়ার উপদেশ আমাদের হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত আছে—'দুষ্টাচরণ করিয়াও নিজেকে দুরাচার মনে না করা।'** বরং এ বিষয়ে মহামায়ার উপদেশ বড়ই **শক্তিসম্পন্ন।** আরও দেখুন, পাপকর্ম্ম করিয়া নিজেকে পাপী মনে করিয়া হৃদয়ে যদি অনুতাপ উপস্থিত না হয়, নিজের ঔদ্ধত্যপরিহারসূচক দৈন্যের আবির্ভাব না হয়, তাহা হইলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না, প্রত্যুত পাপপ্রবৃত্তি ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহা গুরুতর শাস্ত্রবিরুদ্ধ। বিষভক্ষণ করিয়াও বিষভক্ষণ করি নাই ভাবিয়া আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ছড়াছড়ি যথাতথা করিতে গেলে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল লাভের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকাই বাঞ্ছনীয়। বিশেষভাবে বিচার করিলে দেখা যায় আমাদের আর্য্যধর্ম্মের কথা দূরে থাক, এমন কোনও ধর্ম্মমার্গ দেখা যায় না যাহাতে নিজকৃত পাপ স্বীকার করিয়া দৈন্যবিজ্ঞপ্তি করিতে হয় না। শ্রীভগবৎসমীপে আর্য্যদিগকে নিত্যই বলিতে হয়, "পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ। ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো হরিঃ।" এখন দেখুন যদি নিজেকে পাপী ভাবিলেই পাপী হইয়া পড়িতে হয় তাহা হইলে

নিত্য ভগবৎসমীপে কাতর প্রাণে যে সমস্ত আর্য্য সন্তান প্রত্যহ নিজেকে পাপী স্বীকার করিয়া দৈন্য প্রকাশ করিতেছেন তাঁহারা ত অধিকতর পাপীই হইয়া পড়িবেন। বস্তুতঃ ঐরূপ সিদ্ধান্ত সাধু এবং শাস্ত্র বিরুদ্ধ। **দৈন্য দ্বারা অনুতাপই পাপকর্ম্মের প্রধান প্রায়শ্চিত্ত। দৈন্যের এতাদৃশ মধুরতার মহিমায় আকৃষ্ট সজ্জনেরা দৈন্যকেই সাধুর ভূষণ মনে করেন।**

জীবনে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে দম্ভ অহঙ্কার প্রভৃতি এবং মান যশ প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করিতে হয়। পরমার্থ লাভ করিতে হইলে দেহ দৈহিকে 'অহং মম' বুদ্ধিও পরিত্যাগ করিতে হয়। বিচার করিলে দেখা যায় আমরা অনাত্ম বস্তুকে আত্মা বলি, আর যাহা আমার নয় তাহাকেই আমার বলিয়া অভিমান করি। জগতের সমস্ত কার্য্যই প্রকৃতির গুণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয় —"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।" সুতরাং আমার দম্ভ অহঙ্কারের স্থান কোথায়? বস্তুতত্ত্বের জ্ঞান হইলে নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমান আপনিই অপসারিত হয়। কাল কর্ম্ম অদৃষ্টাদির বিষয় যদি অবগত হওয়া যায় তাহা হইলে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে অসমর্থ বলিয়া বোধ হইবেই; তখন ভগবচ্চরণে স্বভাবতঃই প্রপন্নতা আসে, দৈন্য তখন নিজের মধুময় রূপ প্রকাশ করে। যাহা সত্য তাহার অববোধে, তাহার প্রকাশে, জীবের অধোগতি হইতে পারে কি? কখনই না। আমাদের কামকলুষিত চিত্তে **দৈন্যের মহিমা** প্রকাশ পায় না; আমরা দৈন্যকে সাধারণতঃ দুর্ব্বলতা বা হীনতা বলিয়াই বুঝি, ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে।

"সৎসঙ্গাৎ জায়তে শ্রদ্ধা"

সৎসঙ্গঃ

পরম স্নেহাস্পদ—

শ্রীমান্ সত্যরঞ্জন বিশ্বাস, এম্ এ,

গাংনী, নদীয়া।

মদীয় **শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে** অর্পিত **কুসুমাঞ্জলির** এই **নির্ম্মাল্য** আমার স্নেহাশিস্ রূপে আপনাকে প্রদান করিলাম। ইহা আপনাকে **শ্রীগুরুবিষ্ণু-করুণার** পথে পরিচালিত করুক।

শ্রীভাগবতস্বামী।

সৎমহাপুরুষের সঙ্গে মনুষ্যের নব জীবন লাভ হয়। সৎসঙ্গের প্রভাবে জীবন প্রবাহ অভিনবতার মধ্য দিয়া প্রকৃত সার্থকতার দিকে ছুটিতে থাকে। সত্য দয়া বিনয় ক্ষমাদি সদ্‌গুণমণ্ডিত ভগবদ্বিশ্বাসী সাধু পুরুষের সঙ্গলাভ জগতে সুদুর্ল্লভ মহারত্ন। এই প্রকার সাধু মহাপুরুষ সত্যই **স্পর্শমণি**। ইঁহাদের স্পর্শে মানুষ **"সুবর্ণ ই"** হয়। মনুষ্যহৃদয়ের অশেষ মলিমস্‌কে নিঃশেষে ক্ষয় করিয়া হৃদয়খানিকে সুবর্ণোজ্জ্বল করিতে এমন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পদার্থ জগতে আর দ্বিতীয় নাই।

সৎসঙ্গ মনুষ্যহৃদয়ের যেমন সংস্কারাধায়ক, তেমনই সংস্কার-প্রতিষেধক, অর্থাৎ মনুষ্যহৃদয়ের কুসংস্কার সমূহকে ফিরাইয়া নূতন সংস্কারকে প্রবর্ত্তিত করিতে **সৎসঙ্গের তুল্য সমর্থ আর কেহই নহে।**

সৎসঙ্গ কাহাকে বলে? যে প্রকার ব্যবহার করিলে সৎ মহাপুরুষের সদ্‌গুণরাজি নিজের হৃদয়ে স্থান পায়, সতের আচরিত সৎকার্য্যাদির প্রতি যাহাতে চিত্ত অনুরক্ত হয়, তাদৃশভাবে সদ্‌ব্যক্তির সহ যে সঙ্গ তাহার নামই সৎসঙ্গ। **সৎপুরুষে কায়িক বাচিক মানসিক অভিনিবিষ্টতাই প্রকৃত সৎসঙ্গ।** অর্থাৎ সাধু ব্যক্তিরা যে সকল সদাচরণ করেন এবং যে সকল সদুপদেশ দান করেন সেই সকল নিজে শ্রদ্ধা সহকারে শরীরের দ্বারা আচরণ করা এবং শরীরের দ্বারা সাধু ব্যক্তির যথাসাধ্য পরিচর্য্যাদির দ্বারা আনুকূল্য করা **কায়িক অভিনিবিষ্টতা।** ঐ প্রকার বাক্যের দ্বারাও সাধুপুরুষের উপদেশ সমূহ প্রচার করা এবং সাধুর মহিমা গুণ গান করাই **বাচিক অভিনিবিষ্টতা** এবং মনের দ্বারা সদুপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস রাখা এবং সাধুপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি মনে পোষণ করাই **মানসিক অভিনিবিষ্টতা।**

যদি মাত্র সৎপুরুষের সদাচরণ শিক্ষা করিয়া নিজে আচরণ করিলাম, কিন্তু সেই সাধু মহাপুরুষের পরিচর্য্যাদি আনুকূল্যে অগ্রসর হইলাম না, তাহা হইলে বাহিরে সাধারণ লোকে আমার ভাল আচরণ দেখিয়া আমাকে 'সাধু সাধু' বলিল বটে, কিন্তু আমার নিজের দৃষ্টিতে আমি অকৃতজ্ঞই হইলাম। সাধু মহাপুরুষের নিকট হইতে সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া অপরের নিকট বক্তৃতা করিয়া 'জ্ঞানী' 'পণ্ডিতজী' আখ্যা পাইলাম বটে, কিন্তু সেই মহাপুরুষের মহিমা কীর্ত্তন করিলাম না, ইহাতে অকৃতজ্ঞতার বোঝাই মাথায় করিলাম। সদুপদেশ মনে মনে আওড়াইয়া খুব জানি বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করি বটে, কিন্তু সাধুপুরুষে বিশ্বাস ভক্তি নাই, অকৃতজ্ঞতার পূতি-দুর্গন্ধে পূর্ণ হৃদয়খানিকে দেখিয়া **অন্তরাত্মা** শিহরিয়া উঠিলেন। এই প্রকার কাপট্যময় সৎসঙ্গ প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যহৃদয়কে উন্নত করিতে অক্ষম।

কায়িক বাচিক মানসিক সতের অনুগত হওয়াই সৎসঙ্গ। কেবলমাত্র সদ্‌গুণসম্পন্ন সাধু ব্যক্তির সঙ্গে বসা উঠা বা সাধারণ আলাপ ব্যবহার করিলেই সৎসঙ্গ হয় না। **সদনুবর্ত্তী হইয়া সদাজ্ঞা সদুপদেশ পালন করিতে হয়।** যদি কোন ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি কোন চিকিৎসকের বাড়ী গিয়া কেবলমাত্র তাঁহার আহার বিহার, জমি জমা, আয় ব্যয় ইত্যাদি আলোচনা

করিয়া নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন তাহা হইলে তিনি কি রোগমুক্ত হইবেন? বা যদি কেবল কোন চিকিৎসকের চরণতলে পড়িয়া 'আমাকে রোগমুক্ত করুন, রোগমুক্ত করুন' বলিয়া কাকুতি মাত্রই করেন, কিন্তু চিকিৎসকের ব্যবস্থাপিত ঔষধপথ্যাদি ব্যবহার করেন না, তাহা হইলে তিনি কি রোগমুক্ত হইবেন? সুচিকিৎসকের ব্যবস্থাপিত ঔষধ পথ্যাদিতে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া যথাযথভাবে ঔষধাদি সেবন করিলে যেরূপ রোগমুক্ত হওয়া যায় সেইরূপ সৎপুরুষের প্রতি সশ্রদ্ধ হইয়া সদুপদেশ প্রতিপালন করিলে হৃদয়রোগ হইতেও মুক্তিলাভ করা যায়। সংযমী সত্যপরায়ণ দয়াবান্ ক্ষমাশীল পরোপকারী সৎপুরুষের সঙ্গের প্রভাবে ঐ সমস্ত গুণের অধিকারী হওয়া যায়। **সদন্তঃকরণ ব্যক্তি যাঁহারা তাঁহারা বড় দয়ালু।** তাঁহারা নিজে যেমন সাধু, তেমনই অপরকে সাধু করিতে অশেষ বিশেষে চেষ্টা করেন। **"সাধ্নোতি সাধয়তি"** ইতি সাধু। সৎ হইবার জন্য যিনি স্বয়ং সাধন করেন, অপরকে সৎ করাইবার নিমিত্ত যিনি সাধন করান তিনিই **সাধু।** সত্যই আমাদের অনাদি কুসংস্কার নিমিত্ত হৃদয়ের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন অনেক সময়ে সাধূপদিষ্ট সদাচরণ করিতে উৎসাহের শিথিলতা আসিলে তখন দয়ার্দ্রচিত্ত সাধুপুরুষগণই আশীর্ব্বচনাদি দ্বারা, এমন কি আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত ভগবানের শ্রীচরণে প্রার্থনাদি দ্বারা এবং নিজদিগের অলৌকিক কৃপাশক্তি সঞ্চারণ দ্বারা আমাদিগকে সুযোগ্য করিয়া সদাচরণে প্রবর্ত্তিত করেন।

কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে সৎ মহাপুরুষ আমাদিগকে করুণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেও অনেক সময়ে আমরা তাহা উপেক্ষা করিয়া থাকি। আমাদের সাধারণ বিনয়াদির আবরণের মধ্যে এমন দম্ভ অহঙ্কার প্রচ্ছন্ন থাকে যাহা সুযোগ আসিলেও আমাদিগকে মহতের করুণা হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকে। অনেক সময় এমন হয় যে মহতের করুণা আমাদের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে, দেখিতে থাকে যদি কোনও দ্বারে হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যে **আমরা দম্ভ অহঙ্কার জনিত উপেক্ষার অর্গলে তাহার সর্ব্ববিধ প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখি।** ইহা বুঝি না যে জীবনে একবার সুযোগ পাওয়াই দুর্লভ, পুনরায় সুযোগ নাও আসিতে পারে,—আসিলেও যদি সুযোগ গ্রহণ করিতেও পারি তাহা হইলেও পূর্ব্বের ব্যর্থ জীবনের জন্য অনুতাপই

করিতে হইবে। বড়ই দুঃখের বিষয় মহৎ কল্পবৃক্ষ লাভ করিয়াও সত্য দয়া ক্ষমা অহিংসা ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণ শিক্ষা করিতে আমরা চেষ্টা করি না। এই সদ্‌গুণ মহাধনে যাহারা বঞ্চিত তাহারাই জগতে প্রকৃত বঞ্চিত। মহতের সঙ্গ পাইলেই, তাহা যতই ক্ষুদ্র সময়ের জন্য হউক, যাহাতে আমরা কৃতার্থ হইতে পারি তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিলে জীবন ধন্য হইতে পারে।

আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ সাধনপথে নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয়। সাধু পুরুষদিগের নিকটে থাকিলে অনেক সময় কামক্রোধাদিজনিত চিত্তবিকৃতি নিষ্ঠুরতা ঔদ্ধত্য অসহিষ্ণুতা পরদ্রোহ প্রভৃতি মানসিক দুষ্টভাব সকল মনে উদয় হইলেও সাধুপুরুষের সঙ্গ প্রভাবে ইহারা আর বাহিরে ব্যক্ত হইয়া আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারে না। যেমন প্রবলশক্তিসম্পন্ন রাজ-দূতাদির সঙ্গে বিচরণ করিলে চোর বাট্‌পারের আর আশঙ্কা থাকে না তদ্রূপ সৎমহাপুরুষের সঙ্গে জীবন পথেও আশঙ্কা থাকে না।

সৎমহাপুরুষের আশীর্ব্বচন ও শুভাকাঙ্ক্ষা ভগবান্ কখনও বিফল করেন না। এই সম্বন্ধে আমার নিজের জ্ঞাত একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। পাবনা জেলার তাড়াশের জমিদার শ্রীবৃন্দাবনবাসী সুপ্রসিদ্ধ ভক্তপ্রবর রাজর্ষি ৺বনমালী রায় বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺অন্নদাচরণ রায় মহাশয় নিজের জমিদারী প্রভৃতি প্রচুর সম্পত্তি শ্রীরাধাকুণ্ডস্থিত শ্রীমদনগোপাল শ্রীবিগ্রহের সেবায় সমর্পণ পূর্ব্বক বৈরাগ্যবেশ অবলম্বন করতঃ মাধুকরী ভিক্ষা-লব্ধ অন্নে জীবন ধারণ করিয়া নিরন্তর শ্রীগৌরগোবিন্দপাদপদ্ম উপাসনায় শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। ইঁহার বৈরাগ্যাশ্রমের নাম গিরিধারী দাস বাবাজী। ইঁহার তীব্র বৈরাগ্য, মধুর বিনয় নম্রতা, শ্রীভগবদ্‌ভজন নিপুণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে বিমুগ্ধ হইয়া শ্রীব্রজমণ্ডলবাসী বৈষ্ণববৃন্দ ইঁহাকে মহাত্মা বলিয়াই সম্বোধন করিতেন। বস্তুতঃ মহাত্মা শব্দের সার্থকতা ইঁহাতে উপলব্ধি হইত। ইঁহার ভজনশিক্ষা এবং বৈরাগ্যমার্গাবলম্বের গুরু ছিলেন ব্রজমণ্ডল-প্রসিদ্ধ গৌর শিরোমণি মহাশয়। শিরোমণি মহাশয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত মহাত্মা গিরিধারী দাস উপযুক্ত শিষ্যই ছিলেন। আত্মশোধন লালসায় উক্ত মহাত্মার একটি অপূর্ব্ব চরিত এখানে বর্ণিত হইতেছে। এক সময়ে রাধাকুণ্ড-

তীরে উক্ত মহাত্মা বাস করিতেন ; সেই সময় কৃষ্ণদাস নামক কোন মহানুভব বৈষ্ণবের সহিত তাঁহার গাঢ় সখ্য হয়, তাহার কারণ গিরিধারী দাস উক্ত কৃষ্ণদাসের সহিত ভগবৎকথা আস্বাদনে অতিশয় তৃপ্তি লাভ করিতেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হওয়ার পর একদিন হঠাৎ কৃষ্ণদাস গিরিধারী দাসকে বলিলেন, "গিরিধারী দাসজি, আমার প্রতি শ্রীরাধারাণীর অকৃপা, আমি বড় হতভাগ্য, আমাকে রাধারাণী তাঁহার ধাম হইতে তাড়াইয়া দিতেছেন, আমাকে শীঘ্রই বঙ্গদেশে যাইতে হইতেছে, আগামী কল্যই আমি বঙ্গদেশে যাইব। অনেকদিন হইতে বঙ্গদেশে যাইবার জন্য মন চঞ্চল হইয়াছে।" গিরিধারী দাস এই কথা শুনিবা মাত্রই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন ; তাঁহার এই প্রকার রোদন দেখিয়া কৃষ্ণদাস বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া পরে অনেক চেষ্টায় গিরিধারী দাসের রোদন থামাইলেন এবং রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে পুনরায় রোদন করিতে করিতে গিরিধারী দাস বলিলেন, "হায়, আমি মহা অপরাধী, মহা নারকী, বিষয়বিষ্ঠার কীট ; হায়, আমি কি সর্ব্বনাশ করিলাম, আমি নিবৃত্ত ভজননিরত বৈষ্ণবের ভজনের ভয়ঙ্কর বিঘ্ন উৎপাদন করিলাম ! হায়, অনন্ত নরক দণ্ডেও আমার এ অপরাধের নিষ্কৃতি নাই। হা শ্রীমহাপ্রভো, হা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, তুমি রক্ষা কর।" তাঁহার এই প্রকার করুণোক্তি শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণদাস অতিশয় দুঃখিত মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন আপনি এ প্রকার কাতরতা প্রকাশ করিতেছেন ? কোন্ বৈষ্ণবের ভজনবিঘ্ন উৎপাদন করিলেন ? আপনি সুস্থ হউন।" তখন গিরিধারী দাস বলিলেন, "মহারাজ, আমি হতভাগ্যই আপনার এই ভজনবিঘ্নের কারণ। মহাপাপিষ্ঠ বিষয়বিষ্ঠার কীট আমি, আপনি ভজনৈকরত বৈষ্ণব। আমা হেন অধম বিষয়ীর সঙ্গ জনিত কলুষতাই আপনার ভজনবিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে। আপনার বঙ্গদেশে যাওয়ার বাসনা মহা অপরাধী আমার সঙ্গদোষেই হইয়াছে। হায়, আমি কি সর্ব্বনাশ করিলাম ! আমার উপায় কি ?" তখন কৃষ্ণদাসও রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "গিরিধারী দাসজি, আপনার ন্যায় মহানুভব বৈষ্ণবের সঙ্গ ছাড়াইয়া, শ্রীব্রজধাম ছাড়াইয়া, শ্রীরাধারাণী অপরাধী আমাকে দণ্ড দিতেছেন। আমি শ্রীরাধারাণীর চরণে মহা অপরাধী, তাই এই দণ্ড।"

তখন গিরিধারী দাস বলিলেন, "আপনি কি সত্যই আগামী দিনই বঙ্গদেশে রওনা হইবেন?" উত্তরে কৃষ্ণদাস বলিলেন, "হাঁ, মন অতি চঞ্চল হইয়াছে, আগামী দিনই যাইব।" গিরিধারী দাস বলিলেন, "যদি নিশ্চয়ই আপনার বঙ্গদেশে যাওয়াই হয়, তাহা হইলে আমার একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা নিবেদন করি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আর তিনটি দিন শ্রীকুণ্ডে অবস্থান করিয়া বঙ্গদেশে যাইতে হয় যাইবেন।" তাঁহার প্রার্থনায় কৃষ্ণদাস স্বীকৃত হইলেন। তাহার পর গিরিধারী দাস নিজ ভজনকুটীরে আসিয়া অন্নজল ত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীহরিনাম গ্রহণ করতঃ শ্রীরাধারাণীর চরণে প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন যাহাতে কৃষ্ণদাসের বঙ্গদেশে যাওয়ার মতি পরিবর্ত্তিত হয়। নিজের সুদীর্ঘ ভজন নিয়ম সমাপন করিয়া অতিরিক্ত ২৫০০০ সংখ্যা নাম গ্রহণ, ১০৮ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম, ও চারি বার শ্রীরাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড পরিক্রমার নিয়ম গ্রহণ করিয়া উপবাস করিতে লাগিলেন। এদিকে কৃষ্ণদাসও নিজ কুটীরে ভজন সময়ে প্রায়ই গিরিধারী দাসের নাম গুণ স্মরণ করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদাসের মনে হইতে লাগিল,—"অহো, গিরিধারী দাস কি মহান্! আমি হতভাগ্য এমন মহৎসঙ্গ, এই পরমশ্রেষ্ঠ কুণ্ডতীর পরিত্যাগ করিয়া কোথায় বহির্মুখতায় পরিপূর্ণ দেশে যাইতেছি! ধিক্ আমাকে, শ্রীরাধারাণী আমার মঙ্গল করুণ।" ইহার পর হঠাৎ তৃতীয় দিবস রাত্রিতে কৃষ্ণদাস নিজ ভজনকুটীরে ভজন করিতেছেন, ধ্যানাবেশে একটু তন্দ্রার মত আসিয়াছে, এমন সময় দেখিলেন যেন তাঁহার দীক্ষাগুরুদেব গিরিধারী দাসের হাত ধরিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "কৃষ্ণদাস, এই মহাত্মা গিরিধারী দাস তোমার জন্য আজ তিনদিন উপবাস করিয়া শ্রীরাধারাণীর চরণে প্রার্থনা করিতেছেন, তুমি শ্রীকুণ্ড পরিত্যাগ করিয়া যাইও না।" এই প্রকার আদেশ করিয়াই ঐ শ্রীগুরুমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলেন, কৃষ্ণদাসের তন্দ্রাভঙ্গ হইল, তিনি তখন মনে করিলেন, "আজ তিন দিন গিরিধারী দাসের সঙ্গে দেখাই হয় নাই, তাঁহাকে মাধুকরী ভিক্ষার পথেও তিন দিন দেখিতে পাই নাই, বোধ হয় নিশ্চয়ই এই অধমের মঙ্গলের জন্য তিনি উপবাস করিয়া আছেন।" কৃষ্ণদাস আর নিজের ভজনকুটীরে থাকিতে পারিলেন না, ব্যাকুল হৃদয়ে পাগলের মত গিরিধারী দাসের কুটীরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তখন গভীর রাত্রি; গিরিধারী দাসের কুটীরের সন্নিকটে

যাইয়া অস্ফুট রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলেন; গিরিধারীদাস তুলসীতলায় ভূলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতেছেন আর বলিতেছেন, "হে বৃন্দা দেবি, কৃষ্ণদাস যেন তোমার ধাম পরিত্যাগ করে না, তাহার ভজনবিঘ্ন যেন না হয়; হে কুঞ্জেশ্বরি হে দয়াময়ি, দয়া করিয়া কৃষ্ণদাসের মতি পরিবর্ত্তন কর।" কৃষ্ণদাস ইহা শুনিয়াই অতিশয় অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন; তিনি তখন ছুটিয়া যাইয়া গিরিধারী দাসের চরণের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন দুই মহাত্মার প্রেমক্রন্দনে শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে শ্রীশ্রীযুগলকিশোরও বোধহয় ভক্ত বাৎসল্যে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। তারপর কৃষ্ণদাসের আর বঙ্গদেশে যাওয়া হইল না। দুই বন্ধুতে শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে শ্রীরাধামদনগোপালের ভজনানন্দে দীর্ঘকাল যাপন করিয়াছিলেন।

ধন্য ধন্য মহদ্বৈষ্ণবচরিত, ধন্য শ্রীরাধাগোবিন্দের নিজ জনে করুণা।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

"শ্রদ্ধা বিশ্বাস উচ্যতে"

শ্রদ্ধা

পরম স্নেহাস্পদ—

শ্রীযুক্ত শৈলজাচরণ সেনগুপ্ত, এ এম্ ই ই,

লেক্‌চারার, কলেজ অব্ ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড্

টেক্‌নোলজি, বেঙ্গল, যাদবপুর।

মদীয় **শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে** অর্পিত **কুসুমাঞ্জলির** এই **নির্ম্মাল্য** আমার স্নেহাশিস্ রূপে আপনাকে প্রদান করিলাম। ইহা আপনাকে পরম শান্তিময় জীবন দান করুক।

শ্রীভাগবতস্বামী।

শ্রদ্ধা বলিতে বিশ্বাসকে বুঝায়। এই বিশ্বাস বলিতে যথাতথা যত্রতত্র বিশ্বাস নহে। **"গুরুশাস্ত্র বাক্যেষু বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা।"** যাঁহার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করা যাইবে, তাঁহার উপর—তাঁহার উপদেশের উপর—যদি বিশ্বাস না রাখা যায়, তাহা হইলে শিক্ষাই অসম্ভব। আর শ্রদ্ধা রহিত হইয়া কোন শিক্ষকের নিকট হইতে কোন প্রকার অর্থকরী বিদ্যা যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা করিলেও উহাতে একপ্রকার শঠতা (জুয়াচুরি) এবং অকৃতজ্ঞতাই শিক্ষা করা হয়। এই প্রকার শঠতাপূর্ণ বিদ্যোপার্জ্জনে অর্থাদি লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু **চিত্তের প্রসন্নতা লাভ হয় না।** অকৃতজ্ঞ চিত্তের সুখ নাই।

শাস্ত্রাদিতে বলা হয়, **"আদৌ শ্রদ্ধা"**, অর্থাৎ সৎ মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ হইলে "শ্রদ্ধার" উদয় হয়। এই শ্রদ্ধার উদয় হইলে মনে এমন একটি ভাব

আইসে যে সাধু গুরু শাস্ত্র উপদেশে যাহা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, সন্দিগ্ধমনে তাহার উপর আর তর্কবিতর্কাদির দ্বারা "প্রমাত্ব" স্থাপনে প্রবৃত্তি থাকে না। ইহাতে এমন বুঝিতে হইবে না যে তর্কবিতর্ক সব সময়েই দোষাবহ। অনুকূল-ভাবে রহস্য অবগত হওয়ার জন্য যে তর্ক করা যায় তাহা দোষাবহ নহে, তাহাকে অশ্রদ্ধা বলা যায় না। শ্রদ্ধাতে বস্তুবিষয়ক ঔদাসীন্য থাকে না, অর্থাৎ যে বস্তু বিষয়ে হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদয় হয় সেই বস্তুতে মন আর উদাসীন থাকিতে পারে না। সত্য দয়া ক্ষমা পরোপকারাদি সদ্ধর্ম্মে আমাদের উদাসীন-তার কারণ কি? কারণ শ্রদ্ধার অভাব। শ্রদ্ধা জন্মে কিসে? **শ্রদ্ধা জন্মে সজ্জনের সঙ্গপ্রভাবে।**

আমি এক সময়ে শ্রীহরিদ্বারে ৺শ্রীমদ্ ভোলানন্দ গিরি স্বামীজি মহারাজের সমীপে নিবেদন করিয়াছিলাম, "মহারাজ, শ্রদ্ধা বিশ্বাস ক্যায়সা হোতা হ্যায়?" স্বামীজি মহারাজ ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন, "আপ্ লোকন্‌কো কৃপাসেই শ্রদ্ধা বিশ্বাস আতা হ্যায়। শ্রদ্ধা দেনে বালেতো আপ্ সব্ মহাত্মাই হ্যায়।" আমি নত মস্তকে তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম এবং কিছু কাতরতা প্রকাশ করায় স্বামীজি 'আপ্' শব্দ প্রয়োগ করা ছাড়িয়া সদয়াবলোকনে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "মহাত্মাকা চরণরজঃ লেইকে মন্‌কো পর রগ্‌ড়া করোও তো শ্রদ্ধা উৎপন্ন হোগা।" আমি প্রশ্ন করিলাম, "মন্‌কো পর রগ্‌ড়ানা ক্যায়সা?" তিনি খুব হাসিয়া বলিলেন, "শরীরকো পর তো সব্ কই রগ্‌ড়াতে হ্যায়, মন্‌কো পর রগ্‌ড়ানা চাইয়ে।" আমি তখন "বিনা মহৎপাদরজোঽভি-ষেকম্" এইটুকু উচ্চারণ করিলাম।* শ্রীমৎ স্বামীজি প্রশ্ন করিলেন, "এ কাঁহাকো বাক্য?" আমি উত্তরে বলিলাম, "শ্রীমদ্ভাগবতে জড়ভরতের উক্তি।" শ্রীমৎ স্বামীজি আমাকে শ্লোকটি সম্পূর্ণ আবৃত্তি এবং তাহার ব্যাখ্যা করিতে আদেশ করিলেন। আমি করজোড়ে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিলাম। তিনি বলিলেন, "এহি তো মন্‌কো পর রগ্‌ড়ানা হ্যায়।" আমি তখন "মহৎকৃপা বিনা কোন কার্য্যসিদ্ধি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয়॥" এই পয়ার উচ্চারণ করিলাম। শ্রীমৎ স্বামীজি মহারাজ খুব আনন্দিত হইয়া

---

* রহূগণৈতত্তপসা না যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্গৃহাদ্বা।
নচ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥ শ্রীমদ্ভাগবত।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মকৃপায় অনেক দেখিয়াছি, অনেক শুনিয়াছি, অনেক পড়িয়াছি, নিজের দূরদৃষ্টবশতঃ বহু ভোগিয়াছিও। মনে হয়, অতি ক্ষীণ ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখের লালসার সঙ্কীর্ণতা যাহার চিত্তে যত বেশী, বিশ্বাসও তাহার হৃদয়ে তত কম।

হায়, স্ত্রীর দৌরাত্ম্যে, পুত্রভৃত্যের অকৃতজ্ঞতায়, সখা বান্ধবাদির বিশ্বাস-ঘাতকতায় অহর্নিশ শতসহস্ররূপে পরিপীড়িত হইয়াও আমরা পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের প্রতি কথঞ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করি বা করিতে অশেষ চেষ্টা করিয়া থাকি, কিন্তু সৎ মহাপুরুষে, শ্রীগুরুপাদপদ্মে, শ্রীভগবানে একটু বিশ্বাসও আনিতে পারি না, বা একটু বিশ্বাস আনিবার জন্য অল্প পরিমাণে চেষ্টাও করি না। মুহুর্মুহুঃ স্ত্রীর শত সহস্র অমনোনীত ব্যবহারে দৌরাত্ম্যে জর্জ্জরিতমনা হইয়াও স্ত্রীভক্তি স্ত্রীবিশ্বাস আমাদের বেশ অটল থাকে, ক্বচিৎ কোথাও কোন স্ত্রীবিশেষের প্রতি অবিশ্বাস হইলেও নূতন স্ত্রী সংগ্রহের জন্য লালায়িত হই; বড় বড় শিক্ষিত পুত্রের, খুব চটক্‌দার ভৃত্যের, রাশি রাশি অকৃতজ্ঞতা হলাহল নিরন্তর পান করিয়াও পুত্রোৎপাদনে বা তাহাদের লালনপালনে ভক্তির বন্ধন একবিন্দুও শিথিল হয় না; বড় পদগৌরবগর্ব্বিত বাহবাদার বন্ধুবান্ধবের গুপ্ত শাঠ্যছুরিকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও খোসামোদে তোষামোদে অনুরক্ত হইয়া বিশ্বাসই রাখিতে চেষ্টা করি। কিন্তু দৈবাৎ কোন সাধুবেশধারী বা গুরুনামধারী কোন স্থলে একদিন বা একবার কিছু দুষ্কার্য্য করিয়াছেন শুনিবা মাত্রই যাবতীয় সৎ মহাপুরুষবেশধারীর উপরেই, সমস্ত শ্রীগুরুকুলের উপরেই বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ি। সাধুসঙ্গ করিতে বা শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিয়া দীক্ষাদি লাভ করিতে অবিশ্বাসস্তূপ দিয়া চিত্তকে আবরণ করি, কুতর্ককর্কশপ্রাচীরে আমাদের ঘৃণ্য ইন্দ্রিয়সুখলালসা, দেহারামপিপাসা এবং যশোলিপ্সাদি প্রবণ চিত্তকে সুরক্ষিত করিতে চেষ্টা করি। ইহার কারণ কি?

কদর্য্যকামাদিকলুষিত চিত্তে বিশ্বস্ততার স্থান নাই। ঘৃণ্যবিষয়ভোগ্-লোলুপ ব্যক্তিরাই সাধুগুরুশাস্ত্রাদির সদুপদেশে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, এমন কি শুভকার্য্য সাধন ভজন পথে নিজের চিত্তকেও বিশ্বাস করিতে সক্ষম হয় না। **বিষয়ভোগে ইন্দ্রিয়সুখলালসাই ইহার কারণ।** তাহারা মনে ভাবে সৎ মহাপুরুষের উপদেশে, শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণে, শ্রীভগবৎ-

পাদপদ্মসাধনাদিতে কি জানি তাহাদিগের ইন্দ্রিয়ারামের ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। স্ত্রীপুত্র অর্থাদি সম্বন্ধে ক্ষতির সম্ভাবনা করিয়াই তাহারা ভীত হইয়া পড়ে। হায় হতভাগ্য সততভোগকলুষিতচিত্ত মানব! তুমি যাহাদিগের প্রতি বিশ্বস্ত হইয়া সুখান্বেষণে তৎপর তাহারাই তোমাকে তোমার অলক্ষ্যে নানা প্রকারে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর করাইতেছে, তথাপি তুমি তাহাদের উপর বিশ্বাস রাখিতে চেষ্টা কর। তোমার পুত্র, তোমার স্ত্রী, তোমার আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি তোমার সাক্ষাতে অসাক্ষাতে ছলে বলে তোষামোদে কত প্রকারে তোমার ধন মান যশ আদি নাশ করিতেছে, তথাপি তাহাদের উপর তোমার বিশ্বাস নষ্ট হয় না, কিন্তু দৈবাৎ যদি কোনও সাধু বা গুরুবেশধারী ক্ষণিকের জন্য কিঞ্চিৎ ছলনাপূর্ব্বক তোমার অর্থাদি গ্রহণ করেন তাহা হইলে সমগ্র সাধুগুরুকুলের উপর তোমার বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যায়। আত্মীয় স্বজনের শত সহস্র অন্যায়, ব্যভিচার, তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াও তোমার চিত্তে রেখাপাত করে না, আর সাধুগুরুবেশধারী কেহ কচিৎ কোন অন্যায় বা ব্যভিচার করিলে সমগ্র সাধু মহাত্মাকে অধিকার করিয়া তাহা তোমার চিত্তে স্থির আসন গ্রহণ করে। **ইহার কারণ একমাত্র ঘৃণ্যবিষয়ভোগ-লোলুপতা ব্যতীত আর কি হইতে পারে?**

শ্রীভগবৎপাদপদ্ম সাধন ভজনেও নিজের চিত্তকে যে বিশ্বাস করিতে পারি না ইহার কারণও ভোগলোলুপতা। আমরা এতই চপল যে সদুপদিষ্ট সাধন-ভজনে চিত্ত দৃঢ় রাখিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারি না, পরিণামে প্রচুর অনাবিল সুখের অধিকারী হইতে পারিব এ বিশ্বাস রক্ষা করিতে পারি না, ইহার কারণ ভোগলোলুপতাই।

এই অবিশ্বাস পরিহার করিবার একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ। মহতের কৃপা ব্যতিরেকে অবিশ্বাস দূরীভূত হইবার উপায় নাই। **মহৎই হৃদয়ে বিশ্বাসের বীজ বপন করেন।** তাই শাস্ত্রে বলেন—

মহৎ কৃপা বিনা কোন কার্য্যসিদ্ধি নয়।

এই কৃপালাভ কি? কৃপালাভের উপায়ই বা কি? মহতের কৃপালাভ করিতে হইলে মহৎসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক মহতের আচরিত সদ্ধর্ম্মসমূহকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে হয়। মহতের মুখনিঃসৃত উপদেশাদি এবং ভগবন্মহিমা

শ্রবণ করিতে করিতে অনাদি বিষয়দূষিত চিত্ত ক্রমশঃ নির্ম্মল হইতে থাকে। সামান্য কিছু কালের জন্যও তর্কবিতর্ক ছাড়িয়া যদি মহৎ ব্যক্তির মুখনিঃসৃত ভগবন্মহিমা বা ধর্ম্মোপদেশাদি শ্রবণ করা যায় তাহা হইলে নিশ্চয়ই চিত্ত নির্ম্মল হইয়া সৎ মহাপুরুষে, শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ে, শ্রীভগবানে শ্রদ্ধা আবির্ভূত হইয়া ক্রমশঃ জীবকে কৃতার্থতার পথে অগ্রসর করায়। দম্ভ অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎ মহাপুরুষের সান্নিধ্যলাভ এবং তন্মুখনিঃসৃত ভগবৎকথা শ্রবণই শ্রদ্ধালাভের একমাত্র উপায়। এইরূপে শ্রদ্ধা সহকারে ভগবৎকথা শ্রবণ করিতে করিতে তাহাতে রুচি উৎপন্ন হয়।

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥

ভগবৎকথায় রুচি হইলেই জীব পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে সক্ষম হয়। ইহা জীবের পরম সৌভাগ্য।

“অসৎসঙ্গঃ পরিত্যাজ্যঃ”

অসৎসঙ্গঃ

পরম স্নেহাস্পদ—

শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ বসু, বি, এ,

কালিয়া, যশোহর।

মদীয় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পিত কুসুমাঞ্জলির এই নির্ম্মাল্য আপনাকে আমার স্নেহাশিস্ রূপে প্রদান করিলাম। ইহা আপনার সাধনপথের সহায় হউক।

শ্রীভাগবতস্বামী।

যেমন সৎসঙ্গের মহামহিম গুণরাজি শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় তেমনই অসৎসঙ্গের ভয়ানক দোষসমূহও দেখিতে পাওয়া যায়। সৎসঙ্গের প্রভাবে যেমন জীবের পরম উন্নতি লাভ হয় তেমনই অসৎসঙ্গের প্রভাবে অবনতি প্রচুর পরিমাণে হয়। তাই **নিজে সাধু হইলেও অসৎসঙ্গ হইতে সাবধান হওয়াই উচিত।** যাঁহারা সত্য দয়া বিনয় শ্রদ্ধা ভক্তি প্রভৃতি দৈবী সম্পত্তি লাভ করিতে প্রয়াসী তাঁহাদিগের পক্ষে মিথ্যাপরায়ণ নির্দ্দয় অবিনয়ী অবিশ্বাসী ভক্তিশূন্য ব্যক্তিদিগের সঙ্গ সর্ব্বনাশকর। রোগীর পক্ষে রোগবর্দ্ধক কুপথ্যাদি যেমন পরিণামে নাশকর তদ্রূপ সৎপথে প্রবৃত্ত কিঞ্চিৎ সাধনযুক্ত ব্যক্তিদিগেরও অসৎসঙ্গটি পরিণামে সর্ব্বনাশকর হয়। মৃদু দান্ত বিনয়ী সত্য-পরায়ণ দয়ালু ব্যক্তি যদি তাদৃশ বিপরীত স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তির সহিত মিলা মিশা ভাব করেন, বেশ বন্ধুতা রাখেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে উহা মহাবিপদ।

ক্রূর পরনিন্দুক দাম্ভিক ব্যক্তির নিকট যদি আপনি যাতায়াত করেন বা তাহার সহিত বন্ধুতা করেন তাহা হইলে আপনি কি শিক্ষা পাইবেন? ক্রূরতার পরিপাটি, পরনিন্দায় অদ্ভুত বাক্‌কৌশল, পরের উৎকর্ষ অসহন এবং পরকে তুচ্ছ বোধ করার চমৎকারিতাই শিক্ষা পাইবেন।

শাস্ত্র, দেবতা, ঈশ্বর, সাধু, মহাত্মা ইত্যাদি সকলেই অসৎ ব্যক্তিদিগের অবজ্ঞার পাত্র। আলাপে ব্যবহারে ইহাদের কিঞ্চিৎ অমনোনীত ব্যবহার হইলেই আপনার সাক্ষাতেই ইহারা আপনার গুরু, শিক্ষক প্রভৃতি অতি পূজ্য জনেরও, এমন কি পিতা মাতারও নিন্দাপবাদ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

এতাদৃশ ব্যক্তির সঙ্গে আপনার যত মিলা মিশা ভাব থাকিবে আপনি ততই এই পুরস্কার উত্তরোত্তর বেশী পাইতে থাকিবেন। এখন দেখুন, আপনার পক্ষে মহাবিপদ; কেননা সে ব্যক্তি আপনার গুরুনিন্দা করিল, বা বাক্‌কৌশলে আপনার পিতৃদেবের অপকর্ষ সূচনা করিল; আপনি কিন্তু তাহার মত গুরু-নিন্দা করিতে পারিবেন না; তাহা করিলে আপনার মহদবজ্ঞাজনিত পাপই হইবে। অন্য কোনও প্রকারে তাহার প্রতিশোধ দিবার উপায় অবলম্বন করিতে গেলে আপনার মৃদুতা, শম, দম, বিনয়, দয়া, সরলতা প্রভৃতি গুণের বিরোধী উগ্রতা, দুর্দ্দম, অসহিষ্ণুতা, ঔদ্ধত্য, নির্দ্দয়তা, ক্রূরতা প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে আপনার আধ্যাত্মিক জীবনের প্রচুর ক্ষতি হইয়া পড়িবে। অথচ তাহার তাদৃশ ব্যবহারে ক্রমশঃ আপনার অসহনীয় মনো-বেদনাই বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। আপনি মহা অশান্তিগ্রস্ত হইয়া পড়িবেন। আর যদি তাদৃশ ব্যক্তির তাদৃশ আপনার গুরুনিন্দাদি, পিতা মাতার অপকর্ষাদি শ্রবণ করিয়াও আপনার মনোবেদনা উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে অতি অচিরেই তাদৃশ বন্ধুতার চরম পরম ফল আপনার বন্ধুর সাদৃশ্যকে লাভ করিয়া এমন কি স্বয়ংই আপনি নিজের গুরুর, নিজপূজ্য মহৎ ব্যক্তির, নিজ পিতা মাতারও নিন্দাদিতে এবং তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনে অভিজ্ঞতাই উপার্জ্জন করিবেন। ইহা অপেক্ষা অধঃপতন আর কাহাকে বলে? **তাই শাস্ত্রাদিতে বিজাতীয় কালসর্পতুল্য অসৎসংসর্গ হইতে দূরে পলায়ন করিবার উপদেশ আছে। ইহাদের বিষ বড় ভয়ানক সংক্রামক।**

প্রশ্ন হইতে পারে,—তাদৃশ অসৎপ্রকৃতিক ব্যক্তিকে ভাল করিতে চেষ্টা

করা উচিত নয় কি? ইহাও ত মহোপকার! আর ভাল করিতে হইলে ত তাহার সঙ্গ নিশ্চয়ই হইবে। উত্তরে বলা যাইতে পারে,—সত্য কথা; ভাল করিতে হইলে তেমন শক্তিসম্পন্ন পাকা সাপুড়ে হওয়া চাই, যাহাতে তাহার বিষবাষ্প আপনাতে না লাগে তেমন শক্তিসম্পন্ন ঔষধ প্রচুর থাকা চাই, যাহার বলে নিজের আত্মরক্ষা হয় এবং সেও ভাল হইতে পারে। আর যদি তাদৃশ শক্তি না থাকে তাহা হইলে আমার মত সাধারণ লোকের সামান্য বিছে কাটার বিষনামান ঔষধের ভরসায় তেমন বিজাতীয় কালসর্পের সঙ্গ করিলে নিজের সর্ব্বনাশই হওয়ার সম্ভব। আমাদের সামান্য শক্তিসম্পন্ন মনঃপ্রাণ লইয়া তাদৃশ ব্যক্তিকে ভাল করিতে যাওয়াও নিজের সর্ব্বনাশ করা। অনেক স্থলে আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির সামান্য উপদেশে ফল বিপরীতই হইয়া থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে,—তবে কি তাদৃশ ব্যক্তির উপকারের চেষ্টা করিব না? তাহা হইলে পরোপকার ত করা হইল না! উত্তর এই যে উপকার করিতে হইলে **শক্তিসম্পন্ন সাধু সাপুড়িয়ার পায়ে ধরে কাঁদুন।** সাপুড়িয়ার দয়া হইলে তাদৃশ সর্পের তীব্র বিষও নষ্ট হইবে। **শক্তিসম্পন্ন সাধু মহাপুরুষেরাই এ সর্পের ওঝা।** শ্রীভগবৎপাদপদ্মে ব্যাকুল প্রাণে তাদৃশ ব্যক্তির মঙ্গল কামনায় বারম্বার প্রার্থনা এবং সাধুমহাপুরুষদিগের করুণামৃত ভিক্ষা তাদৃশ বিষ দূরীভূত করিবার একমাত্র মহৌষধি।

এইস্থলে একটি সত্য ঘটনা বলিতেছি শ্রবণ করুন। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা—আমি তখন গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের তটে বাস করি। তথায় এক বিরক্ত ভজনশীল বৃদ্ধ বৈষ্ণব বাস করিতেন। তাঁহার এক যুবক শিষ্য ছিল। তিনি সেই যুবকটিকে আদেশ করিলেন, "তুমি এই পণ্ডিতজীর নিকট গীতা পড়।" (তথায় বৈষ্ণব মহোদয়রা আমাকে পণ্ডিতজী বলিয়া সম্বোধন করিতেন।) তখনও আমি ব্রহ্মচারী বেশেই থাকি, সন্ন্যাস গ্রহণ করি নাই। যুবকটি আমার নিকট আসিয়া গীতাপাঠ আরম্ভ করিল। আমার অধ্যাপনার সময় খুব অল্প, দিবার শেষভাগে তাহাকে শ্রীগীতার ব্যাখ্যা যথাসাধ্য শ্রবণ করাইতাম। কিছুদিন পরে ঐ যুবকটিকে "সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় শাস্ত্রোক্ত অসৎসঙ্গের দোষও কিছু কিছু বলিলাম। সে তখন ঠিক এই প্রকার প্রশ্নই তুলিল, "অসৎকে ভাল করিতে হইলে অসৎ-

সঙ্গ ত অবশ্যই করিতে হইবে।" উত্তরে আমার শ্রীগুরূপদিষ্ট যাহা বলিয়াছি তাহাই তাহাকে বলিলাম। যুবকটি তখন অতিশয় অভিনিবেশ সহকারে আমার কথাগুলি শ্রবণ করিল। কিছুদিন পরে হঠাৎ তাহার আর উদ্দেশ পাওয়া গেল না। তাহার শ্রীগুরুদেব বৃদ্ধ মহাত্মা তাহার জন্য অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিলেন। আমারও মনে একটু দুঃখ হইল। কিছুকাল পরে, আমি তখন কুসুমসরোবরে থাকি, একদিন হঠাৎ দেখি তাহার গুরুদেব বৃদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্মা যাহারা ধর্ম্মের নামে অসদাচার আশ্রয় করে এতাদৃশ কয়েকটি স্ত্রী-পুরুষ মিলিত যাত্রী দলের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছেন এবং "হা শ্রীগিরিরাজ, হা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, রক্ষা কর, রক্ষা কর" ইত্যাদি বলিতেছেন। তাৎকালিক কুসুমসরোবরে বিরক্ত বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ হরিচরণ দাস পণ্ডিতজী অবস্থান করিতেন। ইনি মদীয় শ্রীশ্রীগুরুবিষ্ণুপাদপদ্মের প্রিয় ছাত্র, সুপণ্ডিত এবং দয়ার্দ্রচিত্ত; আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার তুল্য স্নেহ করিতেন, আমিও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তুল্য শ্রদ্ধাভক্তি করিতাম। তিনি এবং আমি একটি বৃক্ষতলায় বসিয়া কিছু শাস্ত্র আলোচনা করিতেছিলাম। সেই সময় উক্ত বৈষ্ণব মহাত্মা আসিয়া "হা গিরিরাজ, এই কি তোমার ইচ্ছা" বলিয়াই রোদন করিতে লাগিলেন। আমরা উভয়েই শশব্যস্তে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলাম। তিনি আমার দিকে চাহিয়া কাতর ভাবে বলিলেন, "পণ্ডিতজি, আপনার ছাত্রকে নরককুণ্ড হইতে উদ্ধার করুন, উদ্ধার করুন।" আমি বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "কে ছাত্র, কি হইল?" তিনি বলিলেন, "সেই নৃসিংহানন্দ নরককুণ্ডে ঝাঁপ দিয়াছে; কৃষ্ণ রক্ষা করুন, আপনারা দয়া করুন, তাকে উদ্ধার করুন।" শ্রীমৎ হরিচরণ দাস পণ্ডিতজীর প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধ মহাত্মা বলিলেন, "ঐ যে যাত্রী দল যাইতেছে, ঐ দলের মধ্যে হতভাগ্য নৃসিংহানন্দও আছে, সে ভ্রষ্ট হইয়াছে।" আমি বলিলাম, "ভগবদিচ্ছা, তাহার কর্ম্মফল, আপনি আক্ষেপ করিবেন না। বৃথা ব্যাকুল হইতেছেন কেন? ছেড়ে দেন তার কথা।" বৃদ্ধ মহাত্মা ছলছল নেত্রে আমার প্রতি চাহিলেন, শ্রীল হরিচরণদাস পণ্ডিতজীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন শ্রীল পণ্ডিতজী আমাকে বলিলেন, "চল, শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান ক'রে আসি।" বৃদ্ধ বৈষ্ণবকে বলিলেন, "বাবাজি মহারাজ, আপনার কৃপাশীর্ব্বাদই তাহার উদ্ধারের একমাত্র উপায়।

আপনি শ্রীগোবিন্দপাদপদ্মে জানাইলে সে উদ্ধার পাইবে।" বৈষ্ণব মহাত্মা তখন সাষ্টাঙ্গ হইয়া শ্রীল পণ্ডিতজীকে প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "পণ্ডিতজী, আপনি বলুন, 'সে উদ্ধার পাইবে, আবার শ্রীগোবিন্দপাদপদ্মভজন সৌভাগ্য লাভ করিবে।' আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, কৃপা করুন।" শ্রীল পণ্ডিতজীও তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন, **"আপনার এই আর্ত্তি, আপনার এই শিষ্যবাৎসল্য শ্রীগোবিন্দ কখনই উপেক্ষা করিবেন না।** আপনি অগ্রসর হউন, আমরা আসিতেছি।" "হা গিরিরাজ দয়া কর, হতভাগাকে উদ্ধার কর" এই বলিতে বলিতে বৃদ্ধ মহাত্মা রাধাকুণ্ডাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আমার প্রতি বেশ একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীল পণ্ডিতজী একটু শ্লেষভঙ্গস্বরে বলিলেন, "গৌরগোবিন্দ, তুমি যাবে, না এখানে বসিয়া বসিয়া রজ্জুভুজঙ্গবৎ এই জগৎটাকে মিথ্যা বানাইয়া ফেলিবে?" আমি বলিলাম, "পার্‌ছি কই? একে যত মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দিতে চাই, ততই এ জগৎটা গাঢ় সত্য হ'য়ে আমাকে আরও বেশী ক'রে আঁক্‌ড়াচ্ছে।" তিনি বলিলেন, "তোমার রজ্জুভুজঙ্গবিষে বেশ ক্রিয়া করেছে দেখ্‌তে পাচ্ছি, তোমাতে সরসতার বিন্দুও রাখে নাই।" আমি বিস্মিত নেত্রে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিলাম; তিনি বলিলেন, "চল, শ্রীকুণ্ডে যাবে, প্রাণটাকে অন্ততঃ এখনকার মত সরস করিয়া লও, নতুবা হয়ত সাক্ষাৎ শ্রীরাধাপ্রেমপীযূষপূর্ণ শ্রীকুণ্ডকেও রজ্জুভুজঙ্গ করিয়া ফেলিবে। ঐ স্থানের রজে একটু গড়াগড়ি দিয়া তোমার বিষটাকে একটু কমাইয়া লও।" আমার মনের মধ্যে তখন কেমন একটা ভয় এবং অনুতাপ আসিয়া উপস্থিত হইল, আমি সেই স্থানের ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে জল আসিল, প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, মনে হইতে লাগিল দুই মহাপুরুষের চরণেই অপরাধী হইয়াছি। গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইবার জন্য অগ্রসর হইবা মাত্রই তিনি দৌড়াইয়া দূরে সরিয়া গেলেন। আমি ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় সেই স্থলে লুণ্ঠিত হইয়া "পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ" বলিয়া রোদন করিয়া উঠিলাম। তিনি আমার নিকটে আসিলেন, আমি উঠিলাম, উভয়ের মধ্যে পরস্পর দণ্ডবৎ প্রণামাদি হওয়ার পর দুইজনে শ্রীরাধাকুণ্ডাভিমুখে রওনা হইলাম। শ্রীশ্যামকুণ্ডের তীরে পূর্ব্বে আমি যে কুটীরে বাস করিতাম সেই

স্থানটি যেমন নির্জ্জন তেমনই মনোরম। রাধাকুণ্ডতীরে উপস্থিত হইয়া সেই কুটীরাভিমুখে আমরা অগ্রসর হইতেছি, হঠাৎ পশ্চিম দিক হইতে 'পণ্ডিতজি' 'পণ্ডিতজি' শব্দ শুনিলাম। আমরা উভয়ে সেই দিকে ফিরিয়া দেখিলাম অতি শীর্ণকায় আলখেল্লা-পরা একটি যুবক আমাদের দিকে বেগে অগ্রসর হইতেছে। শ্রীল পণ্ডিতজী বলিলেন, "ঐ যে তোমার ছাত্র নৃসিংহানন্দ।" আমি একটু অগ্রসর হইতে যুবক আসিয়া আমাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া শ্রীল পণ্ডিতজীকে প্রণাম করিল। পণ্ডিতজী তাহাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন, অতিশয় স্নেহে বলিলেন, "নৃসিংহানন্দ, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? এ কি, তোমার শরীর এত শীর্ণ কেন?" নৃসিংহানন্দ কোন উত্তর দিল না, অধোবদনে রহিল। আমার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করি, "তোমার এ বেশ কেন?" পণ্ডিতজীর ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম না। তিনি সব জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু বেশের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। শ্রীল পণ্ডিতজী বলিলেন, "চল।" আমরা তিন জনেই আমার পূর্ব্বকুটীর স্থলে আসিলাম। নৃসিংহানন্দকে সঙ্গে লইয়া তিনি নিজ কুটীরে চলিয়া গেলেন। সমস্ত দিন আমার সঙ্গে দেখা হইল না। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে শ্রীল পণ্ডিতজী আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, "ভায়া, তোমার নৃসিংহানন্দ সত্যই অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইয়াছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি রকম?" তিনি বলিলেন, "গাঁজা চরস খুব চলে এবং স্ত্রীলোকদিগের সহিত তাহার খুব ঘনিষ্ঠ ভাব দেখিলাম।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি সাক্ষাৎ দেখিলেন?" তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তখন আপনার সাথে কি কথা হইয়াছিল?" তিনি যাহা বলিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই ঃ—

ঐ যাত্রী দল নৃসিংহানন্দের পূর্ব্বপরিচিত। যখন আমার সঙ্গে সে গীতাধ্যয়ন করিত তখন হইতে তাহার মনে উদয় হয় যে তাহার বিশুদ্ধ ধর্ম্মের মহিমা দেখাইয়া এবং উহাদিগকে তাহা বুঝাইয়া সদ্ধর্ম্মে আনয়ন করিবে, এবং এই অভিপ্রায়েই সে তাহাদের সঙ্গে যাইয়া মিলা মিশা করে, ক্রমে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়, পরে দ্বারকা দর্শন করিতে তাহাদের সঙ্গে যায়। সম্প্রতি বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডে স্নান করিয়া তাহাদের সঙ্গে দেশে যাইবে।

আমি শুনিয়া বিস্মিত কিছুই হই নাই। তবে মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, "শ্রীগীতাধ্যাপনকালে এমন কি উপদেশ দিয়াছি যাহাতে তাহার ঐ

প্রকার প্রবৃত্তির উদয় হইল ?” শ্রীল পণ্ডিতজী বলিলেন, “কি বিড়ম্বনা! আহা ছেলেটি ভজন করিতেছিলেন, বেশ বৈরাগ্যবান্ ছিল ; তার এমন দশা দেখিতে বড় কষ্ট হইতেছে। তোমার নৃসিংহানন্দ এমন হইল ?” আমি বলিলাম, “আমার কিসে ?” তিনি হাসিয়া বলিলেন, “ওঃ, আমার ভুল হইয়াছে, নৃসিংহানন্দ বেশ একটি বড় পণ্ডিত হইলে তখন তুমি নিজেই ‘আমার নৃসিংহানন্দ, আমার নৃসিংহানন্দ’ বলিয়া বুক ফুলাইতে।” এই আঘাতটি আমার বেশ লাগিল। আমি বলিলাম, “আপনাদের তুল্য মহাপুরুষদের হৃদয়ে যাহার জন্য শুভাকাঙ্ক্ষা উদয় হয়, তাহার নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে।” তিনি বলিলেন, “দেখ গৌর, তুমি ভাই সত্যই মহাপুরুষ, দয়া তোমার নিকট মায়া, নির্দ্দয়াও তোমার নিকট মায়া। জগতের সবই মায়া। বলিতে পার ইহার আসল কায়াটি কোথায় ?” আমি তখন হাসিয়া বলিলাম, “এই জাগতিক সকল মায়ার আসল কায়া **আমার শ্রীমদনগোপালের শ্রীপাদপদ্মছায়ায়।** ইনি আপনাদের **যোগমায়া, না ?”** তিনি স্নেহকরুণ দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, “যাক্ ভাই, তুমি আমাকে বাঁচাইলে, **‘আমার শ্রীমদনগোপাল’** এই স্মরণ তোমার আছে ত ?” আমি সজল নয়নে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাহার চরণতলেই দৃষ্টি ন্যস্ত করিলাম। তিনি তখন বলিলেন, “তোমাকে একটি কথা বলি, দুঃখ ভাবিও না। মধ্যে মধ্যে তুমি বড় কর্কশ হইয়া উঠ। বল দেখি আজ ঐ বৃদ্ধ মহাত্মা বহুকালের ভজনবিজ্ঞ বৈষ্ণব তোমার নিকট সহানুভূতি প্রার্থনা করিলেন, আর তুমি **“অদৃষ্ট” “কর্ম্মফল”** ইত্যাদি নিরপেক্ষ নীরস শুক্‌নো কয়েকটি কথা বলিয়া নিজেকে খুব নিরপেক্ষ বিরক্ত মহাত্মা মনে করিলে, না ? দুটি মিষ্ট কথায় তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিলে কি তোমার বৈরাগ্যের কিছু হানি হইত ? বরং ঐ বৃদ্ধ বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারিতে। তুমি জান তোমার উক্ত ব্যবহারে তিনি কত বেশী মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছেন ?” আমি বলিলাম, “যাহা বলিয়াছি তাহা ত দুঃখপ্রদ কথা নহে। আমার মনে যাহা উদয় হইয়াছে বলিয়াছি।” তিনি বলিলেন, “তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা সত্যই বলিয়াছ। অদৃষ্ট ভিন্ন আর কি বলা যাইবে ? কিন্তু আমার প্রশ্ন এই যে যিনি তাপিত হৃদয়ে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, তোমার উপদেশে তাঁহার তাপের উপশম হইয়াছে কি বৃদ্ধি হইয়াছে ?

উপদেশ দেওয়াটা বেশী মূল্যবান্ নহে। উপদেশের ফল ধরাণই মূল্যবান্।” আমি লজ্জিত হইলাম এবং উক্ত বৃদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ করিয়াছি মনে করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আমাকে বিমর্ষ দেখিয়া শ্রীল পণ্ডিতজী বলিলেন, “যাক্, তোমার ঐ সত্যটিকে একটু মিষ্ট মাখাইয়া ঐ বৃদ্ধ বৈষ্ণবকে একটু সেবন করাইও।” আমি বুঝিলাম। তিনি বলিলেন, “দেখ, এখানে তোমার আমার একটি শিক্ষণীয় বিষয় আছে। শিক্ষাটি এই—**শিষ্য করিবার পূর্ব্বে শিষ্যবাৎসল্যগুণ উপার্জ্জন করিতে হয়, তার পর শিষ্য করা ভাল। শুধু লাভ যশ অর্থ পাণ্ডিত্য প্রশংসার লোভে শিষ্য করা নয়। নিষ্কপট শিষ্যবৎসল গুরুই সদ্গুরু।** নৃসিংহানন্দ না তোমার ছাত্র! কি বল গুরুজি?”

পরিণামে কয়েক বৎসর পরে নৃসিংহানন্দ পুনরায় শ্রীগোবর্দ্ধনতটে আসিয়া পূর্ব্ববৎ ভজন সাধন করিয়াছিল। এই সংবাদ শ্রীল হরিচরণ দাস মহারাজজীর মুখেই আমি কাম্যবনে থাকা কালে শ্রবণ করিয়াছিলাম। ইহা সাধুগুরুর অপার কৃপামহিমা বলিয়াই আমার অনুভব হয়।

কামক্রোধাদি চিত্তের পাপবৃত্তি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অসৎপথে পরিচালিত হইয়াও যদি সৎ মহাপুরুষ ভগবদ্ভক্তদিগের প্রতি অবজ্ঞারূপ মহাপরাধে পতিত না হন, তাহা হইলে তাদৃশ পাপাচারী ব্যক্তিও সৎ মহাপুরুষের ঈষৎ কৃপালেশে অনায়াসেই পূতচরিত্র হইতে পারেন। কিন্তু যাহারা ধনকুলবিদ্যাদিমদে উন্মত্ত হইয়া সাধু ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষসমূহকে অবজ্ঞার পাত্র করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন সেই হতভাগ্য দুরভিমানী দাম্ভিকদিগের পশুবৎ চেষ্টা সহজে শোধিত হইবার নহে।

যত প্রকার অসৎ চেষ্টা আছে, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ **ভয়ানক অসৎ চেষ্টা সাধুজনের অনাদর।** সৎ মহাপুরুষদিগকে নিজদিগের ধনাদি জনিত অসদ্বৃত্তির দ্বারা অনাদর করিতে যাহারা হৃদয়কে অভ্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাদিগের পাশব বৃত্তি পশুকেও অতিক্রম করিয়া থাকে। সেই মহদপরাধী-দিগের চিত্তবৃত্তিশোধন অতিশয় প্রবল করুণস্বভাব মহাপুরুষের প্রবল অনুগ্রহ সাপেক্ষ। তাই **সাবধান, সৎ মহাপুরুষের অবমাননায় চিত্ত কদাচ যেন অগ্রসর না হয়। মহদবজ্ঞাকারীর তুল্য অসৎ আর জগতে হইতে পারে না। এইপ্রকার অসৎসঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।**

“শ্রদ্ধাতঃ শরণাগতিঃ”

শরণাগতিঃ

পরম স্নেহাস্পদ—

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়,

হেলথ্ অফিসার, নওগাঁও, আসাম।

মদীয় **শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে** অর্পিত **কুসুমাঞ্জলির** এই **নির্ম্মাল্য** আমার স্নেহাশিস্ রূপে আপনাকে প্রদান করিলাম। ইহা আপনার জীবনপথের পরম সম্বল হউক।

শ্রীভাগবতস্বামী।

শ্রীভগবৎ সাধন ভজনের প্রথমতঃই শ্রীভগবৎপাদপদ্মে শরণাগতিরই মুখ্যতা। এই শরণাগতিভাব সাধকের হৃদয়ে দৃঢ় না থাকিলে বস্তুতঃ শ্রীভগবৎপাদপদ্ম সাধন হয় না। যাঁহার যে পরিমাণ শরণাগতি তাঁহার সাধন ভজনের ফলও সেই পরিমাণ লাভ হয়। সাধনভজনের মূল স্তম্ভই শরণাগতি! কামক্রোধাদি দ্বারা পরিপীড়িত সংসারভয়ে ভীত অনন্যগতি জনই শরণ আশ্রয় করে। ভগবদ্ভক্তিকাম ব্যক্তিও কামক্রোধাদি ষড়্‌বর্গ কর্তৃক ভগবদ্বৈমুখ্য আসিতে পারে এই ভয়ে অনন্যগতি হইয়া শরণই গ্রহণ করেন। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, অনন্যগতি ব্যক্তিই শরণাগতির অধিকারী। এই অনন্যগতিত্বটি সিদ্ধ হয় দুই প্রকারে। এক প্রকার হয়, আশ্রয়ান্তরের অভাবজ্ঞানে; যথা—

মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্
লোকান্ সর্ব্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য
স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি ॥

"মৃত্যুরূপ কালসর্পের ভয়ে ভীত মনুষ্য লোক হইতে লোকান্তরে পলায়নপর হইয়া কোন স্থানেও নির্ভয় লাভ করিতে পারে না। হে আদ্য, যদৃচ্ছাক্রমে অর্থাৎ কোনও অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যফলে মহৎকৃপায় যখন তোমার পাদপদ্ম প্রাপ্ত হয় তখন সে নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন অর্থাৎ বিশ্রাম লাভ করিতে পারে; মৃত্যু তখন তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে।"

আর একপ্রকার অনন্যগতিত্ব হয়,—অনতিপ্রজ্ঞাবশতঃ কথঞ্চিৎ অন্য আশ্রয় থাকিলেও তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীভগবদনন্যগতি; যথা—

তস্মাত্ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ॥
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ ॥

"হে উদ্ধব, তুমি শ্রৌতবিধি, স্মার্ত্তবিধি ও প্রবৃত্তি নিবৃত্তি এবং শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয় সমূহকে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদেহীর আত্মরূপ আমার শরণাপন্ন হও, তাহা হইলে আমার দ্বারা অকুতোভয় হইবে।"

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না!"

এই ভগবদ্বাক্য বিচার করিলে দেখা যায় একমাত্র ভগবৎশরণাগতিতেই সর্ব্ববিধ শোকের নিবৃত্তি হয়। আহা কি মধুর! ভগবান্ অভয় দিয়া বলিতেছেন, "মা শুচঃ।"

এই শরণাগতি কাহাকে বলে? শরণাগতির লক্ষণ কি? কি করিলে শরণাগতি হয়? ইত্যাদি প্রশ্ন সাধক হৃদয়ে উদিত হইতে পারে; তাই শ্রীগোস্বামি-

গ্রন্থে বৈষ্ণবতন্ত্রবচনকে অবলম্বন করিয়া শরণাগতির স্বরূপ এইভাবে নির্ণীত হইয়াছে ; যথা—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনং।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥

আনুকূল্যের সঙ্কল্প, প্রতিকূলতার পরিত্যাগ, শ্রীভগবান্ আমাকে রক্ষা করিবেন এই প্রকার বিশ্বাস, শ্রীভগবান্‌কে পতি (পালক) রূপে বরণ (স্বীকরণ বা প্রার্থনা) করা, আত্মনিক্ষেপ এবং কার্পণ্য অঙ্গাঙ্গিভেদে শরণাগতির এই ছয়টি প্রকার কথিত হইয়াছে। একটি অঙ্গী, অপর পাঁচটি অঙ্গ। ইহার মধ্যে "গোপ্তৃত্বে বরণং" অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কে পতি রক্ষক রূপে স্বীকরণ অথবা প্রার্থনা করাটিই মুখ্য শরণাগতি, যেহেতু শরণাগতি শব্দের তাৎপর্য্যার্থ এবং "গোপ্তৃত্বে বরণং" শব্দের তাৎপর্য্যার্থ একই। আর "আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ" প্রভৃতি পাঁচটি "গোপ্তৃত্বে বরণং" ইহার পরিকর, এই জন্য উহারা শরণাগতির অঙ্গ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। "আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ" অর্থাৎ ভগবদ্ভজনের অনুকূল যাহা তাহারই সঙ্কল্প অর্থাৎ কর্ত্তব্য বোধে নিয়ম প্রতিপালন, অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভক্তাদির অথবা শরণাগত ভাবের অনুকূল যাহা তাহারই কর্ত্তব্য রূপে নিয়ম রক্ষা। "প্রাতিকূল্য বিবর্জ্জনম্" অর্থাৎ ভগবদ্ভজনের, ভগবদ্ভক্তাদির অথবা শরণাগতভাবের যাহা বিপরীত তাহার পরিবর্জ্জন। আর "রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ", অর্থাৎ শ্রীভগবান্ অবশ্যই আমার মঙ্গল বিধান করিবেন, শরণাগত আমাকে অবশ্যই রক্ষা করিবেন, "ক্ষেমং বিধাস্যতি স নো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ", ইত্যাদি প্রকার বিশ্বাস। "আত্মনিক্ষেপঃ" অর্থাৎ আত্মসমর্পণ, "কেনাপি দেবেন হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" ইত্যাদি প্রকার, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে প্রাকৃত অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবৎপরতন্ত্র হইয়া এবং ভগবদায়ত্তজীবন হইয়া অশেষ প্রকারে নিজের সর্ব্বসামর্থ্যবিধি পরিত্যাগ করতঃ শ্রীভগবানে সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া শ্রীভগবৎকর্ম্মই সম্যক্ আচরণ করাই আত্মসমর্পণ। শাস্ত্রে বলেন—

অহঙ্কারনিবৃত্তানাং কেশবো ন হি দূরগঃ।
অহঙ্কারযুতানাং হি মধ্যে পর্ব্বতরাশয়ঃ॥

"অহঙ্কার যাঁহাদের নিবৃত্ত হইয়াছে শ্রীহরি তাঁহাদের দূরে নহেন, অর্থাৎ অচিরেই তাঁহারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবেন। আর রাশি রাশি অহঙ্কার লইয়া যাঁহারা আছেন তাঁহাদের এবং শ্রীহরির মধ্যে পর্ব্বতরাশি রহিয়াছে, অর্থাৎ হরিপ্রাপ্তি তাঁহাদের সুদূর পরাহত।"

"কার্পণ্যম্" অর্থাৎ "হে ভগবন্ রক্ষ রক্ষ" ইত্যাদি প্রকারে নিজের আর্ত্তভাবকে প্রকটন করা। "পরমকারুণিকো ন ভবৎপরঃ, পরমশোচ্যতমো ন চ মৎপরঃ" ইত্যাদি প্রকার। এই সর্ব্বসমেত ছয়প্রকার শরণাগতি। এই শরণাগতি আবার কায়িক, বাচিক, মানসিক ভেদে তিন প্রকার; যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে—

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥

"হে ভগবন্, আমি তোমারই—এই প্রকার বাক্যের দ্বারা যিনি বলেন, যিনি এই প্রকার মনেতেও জানেন, এবং যিনি শরীর দ্বারা শ্রীভগবদ্ধামকে আশ্রয় করিয়াছেন, এই ত্রিবিধ শরণাগত জন শ্রীভাগবতীয় পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন।"

অতএব এই সর্ব্বসাধনস্তম্ভরূপা শরণাগতির প্রতি সাধকের লক্ষ্য রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। এই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না ষড়্‌বিধা শরণাপত্তি যাঁহার আছে তিনি ঝটিতি সাধনের সম্পূর্ণ ফল লাভে কৃতার্থ হয়েন। আর যাঁহারা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না শরণাপত্তি সম্পত্তি সঞ্চয় করিতে পারেন নাই, তাঁহারা যে পরিমাণ শরণাপত্তি সম্পত্তি সংগ্রহ করিয়াছেন, যথাক্রমন্যায়ে সাধন ফলও সেই পরিমাণ পাইবেন; এমন কি, **শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তিসাধনে অসমর্থ ব্যক্তিও কেবল শরণাপত্তি মাত্রেই কৃতার্থতা-লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।**

এই শরণাগতি সাধনসাধ্য উভয়রূপা। যদি সাধন অবস্থাতে শরণাগতির লক্ষণ ছয়টি না থাকে তাহা হইলে সাধন হইবে কি প্রকারে? অর্থাৎ আনুকূল্যের সঙ্কল্প অনুযায়ী কার্য্য করার নামই ত সাধন। প্রাতিকূল্যবর্জ্জনের দিকে লক্ষ্য না থাকিলে সাধন হইবে কি প্রকারে? শ্রীভগবান্ অবশ্যই রক্ষা করিবেন এ বিশ্বাস না থাকিলে সাধন অগ্রসর হইবে কি প্রকারে? ছয় প্রকার শরণাগতি সম্বন্ধেই এইরূপ বুঝিতে হইবে। শরণাগতির অঙ্গগুলি যত সম্পূর্ণতার দিকে

অগ্রসর হইবে সাধন ততই গাঢ় হইতে থাকিবে। আবার বস্তুতঃ নিষ্কপট সাধন যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে ভগবৎশরণাগতি ভাব ততই হৃদয় মধ্যে উচ্ছলিত হইতে থাকিবে। **শরণাগতিই সাধনার জীবনী শক্তি।** ঐ প্রকার আবার সাধ্য প্রেমভক্তি ভগবৎপ্রাপ্তি হইলে একমাত্র শরণাগতিতেই পর্য্যবসিত হয়। তখন সাধকের তদৈকজীবন হইয়া উঠে।

এই শরণাগতি ভক্তিসাধনের মধ্যে নিত্যকৃত্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ইহা জীববন্ধু শ্রীজীবপাদের সিদ্ধান্ত।

মনে রাখা কর্ত্তব্য প্রথমতঃ সৎমহাপুরুষ শ্রীগুরুপাদপদ্মে যাহাদিগের বিশ্বাসের অভাব ভগবৎশরণাগতি তাহাদিগের পক্ষে সুদূরপরাহতা।

প্রথমতঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হওয়াই ভগবৎশরণাগতি-লাভের একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মশরণাগতিই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মনুষ্যকে ভগবৎপাদপদ্মশরণাগতিতে পৌঁছায়।

যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।

শরণাগত জন শ্রীভগবৎপ্রসাদে পরা শান্তি লাভ করে।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

"গুরুপাদাশ্রয়ো দীক্ষা"

গুরুপাদাশ্রয়ঃ

পরম স্নেহাস্পদ—

শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস, এম্ এস্‌সি,

প্রফেসার, কলেজ্ অব্ ইঞ্জিনিয়ারিং য়্যাণ্ড্

টেক্‌নোলজি, বেঙ্গল, যাদবপুর।

মদীয় **শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে** অর্পিত **কুসুমাঞ্জলির** এই **নির্ম্মাল্য** আমার স্নেহাশিস্ রূপে আপনাকে প্রদান করিলাম। ইহা আপনাকে পরম করুণ **শ্রীশ্রীগুরুবিষ্ণুপাদপদ্মকল্পবৃক্ষে** পরম আশ্রয় প্রদান করুক।

শ্রীভাগবতস্বামী।

শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

"গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন।"

শ্রীভগবৎসাধন করিতে হইলে প্রথমতঃ শ্রীগুরুপাদাশ্রয় চাই, নতুবা ভগবৎসাধন সুদূর। ভগবৎসাধনে শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের অবশ্য কর্ত্তব্যতা নির্ণয়ে অধিক বলিবার কিছুই নাই। কেননা জগতে এমন কোন ধর্ম্মসাধক সম্প্রদায় নাই, কি বৈদিক কি অবৈদিক, যাহাতে শ্রীগুরুকরণ স্বীকৃত হয় নাই। এমন কি প্রাকৃত ব্যবহারিক জাগতিক জ্ঞান লাভ করিতে হইলেও সর্ব্বত্রই গুরুস্বীকার ভিন্ন উপায় নাই। সুতরাং অপ্রাকৃত অলৌকিক শ্রীভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের কর্ত্তব্যতা নিশ্চয়ই আছে। এ বিষয়ে আর

অধিক কথা কি? বস্তুতঃ গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ হইলে, শ্রীগুরু-পাদাশ্রয় সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। গুরু পদার্থ কি, গুরুর স্বরূপ কি, ইত্যাদি জ্ঞানশূন্য মাদৃশ হতভাগ্য জনেরই তাদৃশ সন্দেহ। কিন্তু সাধুসঙ্গে নির্ম্মলচেতা ভগবদ্ভজনেচ্ছু মহাভাগ্যবান্ জনের তাদৃশ সন্দেহ থাকিতে পারে না। আহা! যিনি "গুরু", গুরুই, কোন ক্রমে যাঁহাতে লঘুতা আসিতে পারে না, যিনি সকল প্রকার লঘুকে নিজের গুরুত্ব শক্তিতে গুরু করিয়া তুলিতে পারেন, কিন্তু যাঁহাতে লঘু নিজের লঘুত্ব বিস্তার করিতে সক্ষম হয় না।

এই শ্রীগুরুতত্ত্বজ্ঞানলাভ সাধুসঙ্গে হয়। এইজন্য শাস্ত্রে সর্ব্বপ্রথমে সাধু-সঙ্গের ব্যবস্থাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। শ্রীভগবদ্ভক্ত সাধু ও মহৎ সঙ্গ না হইলে গুরু পদার্থ কি তাহা উপলব্ধি হয় না। কোন অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যে অলক্ষিত শ্রীভগবৎকৃপাবশতঃ ভাগ্যবান জনেরই ভগবদ্ভক্ত সঙ্গ লাভ সঙ্ঘটন হয়। সতত হরিকথানিরত, হরিপাদপদ্মমধুব্রত, অন্যব্রতবিরত মহাপুরুষের সঙ্গপ্রভাবে এবং তাঁহাদের মুখনিঃসৃত ভগবৎকথামৃত আস্বাদনে ক্রমশঃ বিষয়রাগদূষিত চিত্ত নৈর্ম্মল্য ধারণ করে, ক্রমশঃ হরিকথাদিতে রুচি হইতে থাকে। রুচি-যুক্ত মনে শ্রীহরিকথাশ্রবণে অতি অচিরেই সংসারের অনিত্যতা ও ইহলোক পরলোকের ক্ষণভঙ্গুরতা বোধগম্য হয় এবং শ্রীহরি ব্যতিরিক্ত সমস্ত সংসার দুস্তর সাগর সদৃশ মনে হয়। তখন এই দুস্তর সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত প্রাণে প্রবল ব্যাকুলতা আসে। তখন শ্রীহরিপাদপদ্মলাভের নিমিত্ত চিত্ত ধাবিত হয়, সংসার সমুদ্র পারের উপযুক্ত কর্ণধারের প্রয়োজন বোধ হয়; শ্রীভগবৎপাদপদ্ম সান্নিধ্য লাভের পথপ্রদর্শকের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞান তখনই হয়।

এই ভব সমুদ্র পারের কর্ণধার এবং শ্রীভগবৎপাদপদ্ম লাভের পথপ্রদর্শক যিনি, তিনিই গুরু,—

"যাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হনে।"

এই শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের অবশ্য কর্ত্তব্যতা বোধ হয় একমাত্র সদ্ভক্তের সঙ্গগুণে। শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের অবশ্য কর্ত্তব্যতা জ্ঞান যদি না হয়, তাহা হইলে

বুঝিতে হইবে প্রকৃত সদ্ভক্ত সঙ্গলাভ হয় নাই। সদ্ভক্ত সঙ্গলাভ হইয়াছে বা হইতেছে অথচ শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের কর্ত্তব্যতার অনুভব নাই, অর্থাৎ শ্রীগুরু-পাদাশ্রয় করা হয় নাই, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সদ্ভক্তের সঙ্গে প্রকৃত সঙ্গলাভ এখনও হয় নাই অথবা সৎসঙ্গের ফল এখনও উদয় হয় নাই। কেননা প্রাথমিক সৎসঙ্গের চরম ফলই শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের আবশ্যকতা বোধ হওয়া। সৎকরুণাঞ্জনরূষিতবিলোচন ভাগ্যবান্ জনই শ্রীগুরুচরণ শরণ মহিমা অবগত হইতে পারেন। সর্ব্বগুণাধার ভজনীয়সার অপার করুণাপারাবার **শ্রীভগবানের "করুণাই" যেন ঘনীভূত হইয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতঃ সাধু গুরু রূপে জীবের পরম কল্যাণার্থে জগতে প্রকটিত হইয়াছেন।**

এই জগন্মঙ্গল সাধুগুরুকে শ্রীভগবানের করুণাবতার বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ জগতের প্রতি শ্রীভগবানের করুণার প্রকাশ সাধুগুরুদ্বার দিয়াই হয়। সাধুগুরু দ্বারাই আমরা ভগবানের করুণার পরিচয় পাই। সাধুগুরু দর্শনেই আমরা ভগবানের খবর পাই, সাধুগুরুতেই ভগবদ্ভক্তিজ্ঞান পরিচয় হয়, অন্যত্র হয় না। সম্বিদংশপ্রধান আহ্লাদিনী শক্তিসারস্বরূপা শ্রীভক্তি দেবীর রত্ন-সিংহাসন সাধুগুরুর হৃদয়। শ্রীভগবানের একই করুণা কার্য্যভেদে পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াই সাধু গুরু নাম ধারণ করেন। সাধুর কার্য্য মায়া-মুগ্ধ জীবের যাহাতে শ্রীভগবৎসাম্মুখ্য লাভ হয় তাহার প্রাথমিক উপায় শ্রীভগবৎকথাদিতে রুচি জন্মাইয়া ক্রমশঃ শ্রীভবগদ্ভজনের মূল শ্রীগুরুপাদপদ্ম সমাশ্রয়ের অবশ্য কর্ত্তব্যতা বোধ করান। আর শ্রীগুরুবিগ্রহের প্রাথমিক কার্য্য শ্রীভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ স্থাপন করান। এই কার্য্যভেদে 'সাধু গুরু' নাম ধারণ করিয়া **"মূর্ত্তিমৎ ভগবৎ করুণাবিগ্রহ"** জগতের পরম মঙ্গল বিধানের নিমিত্ত বিচরণ করিয়া থাকেন।

এই প্রকার সদ্ভক্ত সঙ্গের ফলে শ্রীগুরুস্বীকরণের আবশ্যকতা বোধ হইলে জীবের শ্রীগুরুচরণ সমীপে গমনের নামই গুরূপসত্তি। শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী তাই নিরূপণ করিতেছেন,—

"গুরুপাদাশ্রয়"।

এই গুরুপাদাশ্রয়টি যেমন তেমন ভাবে কিছু প্রণামী আদি দিয়া যেমন তেমন একটি মন্ত্র গ্রহণ করা মাত্র নহে। শ্রীগুরুপদে **"আশ্রয়"**—এই আশ্রয়

কথাটির তাৎপর্য্য এই যে দীক্ষামন্ত্রাদি গ্রহণের পূর্ব্বে কিছুকাল গুরুসমীপে বাস করতঃ শ্রীগুরু আনুগত্যে কায়িক বাচিক মানসিক কপটতাশূন্য শুশ্রূষা দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্তোষ উৎপাদন করা। এই প্রকার শ্রীগুরূপসত্তিতে গুরু শিষ্য উভয়েই উভয়ের স্বভাব পরীক্ষা করিতে পারেন। শাস্ত্রে এই প্রকার গুরু-শিষ্য পরীক্ষা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এই পরীক্ষাটি শুধু মাত্র "লোক বাছাই করা" পরীক্ষা নহে। এই পরীক্ষার একটি চমৎকার মূল্যবান্ ফল আছে। দীক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষায় শ্রীগুরুসমীপে বাস করিয়া গুরুসেবা করিলে নিজাভীষ্টসিদ্ধিলাভের ব্যাকুলতায় স্বতঃসিদ্ধ কতকগুলি সদ্‌গুণ লাভ হয়। শম, দম, বিনয়, নম্রতা, সত্য, দয়া, দাক্ষিণ্য, অহিংসা প্রভৃতি সদ্‌গুণের উদয়ে নিজের মন্ত্র গ্রহণের শুভ যোগ্যতা অর্জ্জন হয়। অপর পক্ষে তাদৃশ নিষ্কপট মহৎসেবার ফলে শ্রীগুরুতত্ত্ব করুণার্দ্র হইয়া উঠেন। সেবাসন্তুষ্ট করুণাবিগলিতচিত্ত শ্রীগুরুপাদকমল হইতে কারুণ্যামৃত মহাফল স্বরূপ দীক্ষা-মন্ত্র লাভ করাই শিষ্যের পরম পুরুষার্থ। এই প্রকার শ্রীগুরূপসত্তিশূন্য দীক্ষা প্রায়ই সুফলযুক্ত হয় না। বরং ভবিষ্যতে গুরুশিষ্যের উভয়েরই ভজন পথে নানা বিঘ্ন হওয়ারই সম্ভব। **বৈষ্ণবভাবরহিত গুরু হইলে শিষ্যের ভজন-বিঘ্ন, আনুগত্যশূন্য ভক্তিবিরহিত শিষ্য হইলে গুরুর ভজনবিঘ্ন, ইত্যাদি মহা উৎপাতের সৃষ্টি হয়।** তবে যাঁহারা সিদ্ধশক্তিসম্পন্ন অসাধারণ মহাপুরুষ তাঁহারা পরস্পর সাক্ষাৎ মাত্রেই অত্যল্পক্ষণেই পরস্পরের যোগ্যতাদি নির্ণয় করিতে সক্ষম হন। তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, তাহা সাধারণের জন্য ব্যবস্থা হইতে পারে না।

এই প্রকার সর্ব্বতঃ আনুগত্য ও কপটতাশূন্য শুশ্রূষা দ্বারা শ্রীগুরুচরণ সন্তুষ্ট হইলে, পরে যথাবিধি "দীক্ষা"। এই দীক্ষার তাৎপর্য্য শ্রীভগবানের সহিত শিষ্যের বিশিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করা। "বিশিষ্ট" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে জীব শ্রীভগবানের নিত্য তটস্থ শক্তিরূপ চিৎকণাংশ, সুতরাং নিত্য দাস। শ্রীভগবানের সহিত জীবের এই নিত্য সম্বন্ধ চিরকাল স্থাপিতই আছে।

"জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ॥"

কিন্তু এই প্রকার সামান্য দাসত্ব থাকিলেও অনাদি শ্রীভগবদ্বৈমুখ্য নিবন্ধন

মায়াবৃত্তি অবিদ্যা কর্ত্তৃক মুগ্ধ হইয়া মায়িক দেহ ইন্দ্রিয় মন আদি উপাধি গ্রস্ত হইয়া অনাদি মায়ামুগ্ধ বদ্ধাবস্থা লাভ করিয়াছে।

"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেল।
অতএব মায়া পিশাচী গলায় বান্ধিল॥"

স্বরূপতঃ জীব নিত্য ভগবদ্দাস হইলেও স্বীয় কর্ত্তব্য ভগবদ্দাসত্ব বিস্মৃতি বশতঃ মায়া কর্ত্তৃক বন্ধনে পড়িয়া মায়িক অভিমানে বিভোর হওয়ায় দ্বিগুণতর-রূপে তাহার ভগবদ্দাসত্ব ভুল হইল। শ্রীগুরু করুণাপূর্ব্বক সেই মায়ার বন্ধন শিথিল করিয়া স্বরূপশক্তির বিলাসের পরাকাষ্ঠা ভক্তিরস মাখাইয়া শিষ্যের আত্মাটিকে ভগবানের সমীপে নিবেদন করেন, **ইহাই হইল দীক্ষা।**

বস্তুতঃ যাবৎ পর্য্যন্ত অনির্ব্বচনীয় সাধুগুরুর কৃপায় শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তির বিলাসানুগ্রহে জীব অনুগৃহীত না হয়, তাবৎ অনাদি অনন্তকাল পর্য্যন্ত জীবের ঐ মায়িক বদ্ধতা ঘুচাইবার অন্য উপায় নাই। শ্রীভগবৎকরুণাবিগ্রহ সাধু গুরু কৃপাতে ভগবজ্‌জ্ঞানের উন্মেষ হয় ও দীক্ষা মন্ত্র লাভে আত্মসমর্পণ হয় এবং ভাবী পরম পুরুষার্থ শ্রীভগবৎসেবোপযোগী দেহ মন প্রাণাদি লাভের উপযোগী ভগবৎকিঙ্করত্বজ্ঞান উদয় হয়। ইহাই এখানে **"বিশিষ্ট সম্বন্ধ"।**

এই দীক্ষা **"শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ সদ্‌গুরুর"** নিকট গ্রহণীয়। যার তার কাছে দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ করিলে কোন ফলোদয় হয় না।

দীক্ষা মন্ত্র এবং দীক্ষা কার্য্যকলাপ এই বিশিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপনের নিমিত্তই শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈ স্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥"

অস্যার্থঃ—যেহেতু দিব্যজ্ঞান দান করে এবং পাপের সংক্ষয় করে, সেই জন্যই তত্ত্ববেত্তা আচার্য্যগণ তাহাকে দীক্ষা বলেন। এস্থলে দিব্যজ্ঞান বলিতে অপ্রাকৃত জ্ঞানই বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই, শ্রীমন্ত্রে সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ-জ্ঞান এবং সেই ভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশেষজ্ঞান। আহা! কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীমুখে বলিতেছেন, যথাঃ—

দীক্ষাকালে করে ভক্ত আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করেন আত্মসম॥

সেই দেহ করেন তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥

যাহারা এতাদৃশ শাস্ত্রীয় দীক্ষামন্ত্রগ্রহণে বিমুখ তাহারা শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্ত এই পরম সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত। শ্রীভগবদ্‌ভজন তাহাদের সুদূর, ইহা নিশ্চয়।

আজকাল কেহ কেহ "নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে" ইত্যাদি শ্রীহরিনাম মাহাত্ম্য ব্যঞ্জক শ্লোক দেখাইয়া এবং অজামিলাদির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলেন যে,—দীক্ষামন্ত্র গ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন নাই, শ্রীহরিনাম করিলেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়, শ্রীমহাপ্রভুও শ্রীহরিনামের উপদেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীগোস্বামিশাস্ত্রের মত তাদৃশ নহে। অনাদি প্রবাহিত মহামহর্ষিবৃন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় সাধক ভক্তবৃন্দের দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ রূপ পরম সদাচার দেখিয়াও, এবং যাবতীয় শাস্ত্রে দীক্ষার নিত্যতা, অবশ্যকর্ত্তব্যতার প্রমাণাদি দেখিয়াও, যাহারা ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত আশ্রয় করিয়া **সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় পূর্ব্বক দীক্ষামন্ত্র গ্রহণে বিমুখ** তাহাদের তাদৃশ নাম গ্রহণটি **নামাপরাধেই পর্য্যবসিত হয়।** কারণ নাম বলে ভক্তিশাস্ত্র অবহেলা হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ **গুর্ব্ববজ্ঞারূপ প্রবল মহাপরাধও আপতিত হয়।** সুতরাং শ্রীভগবৎপাদপদ্ম ভজনেচ্ছু জন মাত্রেই উপযুক্ত সদ্‌গুরুর চরণারবিন্দ আশ্রয় করতঃ শ্রীগুরুকৃপারূপ পরমাভীষ্ট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হউন, ইহাই পরম কারুণিক বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের অভিপ্রায়।

আরও বলা হইয়াছে যে, যার তার কাছে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণে কোন ফল হয় না। এখানে "যার তার" বলিতে ভক্তিশাস্ত্রানভিজ্ঞ এবং শ্রীভগবদ্ভজনানভিজ্ঞই বুঝিতে হইবে। যাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে তিনি যদি ভক্তিশাস্ত্রানভিজ্ঞ হন এবং ভজনতৎপরও না হন, তাহা হইলে শিষ্যের পক্ষে ভক্তিজ্ঞানলাভ এবং ভগবদ্ভজন পথ অবলম্বন অসম্ভব হইয়া পড়ে। ভগবজ্‌-জ্ঞান ভগবদ্ভজন শ্রীগুরু আনুগত্যানুসারেই হয়; হরি! হরি! যদি মূলে গুরুতেই তাহা না থাকে, তবে কিসের আনুগত্যে কি লাভ হইবে? লাভ হওয়া দূরের কথা, বরং পতন হওয়াই সম্ভব, কারণ তাদৃশ ভক্তিশাস্ত্রজ্ঞানশূন্য এবং ভজনাসক্তিরহিত জনের আনুগত্যে ভক্তির মর্য্যাদা লঙ্ঘন প্রতিপদেই হইয়া

পড়ে, তন্নিমিত্ত দুর্ব্বার অপরাধে অপরাধী হইতে হয় এবং তাহার ফলে গুরুতর পতনই সম্ভব।

আর যদি কোন প্রকারে প্রবল মহৎসঙ্গের মহিমায় শিষ্যের কথঞ্চিৎ ভক্তিভাবের উদয় হয় এবং সাধন ভজনের প্রবৃত্তি হয় তাহা হইলেও ভক্তি-বিরোধী গুরুর আনুগত্যে তাহাও বিলীন হইয়া যায়। তাই শাস্ত্রে শ্রীগুরুকরণ বিষয়ে প্রথমে গুরুশিষ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

এখানে "ভক্তিশাস্ত্রাভিজ্ঞতা" এবং "ভজনতৎপরতা" এই দুইটিরই প্রবল অপেক্ষা। তাই শ্রুতি বলেন—

"শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।"

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্।"

এখানে তাৎপর্য্য এই যে অনেকে শাস্ত্র জানেন, কিন্তু ভজন করেন না, আবার কেহ ভজন করেন, শাস্ত্রজ্ঞানের উপযোগিতা স্বীকার করেন না; ইহারা কেহই গুরু হইবার যোগ্য নহেন। হায়, অনেক স্থলে, অধিক কি শ্রীধামাদি স্থানেও এমন অনেকে আছেন যাঁহারা বলেন যে "ওসব শাস্ত্র টাস্ত্র কিছুই নয়, ভজন কর, ভজন কর।" আবার অনেকে আছেন যাঁহারা ভজনের ধারই ধারেন না, কেবল বলেন, "শ্লোক কণ্ঠস্থ কর।" কিন্তু বস্তুতঃ ইহা নহে। তাৎপর্য্য এই, শাস্ত্রজ্ঞান ভিন্ন ভজন হয় না এবং ভজন বিনাও শাস্ত্রজ্ঞান সফল হয় না। শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা তত্ত্বের যথার্থ নির্দ্ধারণ, ভজনাঙ্গ যজন দ্বারা সেই শাস্ত্রনির্দ্ধারিত তত্ত্বের অনুভব, এই দুইটি পরস্পর সাপেক্ষ। বিশেষতঃ জিজ্ঞাসু শিষ্যের হৃদয়ে এমন কতকগুলি সন্দেহের উদয় হয়, যাহা শাস্ত্রযুক্তি দ্বারাই নিরসন হয়, আবার এমনও অসম্ভব ভাবনা বিপরীত ভাবনা আছে যাহা মাত্র শাস্ত্র-যুক্তির দ্বারাও সম্পূর্ণরূপে নিরসন হয় না, ভজনাঙ্গ যজন দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে তত্ত্ব বস্তুর অনুভবে তাহার নিরসন হয়। সুতরাং **ভক্তিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং ভজননিপুণ ব্যক্তিই গুরু হইতে পারেন।** তাই বলা হইয়াছে যার তার কাছে দীক্ষাগ্রহণে ফল হয় না।

অনেকে বলেন যে কুলক্রমপ্রাপ্ত গুরু শাস্ত্রে অভিজ্ঞ বা ভজননিপুণ না হইলেও তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে, পশ্চাৎ ভজন জ্ঞান

১৫

লাভের নিমিত্ত কোন শাস্ত্রজ্ঞ ভজননিপুণ ব্যক্তিকে শিক্ষাগুরু করিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিবে। এই প্রকার সিদ্ধান্ত কোন বৈষ্ণবশাস্ত্রানুমোদিত নহে। **কুলপরম্পর গুরু** অবশ্যই করিতে হইবে এমন কোন প্রবল বিধি **কোনও বৈষ্ণবাচার্য্যানুমোদিত নহে।** আর ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত শাস্ত্র প্রতিকূল, উহা অনকূল নহে। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ঃ—

"লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগমঃ।"

তাৎপর্য্য এই যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে মন্ত্রদীক্ষারূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়া "তেন" অর্থাৎ সেই দীক্ষাগুরু প্রদর্শিত মন্ত্রবিধিশাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিবে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে মন্ত্রদীক্ষাদান যাঁহার কার্য্য মন্ত্রবিধিশাস্ত্রশিক্ষাদানও তাঁহারই কার্য্য, সুতরাং কুলপরম্পর গুরুর মুখ্যত্ব বৈষ্ণবশাস্ত্রানুমোদিত নহে। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও শ্রীগোস্বামিপাদ বলিতেছেন, যথা ঃ—

"গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্।"

এখানে "তস্মাৎ" এই পদে দীক্ষাগুরু হইতেই দীক্ষা সম্বন্ধীয় শিক্ষাদি গ্রহণ করিবে ইহাই মুখ্য বিধি। তবে দীক্ষাগুরুর অবর্ত্তমানে অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব অপ্রকট হইলে শাস্ত্রজ্ঞ ভজননিপুণ কোন মহাপুরুষকে তাদৃশ গুরুতুল্য মনে করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষাদি বিষয়ক শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিবে এবং তাঁহাকেই শ্রীগুরুজ্ঞানে সেবা পরিচর্য্যাদি করিবে। শাস্ত্রে শিক্ষাগুরুও অবশ্য করণীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এখানে শিক্ষাগুরু বলিতে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি অঙ্গ যজনের শিক্ষা ভক্তির সদাচারাদি শিক্ষা ইত্যাদির গুরুই বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রে শ্রবণগুরু বলিয়াও একপ্রকার গুরু স্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু উক্ত ভজনশিক্ষাগুরু এবং শ্রবণগুরু প্রায়ই তুল্য, যথা ভক্তিসন্দর্ভে ঃ—

"শ্রবণগুরুভজনশিক্ষাগুর্ব্বোঃ প্রায়িকমেকত্বমিতি।"

কুলপরম্পরানুরোধে **ভক্তিশাস্ত্রজ্ঞানহীন ভজনাসক্তিরহিত জন গুরু হইতে পারে না।**

"যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।"

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোদ্গীর্ণ এই মহাবাক্যই তাহার প্রবল দৃষ্টান্ত। এখানে কুলপরম্পরা ত দূরের কথা, **জাতি, বর্ণ, আশ্রমাদিরও অপেক্ষা**

নাই, কেবল **কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তৃত্বেরই অপেক্ষা,** ইহা শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যের তাৎপর্য্য। তাদৃশ কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষের কৃপালব্ধ দীক্ষামন্ত্রই জীবের পরম-পুরুষার্থ, শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির প্রথমাঙ্কুরোন্মুখ বীজ। এই অঙ্কুরই কোনও সময়ে মহা সৌভাগ্যে শ্রীভগবৎপ্রেমফলে পরিণত হইবে, ইহাই হইল দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

আবার এতাদৃশ সদ্‌গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা মাত্র গ্রহণ করিলেই যে কর্ত্তব্য শেষ হইল, তাহা নহে। **"গুরুর সেবন"** অর্থাৎ দীক্ষা গ্রহণের পরেও শ্রীগুরুসেবার বিশেষ প্রয়োজন। এই গুরুসেবা নিত্য কর্ত্তব্য। নিতান্ত অভাবেও কিছুকাল শ্রীগুরুপাদপদ্ম সন্নিধানে অবস্থান করিয়া শ্রীগুরুসেবা করা বিশেষ কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুকৃপারূপ পরমমঙ্গল মন্ত্রদীক্ষাটি শ্রীভগবৎসাম্মুখ্য লাভের অঙ্কুরায়মান বীজতুল্য হইলেও ভবিষ্যতে ভক্তিসাধনরূপ জলসেকের অভাবে শ্রীভগবদ্ভক্ত মহদাদির নিকট দুর্ব্বার অপরাধ রূপ মহাতাপে ঐ অঙ্কুরটি নাশ পাইবার সম্ভাবনা আছে। ভবিষ্যতে যাহাতে ঐ অঙ্কুর নাশ না পাইতে পারে, বরং ক্রমশঃ সেক পাইয়া পুষ্টি লাভ করিতে পারে, তাহারই প্রধান উপায় দীক্ষাগ্রহণের পরেও শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবা। প্রাথমিক সেবার মুখ্য ফল শ্রীগুরুকৃপারূপ মন্ত্রদীক্ষা লাভ; আর দীক্ষার পর সেবার মুখ্য ফল সাধন পথে নির্ব্বিঘ্ন হওয়া, ঝটিতি মহাপরাধে পতিত না হওয়া, অন্তিমে অচিরে শ্রীভগবৎপ্রেমভক্তি লাভ করিয়া পরম কৃতার্থ হওয়া। তাই শ্রীগোস্বামিপাদোক্তি, যথা ঃ—

তথাপি বৈশিষ্ট্যলিপ্সুঃ শক্তশ্চেৎ ততো ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেষ্টৄনাং ভগবন্মন্ত্রোপ-দেষ্টৄণাং বা শ্রীগুরুচরণানাং নিত্যমেব বিশেষতঃ সেবাং কুর্য্যাৎ (ভক্তিসন্দর্ভঃ)।

অধিক কথা কি, একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবা হইতেই যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গ-সাধনফল লাভ হয়; শ্রীগুরুসেবায় নিযুক্ত থাকিলে অন্য ভগবদ্ভজনের অপেক্ষা থাকে না (৪)। যথা সন্দর্ভে ঃ—

---

(৪) গুরুর পরিচর্য্যাদিতে নিযুক্ত থাকা কালে গুরুর অনুষ্ঠিত শ্রবণকীর্ত্তনার্চ্চনাদির আনুকূল্য দ্বারাই শিষ্যের ভগবদ্‌ভজন সিদ্ধ হয়; এইরূপে যাহা শিষ্যের নিয়মিত সাধন তাহার অভাবেও ক্ষতি অর্থাৎ অপরাধ হয় না।

"তস্মাদন্যদ্‌ভগবদ্ভজনমপি নাপেক্ষতে।"

এই শ্রীগুরুসেবা সর্ব্বতোভাবে নিষ্কপটে হওয়া চাই। শ্রীগুরুদেবে সামান্য মনুষ্যবুদ্ধি করা, তাঁহাতে প্রাকৃত দোষগুণাদির বিচার করা, শ্রীগুরুদেবের নরলীলোচিত কার্য্য সমূহকে মনুষ্য কার্য্য মনে করা, এই সমস্তই ভয়ানক কপটতা। এই সমস্ত পরিত্যাগ করতঃ সাক্ষাদ্‌ভগবদাবির্ভাব বিশেষ মনে করিয়া কায়িক বাচিক মানসিক কপটতাশূন্য হইয়া শ্রীগুরুসন্তোষকর সেবা করিবে।

শ্রীভগবানের কারুণ্যঘন অবতারই শ্রীগুরুবিগ্রহ। যে ভাগ্যবান্ সাধক এই শ্রীগুরুবিগ্রহে শ্রীভগবানের **আত্মপ্রকাশিকা "গুরু" শক্তি** উপলব্ধি করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তিনিই **সর্ব্বসিদ্ধি** করতলগত করিয়াছেন, ইহা সুনিশ্চিত।

সাধক যখন ভগবৎসাধনে নিজের দেহ মন প্রাণ ইন্দ্রিয়ের প্রতি অবয়ব **গুরুকৃপামৃতের** ধারায় অভিষিঞ্চিত হইতেছে (৫) উপলব্ধি করেন তখনই তাঁহার সাধনা পূর্ণ হইয়াছে (৬) বুঝিতে হইবে। শ্রীগুরুকরণ সাধনার জন্য, সাধনার জন্যই মনুষ্য জন্ম। মনুষ্য দেহ লাভ করিয়া যাহারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম মহিমার জ্ঞানে বঞ্চিত, সত্যই তাহারা সর্ব্বথা বঞ্চিত।

এই সংসারে বিপদাপন্ন হইয়া উদ্ধার পাওয়ার জন্য কাহারও শরণাপন্ন হইলে তিনি সমর্থ হইলেও শরণপ্রার্থীর যোগ্যতার বিচার করেন। কিন্তু যিনি

---

(৫) শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।৩১।১৫ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ বলিতেছেন,—নন্বীদৃশী ভক্তি স্ত্বয়া কথং প্রাপ্তেতি তত্র ভক্তেঃ প্রাপ্তিকারণং মহদনুগ্রহ এব ইত্যাহ যদিতি।...... **অতঃ** পূর্ব্বজন্মনি **কৃষ্ণভক্তস্য কস্যচিন্মদ্‌গুরোঃ প্রসাদবিলসিতমেবৈতন্মে কৃষ্ণভজনমিতি** ভাবঃ।

(৬) শ্রীমদ্ভাগবতের ৫।১২।১১ শ্লোকের টীকার মধ্যে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিতেছেন,— নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে...ময়ি শ্রীগুরুরূপে নিবেদিতৌ আত্মানৌ অহন্তাস্পদ-মমতাস্পদে যেন সঃ......ময়া বিচিকীর্ষিতঃ স্যাৎ বিশিষ্টঃ কর্ত্তুমিষ্টঃ স্যাৎ...নিস্ত্রৈগুণ্য এব স্যাদিত্যর্থঃ।...নির্গুণঃ কর্ত্তুমারভ্যমান এব স শনৈঃ শনৈ র্ভক্ত্যভ্যাসবান্ নিষ্ঠারুচ্যাসক্তি-রতিভূমিকারূঢ় এব **সম্যঙ্‌নির্গুণঃ স্যাৎ। ততো মিথ্যাভূতবস্তুভিঃ সহ তস্য ব্যবহারো ন স্যাৎ** তৎপূর্ব্বন্তু যথাযোগং ব্যবহার স্তৈশ্চ সহ লভ্যতে। অয়মর্থঃ অচিন্ত্যশক্ত্যা ভক্ত্যুপদেশকাল এব তস্য গুণাতীতানি দেহেন্দ্রিয়মনাংসি ময়া ভক্তি-মাহাত্ম্যদর্শনার্থমলক্ষিতমেব সৃজ্যন্তে মিথ্যাভূতানি তান্যলক্ষিতমেব লয়ং যান্তি।

সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও সে দিকে দৃষ্টি না দিয়া অবিচারে আশ্রয়মাত্রেই অভয় দান করেন, এই দুস্তর ভবসমুদ্র উত্তরণেচ্ছু নিরাশ্রয় জীবের জীবনতরীর কর্ণধার হন, সেই পরম করুণ শ্রীগুরুচরণের আশ্রয় যে গ্রহণ করে না তাহার দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম যে কেবল ব্যর্থ তাহা নহে, পরন্তু সে আত্মঘাতীই।

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"

জ্ঞানলিপ্সু জ্ঞানী সকল, কর্ম্মকুশল কর্ম্মিগণ, শ্রীগুরুকে সাক্ষাৎ ভগবদ্-বুদ্ধিই করেন, কিন্তু প্রেমলিপ্সু শুদ্ধ ভক্তগণ শ্রীগুরুদেবকে শ্রীভগবৎপ্রিয়ই মনে করেন। যাহা হউক, এই উভয় প্রকার শাস্ত্রই শ্রীগুরুকে সামান্য মনুষ্য বুদ্ধি করিয়া এবং তাঁহার নরলীলোচিত কার্য্যকলাপকে সামান্য মনুষ্যোচিত কার্য্য মনে করিয়া মনুষ্যবৎ দোষগুণের অধিকারী মনে করা সর্ব্বতো নিষিদ্ধ বলিয়াই ঘোষণা করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে শ্রীগুরুদেবের সাধারণ আচার ব্যবহারে কোথাও কথঞ্চিৎ লৌকিক বৈদিক ক্রিয়ার অন্যথা দেখিলেও সহসা তাঁহাকে সামান্য জ্ঞানে অবহেলা করিবে না। শ্রীভগবচ্ছক্তি স্বতন্ত্র পুরুষজ্ঞানে শ্রীগুরু বুদ্ধিই দৃঢ় রাখিবে। যেমন শাস্ত্রে আছে—

"অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব জনার্দ্দনঃ।
মার্গস্থো বাপ্যমার্গস্থো গুরুরেব সদাগতিঃ॥"

এই প্রকার শ্রীগুরুতে দোষাদি দৃষ্টির শাস্ত্রে প্রবল নিষেধ থাকিলেও গুরু যদি সাক্ষাৎ ভগবদ্ভক্তির মর্য্যাদা লঙ্ঘনে তৎপর হইয়া সাক্ষাৎ ভক্তিবিরোধী মত প্রচার বা আচার করেন, তাহা হইলে তাদৃশ আদেশ প্রতিপালনে শিষ্য তটস্থ হইবেন, অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব পরীক্ষা করিতেছেন কি না (৭) ইহাই মনে করিয়া উক্ত ভক্তিবিরোধী আদেশ প্রতিপালন না করিয়া শ্রীচরণে শরণাপন্ন হইয়া প্রৌঢ়ি ত্যাগ করতঃ কাতর প্রাণে শ্রীগুরুচরণে নিবেদন করিবেন; ইহাতে যদি শ্রীগুরুদেব সন্তুষ্ট না হইয়া পুনঃপুনঃ ভক্তিবিরোধী আচার অনুষ্ঠান করেন এবং শিষ্যকে আদেশ করেন তাহা হইলে শিষ্য তাদৃশ গুরুকে দূর হইতে আরাধনা করিবেন। আর যদি গুরু গুরুতর বৈষ্ণববিদ্রোহী হন তাহা হইলে তাদৃশ

(৭) তদীয় সিদ্ধভক্তা অপি তথা পরীক্ষন্তে। (শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৭।৮ শ্লোকের চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা)।

গুরুত্যাগের ব্যবস্থাও শাস্ত্রে আছে। তবে এ বিষয়ে খুব সাবধান হওয়া চাই। অর্থাৎ গুরু হইতে নিজের কোন প্রাকৃত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিঘাত সম্ভাবনায় বা গুরুতে অর্থ মান যশ প্রভৃতির লোভ আরোপ করিয়া গুরু ত্যাগ করা চলিবে না; যেমন শ্রীগুরু বলিলেন, "তোমার অর্থ কিছু আমাকে দাও," বা "আমার একটু সেবা কর," আর অমনই শিষ্য মনে করিলেন, "য়ঁ্যা, এ কি? গুরু যিনি তিনি নির্লোভ হইবেন। অর্থসেবাদিলিপ্সু গুরু হইতে পারেন না।" এই ভাবিয়া দুই চারি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া গুরুকে ভক্তিবিরোধী বলিয়া ঠিক করিয়া আদেশ প্রতিপালন করিলেন না, বা তাদৃশ গুরু হইতে দূরেই রহিলেন, অথবা গুরু ত্যাগ করিয়া নূতন গুরুর অনুসন্ধানে বাহির হইলেন, এইরূপ হইলে সর্ব্বনাশ। সুতরাং খুব সাবধান। তাই বলা হইয়াছে যে প্রথমে শাস্ত্রজ্ঞানকুশল এবং ভজনতৎপর গুরু আর গুরু-অনুগত শ্রীভগবৎপাদপদ্মকামী শিষ্য হইলে আর কোন ভয় থাকে না।

শ্রীগুরুতত্ত্ব একই। শিষ্যের নিজ নিজ গুরুবিগ্রহ ব্যষ্টিভাবে পৃথক্ পৃথক্ হইলেও সমষ্টিভাবে সকলেরই গুরু এক; এই সমষ্টি গুরু শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ অবতার। শ্রীভগবান্ অনাদি অবিদ্যাগ্রস্ত আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ প্রপীড়িত জীবনিচয়ের তত্ত্বজ্ঞান দানের জন্য স্বয়ং এই নিখিল কল্যাণ গুণনিলয় পরম বিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুরূপ পরিগ্রহ করিয়া নিত্যই বিরাজমান আছেন। **ভগবদুপদেষ্টৃত্বময় ভগবৎসাক্ষাদবতার সমষ্টি গুরুই জগতে নিজের ভাগবতী ভক্তিময়ী তনু প্রকট করিয়া ব্যষ্টি গুরু রূপ ধারণ করেন।** ভাগবতী ভক্তি গুরুশক্তিকে সমাশ্রয় করিয়া জাগতিক জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া জীবকে ভগবানের সন্নিকটে আকর্ষণ করে। সদ্‌গুরু চরণাশ্রয়ে দীক্ষার ইহাই রহস্য। **শ্রীগুরুতে ভগবদ্-ভাবের অনুভব করাই দীক্ষার সাফল্য।**

"জয় জয় গুরু গোঁসাই শ্রীচরণ সার।
যাঁহার কৃপায় তরি এ ভব সংসার॥"

ওঁ শ্রীরাধিকানাথ রাধিকাভাবতৎপর।
ত্বদীয়ারাধনাহীনং দীনং মা মব সদ্‌গুরো॥

Scanned by TapScanner

"গুরুসেবা পরং ফলম্"

গুরুসেবা

পরম স্নেহাস্পদ—

শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

উকিল, হাইকোর্ট, স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য।

মদীয় **শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে** অর্পিত **কুসুমাঞ্জলির** এই **নির্ম্মাল্য** আমার স্নেহাশিস্ রূপে আপনাকে প্রদান করিলাম। ইহা আপনার গুরুপ্রিয়তা বর্দ্ধন করুক।

শ্রীভাগবতস্বামী।

ভগবৎপ্রসন্নতাসিদ্ধির মূল একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের **প্রসন্নতা**। একমাত্র গুরুপ্রসন্নতার বলে নানাপ্রকার প্রতিকার আশ্রয় করিলেও যে সমস্ত অনর্থ অতীব দুস্ত্যজ তাহা সহজে নাশ প্রাপ্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে শ্রীনারদ বলিতেছেন,—"কাম জয় করিতে হইলে সঙ্কল্পবর্জ্জিত হওয়া চাই। নিঃশেষরূপে বাসনা ত্যাগ করিতে পারিলে **কাম** জয় হয়। **ক্রোধ** জয় করিতে হইলে কাম বিবর্জ্জন করা চাই। অর্থে অনর্থ দৃষ্টি সাধন বলে অর্থাৎ ভোগ্য বস্তু মাত্রেই অনর্থ জ্ঞান সাধন বলে **লোভ** জয় করা যায়। তত্ত্ববিচারে অর্থাৎ নিরন্তর ব্রহ্মতত্ত্বানুশীলনে **ভয়** দূরীভূত হয়। আন্বীক্ষিকী জ্ঞান বলে প্রকৃতি পুরুষ বিবেকে **শোকমোহ** পরাজয় হয়। সাধু মহাপুরুষের সেবা করিলে **দম্ভ** জয় হয়। মৌনব্রত সিদ্ধ হইলে মনের **একাগ্রতা** হয়। কাম চেষ্টা তিরোহিত হইলে **হিংসা** জয় করা যায়। কৃপাগুণ উপার্জ্জনে সিদ্ধ হইলে অর্থাৎ ক্ষমা সাধনে **আধিভৌতিক দুঃখের** নিবৃত্তি হয়। সমাধিবলে **আধিদৈবিক**

তাপ নাশ পায়। অষ্টাঙ্গযোগ প্রভাবে আধ্যাত্মিক ক্লেশ উপশম হয়। সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হইলে নিদ্রা জয় হয়। সত্ত্ববর্দ্ধনে রজস্তম জয় হয়। উপশম সাধনে সত্ত্ব জয় হয়। কিন্তু একমাত্র গুরুসেবার ফলে মানুষ সর্ব্ব প্রকার অনর্থ অনায়াসেই জয় করিতে সক্ষম হয়।

"অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জ্জনাৎ।
অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্শনাৎ॥
আন্বীক্ষিক্যা শোকমোহৌ দম্ভং মহদুপাসয়া।
যোগান্তরায়ান্ মৌনেন হিংসাং কামাদ্যনীহয়া॥
কৃপয়া ভূতজং দুঃখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা।
আত্মজং যোগবীর্য্যেণ নিদ্রাং সত্ত্বনিষেবয়া।
রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষোহ্যঞ্জসা জয়েৎ॥"

গুরুতে সাক্ষাদ্ভগবদ্‌বুদ্ধি পূর্ব্বক নিষ্কপটে শ্রীগুরুসেবা করিলে ভগবৎকৃপা লাভের নিমিত্ত আর পৃথক্ কোনও ভগবদুপাসনার অপেক্ষা না করিলেও ক্ষতি নাই (৮)। একমাত্র শ্রীগুরুসেবায় একাধারে সাধু গুরু ভগবান্ এই তিনের সেবা ফলের সৌভাগ্য লাভ করা যায়। গুরু ভগবদ্ভজনময় ভক্তরূপ, সুতরাং সাধু, আবার ভগবদুপদেষ্টৃত্ব হেতু গুরু গুরুরূপে ভগবানেরই আবির্ভাব।

গুরুসেবা বলিতে গুরুর ঠেকা উদ্ধার নহে। যেমন, গুরু শারীরিক অসমর্থ, আমি নিজ শরীর দ্বারা পরিশ্রম করিয়া গুরুর কার্য্য করিয়া গুরুর উপকার করিলাম; আমি অর্থবান্ ধনী, গুরুর ধন নাই, তিনি দরিদ্র, আমি অর্থ দিয়া মাসহারা কিছু দিয়া গুরুর উপকার করিতেছি; যেমন অভাবগ্রস্ত অসমর্থ আরও দশজনের উপকার বা সাহায্য করি এই রকম দুঃখী দরিদ্র অভাবগ্রস্ত গুরুরও সাহায্য করি, এই ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া বা এইরূপভাবে গুরুর ঠেকা

(৮) ভগবন্নামকীর্ত্তনাদিও গুরুসেবা। পরিচর্য্যারূপ সেবার আনুষঙ্গিক ভগবদ্‌ভজনও থাকিবে। সুতরাং ভগবৎকৃপালাভের জন্য গুরুসেবা নিরপেক্ষ স্থানাদিতে থাকিয়া পৃথক্ রূপে যে ভগবদ্‌ভজন তাহা না করিলেও ক্ষতি নাই। নিত্য সাক্ষাৎ গুরুর নিকট থাকিয়া গুরুর পরিচর্য্যাব্রতপর যে সাধক, গুরুসেবার আনুষঙ্গিক যৎকিঞ্চিৎ ভজনেই তাহার ভগবৎকৃপা লাভ হয়। ভগবদ্ভজন পরিত্যাগের ব্যবস্থা নহে।

উদ্ধার করিয়া, ঠিক প্রকৃত গুরুসেবার ফল লাভ করা যায় না। নিজের আত্মার পরম কৃতার্থতার জন্যই আত্মা মন প্রাণ দেহেন্দ্রিয় ধন জন শক্তি সামর্থ্য সমস্তই শ্রীগুরুপাদপদ্ম তুষ্টি বিধানের জন্য অকাতরে সমর্পণ করিয়া নিজে কৃতকৃতার্থ বোধ করাই গুরু সেবা। হায়! দুঃখ! আমি স্বীয় কর্ণে এমন শ্রবণ করিয়াছি, "গুরুকে অমুক মূল্যবান্ দ্রব্য আমি দিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আর এক জন সেই দ্রব্য দিয়াছে তাই আর আমি দিলাম না, আর বৃথা দিয়া কি হইবে ?" ইহাও শুনিয়াছি, "গুরু ত আমার নিকট চান নাই, চাইলে দেখা যাইবে।" হায় গুরুসেবা! হায় গুরুভক্তি! গুরুকে একজনা কিছু দিয়াছেন, তবে আর আমি দিব কেন? কেননা তাঁহার ঠেকা ত আর নাই। হায়! গুরু দীন দরিদ্রের মত আমার নিকট ত কাতর প্রার্থনা করিলেন না যে আমি তাঁহাকে দিব? হায়! গুরুকে কিছু দেওয়া যেন গুরুকেই কৃতার্থ করা, হা দুর্ভাগ্য! আবার পরম সৌভাগ্যে শ্রীমদনগোপাল করুণায় পরম গুরুভক্ত গুরুপ্রিয় জন দর্শন করিয়াছি;—গুরু বলিতেছেন, "কেন এই দ্রব্য বৃথা আমাকে দিতেছেন? আমার এই দ্রব্য আছে" ইত্যাদি; শিষ্য চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া কর জোড়ে কাতর প্রার্থনা করিতেছেন, "প্রভো! শ্রীপাদপদ্মের ব্যবহারে লাগিবার আশা করা স্পর্দ্ধা করা মাত্র, একবার স্পর্শ করিলে এ অধমের পাপার্জ্জিত অর্থের সার্থকতা হইবে, অধম কৃতকৃতার্থ হইবে। একবার স্পর্শ করিতে 'মর্‌জি' হউক, তারপর যাহা প্রভুর ইচ্ছা তাহাই করিতে মর্‌জি হউক;" ইত্যাদি রূপে কাতর প্রাণে কৃতার্থ বোধে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবানুরক্ততা অনুভব করিয়াছি। বস্তুতঃ গুরুসেবা করিয়া নিজে কৃতার্থ হওয়াই গুরুসেবা।

সাক্ষাদ্ভগবদ্বুদ্ধিতে শ্রীগুরুসেবা করিতে পারিলে জীব অনায়াসেই কৃতকৃতার্থ হইতে পারে। দশ প্রকার নামাপরাধের মধ্যে "গুরোরবজ্ঞা" নামক একটি নামাপরাধ শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। গুরু-অবজ্ঞার মূল কারণ শ্রীগুরুকে সাধারণ মনুষ্য তুল্য বোধ করা। আমরা যতই মুখে বলি না কেন 'গুরু মনুষ্য নন্', 'গুরু সাক্ষাৎ ঈশ্বর' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য যতই মৌখিক আবৃত্তি করি না কেন, কার্য্যকালে, ব্যবহার কালে, কথনোপকথন সময়ে, আমাদের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত অনাদি অজ্ঞান জনিত দুর্নিবার প্রবল মহাপরাধ যেন

মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমাদের কায়িক বাচিক ব্যবহারে "গুরুতে সাধারণ বুদ্ধির" পরিচয় দেয়। সর্ব্বদা সৎশাস্ত্রের শাসন মাথায় বহন করিয়া সৎ মহাপুরুষের আচরিত শ্রীগুরুভক্তি গুরুমর্য্যাদাকে আদর্শ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবা করিতে পারিলে গুরুতে সামান্য বুদ্ধি রূপ গুরুতর অপরাধ হইতে নিস্তার লাভ করা যায় এবং প্রকৃত গুরুসেবার পরম ফল শ্রীভগবৎপ্রসন্নতা অতি অনায়াসেই লাভ করা যায়।

গুরুসেবার প্রাথমিক অবস্থায় গুরুতত্ত্বই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে মনন করা চাই; গুরুগুণ বাচিক কীর্ত্তন করা চাই, **শ্রীগুরুমূর্ত্তি শ্রীভগবানের কারুণ্যঘন বিদ্যাময় বিগ্রহ** এই ভাবে ধ্যান করা চাই, সাক্ষাদ্ভগবদ্বুদ্ধিতে শারীরিক চেষ্টা দ্বারা গুরুসন্তোষকর সেবা কার্য্য করা চাই। তাহা হইলেই প্রকৃত গুরুসেবার ফল লাভ করিয়া কৃতার্থ হওয়া যায়।

শ্রীভগবান্‌ই সমষ্টি রূপে সাক্ষাদ্ বিশ্বগুরু রূপ ধারণ করিয়া বরাভয়-লসৎকর রূপে অবস্থান করেন; এই সমষ্টি গুরু **সাক্ষাদ্‌ভগবদবতার,** এইরূপে তাঁহার নিত্যধামে নিত্যই বিরাজিত আছেন। এই জগতে মায়িক অবিদ্যা-গ্রস্ত বিষয়প্রপঞ্চশৃঙ্খলে বিজড়িত বহির্ম্মুখ জীবনিচয়কে মায়াজাল হইতে মুক্ত করিয়া শ্রীভগবৎপাদপদ্ম প্রাপনের জন্য জীব প্রতি নির্হেতু নিঃসীম করুণাময় শ্রীভগবান্‌ই সাক্ষাৎ সমষ্টি গুরু রূপ ধারণ করিয়া আছেন; সেই পরম করুণ বিগ্রহ সমষ্টি গুরু হইতেই ভগবৎপ্রাপকত্ব নামক গুরুশক্তি এই জগতে **ভগবদ্‌ভজনময় সর্ব্বোত্তম মহদ্ভক্ত বিগ্রহে আবির্ভূত হইয়া যাঁর যাঁর পৃথক্ পৃথক্ ব্যষ্টি গুরু মূর্ত্তি প্রকট হইয়া থাকেন। সেই সমষ্টি গুরুরই ভক্তরূপে আবির্ভাব এই ব্যষ্টি গুরুতে এই প্রকার ভগবদভিন্নবুদ্ধিতে গুরুসেবাই সর্ব্বশাস্ত্রের সদুপদেশ।**

"তথা পীঠ পূজায়াং ভগবদ্বামে শ্রীগুরু পাদুকা পূজনং সঙ্গচ্ছতে। যথা য এব ভগবানত্র ব্যষ্টিরূপতয়া ভক্তাবতারত্বেন শ্রীগুরুরূপো বর্ত্ততে স এব তত্র সমষ্টিরূপতয়া স্ববামপ্রদেশে সাক্ষাদবতারত্বেনাপি তদ্রূপো বর্ত্ততে ইতি ভক্তিসন্দর্ভসিদ্ধান্তঃ।

ভগবানের সম্বিৎ শক্তির সারাংশ সমবেত আহ্লাদিনী শক্তির সারাংশ বিশেষই **ভক্তি**। এই ভক্তিমন্দাকিনী ধারা ভগবদ্ভক্ত সৎ মহাপুরুষ পরম্পরায়

প্রপঞ্চলোকস্থিত জাগতিক জীবে আবির্ভূত হয়। ইহার **প্রধান নিমিত্ত** কারণ একমাত্র **ভগবানের নির্হেতু করুণা।** অনাদি বহির্মুখ অবিদ্যা-গ্রন্থিশৃঙ্খলিত প্রাকৃতবিষয়ান্ধ জীবের পরমাত্যন্তিক মঙ্গল ফল প্রসবিনী ভগবদ্ভক্তি কল্পলতিকার বীজ ঐ নির্হেতু করুণায় নিহিত আছে। ঐ নির্হেতু ভগবৎকরুণা উদ্রিক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া **ভগবৎপ্রকাশক জ্ঞানময় বিগ্রহ গুরু রূপে** প্রকাশ পান। **ইহার প্রধান ধর্ম্ম বা কার্য্য ভগবানের তত্ত্ব বা জ্ঞানকে প্রকাশ করা। স্বপ্রকাশ ভগবত্তত্ত্ব স্বপ্রকাশরূপিনী ভক্তির দ্বারাই প্রকাশ পায়—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।"** ভাগ্যবান্ জীবের সৎ মহাপুরুষ সঙ্গলাভের ফলে যখন প্রাথমিক গুরু শুশ্রূষা দ্বারা গুরুতত্ত্ব সন্তোষ লাভ করেন সেই সময়ে উক্ত নির্হেতু ভগবৎকরুণায় নিহিত যে ভক্তিলতার বীজ আছে তাহা গুরুসন্তোষরূপ শীতল সেক পাইয়া অঙ্কুরোদ্গমের জন্য স্পন্দিত হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ সম্বিৎ শক্তির কার্য্য ভগবৎ-প্রকাশের নিমিত্ত **ইচ্ছার উদ্গম হয়;** সেই ইচ্ছার প্রবল প্রেরণায় পরিচালিত হইয়া প্রাথমিক শ্রীগুরুসন্তোষের ফল স্বরূপ মন্ত্রদীক্ষা ভগবদুপদেশাদি রূপে ভক্তিলতার বীজ শ্রীগুরুচরণ হইতে ঐ জীবের হৃদয়ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয় এবং অঙ্কুরোদ্গম হইয়া ক্রমশঃ লতার পরম চরম ফল ধারণের অপেক্ষায় অবস্থান করে। তদনন্তর সাধন দ্বারা ক্রমশঃ শ্রীগুরুসন্তোষ এবং নিষ্কপটে শ্রীগুরুশুশ্রূষা দ্বারা তৎপ্রীতিসুধাসিঞ্চনে অতিশীঘ্র অনায়াসেই পরিপুষ্ট ভক্তিলতাজাত পরম ফল আস্বাদনে জীব কৃতার্থ হইতে পারে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে দীক্ষা বা ভগবদুপদেশাদি রূপ ভক্তি লতার বীজ লাভ করিলেই মাত্র যে ফল লাভ হইল তাহা নহে। মুহুর্মুহুঃ শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপালাভের নিমিত্ত সতত গুরুসেবায় রত থাকা চাই। ভগবৎপ্রসাদকামী ব্যক্তির শ্রীগুরুসেবার তুল্য অন্য কোনও শ্রেষ্ঠ সাধন নাই।

গুরুসেবা মোটামুটি ভাবে দুই প্রকার। শ্রীগুরু আনুগত্যে গুরূপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া শ্রীভগবৎ শ্রবণ কীর্ত্তন ভগবদর্চ্চন মন্ত্রজপাদি সাধনে রত হওয়া ইহাও গুরুসেবা। কেন না সদ্গুরু যিনি তিনি শিষ্যের দ্বারা শ্রীভগবৎসাধনে পরম পরিতুষ্টি লাভ করেন। **শ্রীগুরুতত্ত্ব ভগবৎপ্রিয়তত্ত্ব, শ্রীভগবদ্ভক্তি-জ্ঞানে শিষ্যকে উন্নীত করাই সদ্গুরুর ধর্ম্ম।** সুতরাং শিষ্যের

শ্রীভগবদ্ভজনাগ্রহাতিশয্যে সদ্গুরু **প্রসন্নতাই** লাভ করেন। তবে শিষ্যের সতত সাবধান হওয়া উচিত যে যেন শ্রীভগবৎসাধনের **দম্ভে বা ভাণে** গুরু আনুগত্য শিথিল না হইয়া পড়ে। "গুরুর কার্য্য ভগবদুপদেশ করা এবং ভগবৎ সাধনভজন করান, আমি ত সেই সাধনভজন করিতেছি, আর পৃথক্ গুরুর সেবনাদি না করিলেও চলে" ইত্যাদি **অন্তর্নিহিত অকৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে** বাহ্যিক ভগবদ্ভজনের আড়ম্বরে ভগবত্তত্ত্ব প্রসন্ন হন না। সতত ইহা মনে রাখিয়া ভগবদ্ভজনে অগ্রসর হইলে গুরুসেবাই হয়। আর দ্বিতীয় প্রকার গুরুসেবা—সাক্ষাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুকূল্যে নিজ ধন জন দেহ মন আদির দ্বারা নিষ্কপটে শুশ্রূষা করিয়া গুরুর সন্তোষ বিধান করা, স্বতন্ত্র ভগবদ্ভজনের জন্য কোনও স্বাধীন চেষ্টা না করা (৯)। বস্তুতঃ এই প্রকার গুরুসেবায় নিয়োজিত শিষ্যের গুরুসেবার আনুষঙ্গিক **ভগবদ্ভজনও সিদ্ধ হয়,** কেননা **শ্রীগুরুতত্ত্ব ভগবদ্ভজনময় বিগ্রহ,** ভগবদ্ভজনময় গুরুবিগ্রহের সেবা করাই যে **ভগবদ্ভজন**। তাই ভক্তিসন্দর্ভসিদ্ধান্ত—**"তস্মাদন্যদ্ভগবদ্ভজনমপি নাপেক্ষতে।"** এই দ্বিতীয় প্রকার শ্রীগুরুসেবাই সর্ব্ববিধ ভগবৎসাধনের মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠ (১০), তাই শাস্ত্রে জীবের পরম মঙ্গলময় কম্বুনিনাদ উত্থিত হইল—

"যথা সিদ্ধরসস্পর্শাৎ তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্।
সন্নিধানাদ্ গুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ॥"

হা গুরো রাধিকানন্দ! রাধিকানাথবিগ্রহ!
দীনবন্ধো! দয়াসিন্ধো! সেবায়াং মাং নিয়োজয়॥

---

(৯) স্বাধীন বলিতে গুরুর আনুগত্যবিহীন হইয়া স্বাধীন মতে ভজনে দোষ আছে। সাক্ষাৎ গুরুর সেবাকালে সেবাকার্য্য উপেক্ষা করিয়া স্বতন্ত্র ভজন নিষিদ্ধ। ইহাতে গুরুর অধীন হইয়া গুরুর আদেশে যে আহ্নিক পূজাদি তাহার নিষেধ করা হইতেছে না।

(১০) অস্যা শ্চোক্তানামঙ্গানামমুক্তানাঞ্চ কুত্রচিৎ কস্যাপ্যঙ্গস্যাত্র তু তদিতরস্য যন্মহিমাধিক্যং বর্ণ্যতে, তৎ তৎ তচ্ছ্রদ্ধাভেদেন তৎতৎপ্রভাবোল্লাসাপেক্ষয়েতি, ন পরস্পরবিরুদ্ধত্বম্। অধিকারিভেদেন হৌষধাদীনামপি তাদৃশত্বং দৃশ্যতে॥ ইতি ভক্তিসন্দর্ভ, ৩১০ অঃ

"কীর্ত্তনং সাধনশ্রেষ্ঠং"

নামকীর্ত্তনম্

পরম স্নেহাস্পদ—

শ্রীমান্ রাজেন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী, এটর্ণি, কলিকাতা হাইকোর্ট,

জমিদার, বালিয়াটী, ঢাকা।

মদীয় **শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে** অর্পিত **কুসুমাঞ্জলির** এই **নির্ম্মাল্য** আমার স্নেহাশিস্ রূপে আপনাকে প্রদান করিলাম। ইহা আপনার জীবনে পরম কৃতার্থতা সম্পাদন করুক।

শ্রীভাগবতস্বামী।

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥"

সাধনং নামকীর্ত্তনম্। **যাবতীয় সাধনমধ্যে শ্রীভগবন্নামসাধনের মত শ্রেষ্ঠ সাধন আর নাই।** দেশকালদ্রব্যাদি দ্বারা পরিচ্ছেদরহিত, অধিকারানধিকারবিচারবিবর্জ্জিত, জীবমাত্রের পরমহিত, সন্মাত্রের সমাদৃত, অশেষ সাধনগোষ্ঠীমহিত পরমামৃতায়মান নামকীর্ত্তনই বিশেষরূপে জয়যুক্ত হইতেছেন। সাধকের সাধনাবস্থায়, সিদ্ধের সিদ্ধাবস্থায়, যত উৎকর্ষ আছে, তত্তৎ সর্ব্বোৎকর্ষকে আবিষ্কার পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন জয়যুক্ত হইতেছেন।

"চেতোদর্পণমার্জ্জনম্"

সমস্ত সাধনার ফললাভের মূল প্রথম স্তরই চিত্তশুদ্ধি। এই চিত্তশুদ্ধির প্রথম অবস্থা সাধু মহাপুরুষের সঙ্গ। নামকীর্ত্তনাশ্রয়ী ব্যক্তির সৎমহাপুরুষে শ্রদ্ধার উদয় হয়। এমন কি অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম গ্রহণ করিতে থাকিলেও ক্রমশঃ সাধুমহাপুরুষদিগের কৃপায় নামে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। সাধু মহাপুরুষগণ কোথাও সাক্ষাৎভাবে, কোথাও বা অলক্ষিতভাবে, নামগ্রহণকারীর উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন। সাধু মহাপুরুষগণ ভগবন্নামপ্রিয়; কাহারও মুখে ভগবন্নামকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে তাঁহারা অতিশয় আকৃষ্ট হন। এইরূপে সাধু কৃপায় নামে বিশ্বাস যতই দৃঢ় হইতে থাকে ততই আবার সাধু মহাপুরুষের সঙ্গ প্রাপ্তির লালসা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহাই চিত্তশুদ্ধির দ্বিতীয় স্তর। ইহাকেই ভক্তিশাস্ত্রে "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গঃ" বলা হইয়াছে।

এইরূপে সৎকৃপালব্ধ বিশ্বাস ভরে নাম গ্রহণ করিতে করিতে সৎসঙ্গপ্রভাবে চিত্ত ক্রমশঃ নির্ম্মল হইয়া ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানলাভের দিকে এবং ভগবদ্ভজন-সাধনরহস্যাবগতির দিকে ধাবিত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সমাশ্রয়ের কর্ত্তব্যতা জ্ঞানের উদয় হয়। তদনন্তর শ্রীগুরুপাদপদ্ম সমাশ্রয় পূর্ব্বক নাম গ্রহণই চিত্তশুদ্ধির তৃতীয় স্তর। তখন নামগ্রহণকারীর ভগবদ্ভজন-পিপাসা বলবতী হইয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্যসম্বন্ধ জ্ঞানোদয়ের বীজ ফুটিয়া উঠে। তদনন্তর শ্রীগুরূপদিষ্ট সাধুশাস্ত্রসম্মত মার্গ অবলম্বন করিয়া অপরাধ বর্জ্জন পূর্ব্বক নামগ্রহণরূপ ভজন হইতে থাকে। ইহাই চিত্তশুদ্ধির চরম স্তর, ভক্তিশাস্ত্রে এই অবস্থাকে "অথ ভজনক্রিয়া" বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সমাশ্রয় পূর্ব্বক নাম কীর্ত্তন ভক্তি বা ভজন বলিয়া কথিত হয়।

"ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণম্"

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের দ্বিতীয় বিশেষণ "ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং" অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণনামকীর্ত্তন, সংসাররূপ মহাদাবানলকে নির্ব্বাপিত করেন। কামক্রোধাদি রিপুর জ্বালা, ক্ষুৎপিপাসা শোক মোহাদি, মানাপমান লাভালাভ সুখদুঃখাদি দৈহিক মানসিক জ্বালা প্রভৃতি সংসার জ্বালায় নিরন্তর দহ্যমান জীবনিচয় যদি শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রদর্শিত শ্যাম নামাম্বুদের শরণ গ্রহণ করে তাহা হইলে ঐ

নামাম্বুদের স্নিগ্ধামৃতধারায় সিঞ্চিত হইয়া সর্ব্ববিধ তাপ জুড়াইতে পারে। চিত্তশুদ্ধি হওয়ার পর যে নাম সাধন হয় তাহা অমৃতবর্ষণোপম; তখন শ্রীগুরু-কৃপায় সাধকহৃদয়ে নামকীর্ত্তন স্বীয় মাধুর্য্যের ধারা বর্ষণোন্মুখ হইয়া উদয় হন, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।

অহঙ্কারগ্রন্থি শিথিল না হওয়া পর্য্যন্ত সংসারজ্বালার নিবৃত্তি হয় না। শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ী নামসাধনরত সাধকের পরিমার্জ্জিত চিত্তদর্পণে যখন আত্ম-তত্ত্ববোধ ভাসিয়া উঠে তখনই সংসারের মায়িক বন্ধন শিথিল হইতে থাকে। অর্থাৎ শ্রীগুরূপদিষ্ট নাম সাধন করিতে করিতে যখন সাধকের হৃদয়ে জীবের স্বরূপ জাগিয়া উঠিতে থাকে তখন এই প্রাকৃত "অহং মম" ক্রমশঃ শিথিল হইয়া "ভগবতোঽহং" "ভগবানেব মম" "ভগবানেরই আমি" "ভগবান্‌ই আমার" এই তত্ত্বজ্ঞান দৃঢ় হইয়া উঠে। ক্রমশঃ তখন এই পাঞ্চভৌতিক দেহ, প্রকৃতির বিকার এই বুদ্ধি ইন্দ্রিয় মন আদিকে আমি বলিয়া, বা আমার বলিয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃত কোনও পদার্থকে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তখন সাধক জীবের আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ সংসার তাপ নাশ হয়। ইহাকে "ভক্তির কেশঘ্নীত্ব" দশা বলা যায়। অর্থাৎ ভক্তি অঙ্গ সাধন করিতে করিতে যখন অপ্রারব্ধ, কূট, বীজ, এবং প্রারব্ধ, এই কর্ম্মগ্রন্থি চতুষ্টয় বিধ্বস্ত হইতে থাকে তখন তাদৃশী ভক্তিকে "ক্লেশঘ্নী" বলা যায়। প্রারব্ধ বলিতে ফলোন্মুখ কর্ম্মকে বুঝায়, অর্থাৎ ফলদানের নিমিত্ত যে কর্ম্মটি প্রবৃত্ত হইয়াছে। বীজ বলিতে যাহা বাসনারূপে অবস্থান করে। কূট বলিতে বাসনাময় কর্ম্মের পূর্ব্ব অঙ্কুর স্বরূপ। আর অপ্রারব্ধ বলিতে, কূট বীজ এবং প্রারব্ধ কর্ম্মের মূল গ্রন্থি অনাদি অনন্ত সিদ্ধ কর্ম্ম, ইহাই অবিদ্যাগ্রন্থি বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হয়। সাধকের চিত্তবৃত্তি যাবৎ কর্ম্মবিক্ষিপ্ত এবং কর্ম্মফল সুখ দুঃখাদি দ্বারা অভিভূত থাকে তাবৎকাল পর্য্যন্ত "অনর্থ" থাকে। যাবৎ অনর্থ-নিবৃত্তি না হয় তাবৎ নির্ব্বিঘ্ন হওয়া যায় না। এই ভগবন্নামকীর্ত্তনপরায়ণ সাধক যখন "অনর্থশূন্য" হইয়া শ্রীনাম কীর্ত্তনে রত থাকিতে পারেন, ভগবন্নামের মাধুর্য্যাস্বাদন তখন অনুভব করিতে পারেন। তাই নামসাধনরত সাধকের যখন শুদ্ধ আত্মস্বরূপে নামকীর্ত্তন উদয় হন তখনই ভক্তির প্রভাবে কর্ম্মগ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া সুকৃতোত্থ, দুষ্কৃতোত্থ, অপরাধোত্থ, এবং ভজনোত্থ এই চতুর্ব্বিধ

অনর্থও নাশ হয়। তাই শাস্ত্রে "অনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ" বলিয়া সাধকের সাধনের একটি স্তর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই প্রকার অনর্থনিবৃত্তির পরে যখন নাম-সাধন হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণনামের মাধুর্য্যাস্বাদনও সুলভ হইয়া উঠে। এই অনর্থনিবৃত্তি পাঁচ প্রকার,—একদেশী, বহুদেশী, আত্যন্তিকী, প্রায়িকী এবং পূর্ণা। বস্তুতঃ যাবৎ অদভ্রপ্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত নয়নে ভগবদ্দর্শন না হয় তাবৎ অনর্থনিবৃত্তি পূর্ণ রূপে হয় না। বস্তুতঃ প্রথমতঃ নামাশ্রয় ভজনকাল হইতেই সাধকের অনর্থনিবৃত্তি আরম্ভ হয়। কিয়দংশ অনর্থনিবৃত্তি হইতেই নিষ্ঠার আরম্ভ হয়। ভক্তিশাস্ত্রে "অনর্থনিবৃত্তি" নামক সাধনের স্তর এবং "ক্লেশঘ্নী" বলিয়া ভক্তির অবস্থা যাহা বলা হইয়াছে তাহাই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনমাহাত্ম্যে "ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং" পদে নির্দ্দেশ করিলেন। সাধকের এতাদৃশ অবস্থাকে জীবন্মুক্তাবস্থা বলা যায়। তারপর নামসঙ্কীর্ত্তনের আর একটি বিশেষণ বলিতেছেন—

"শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণম্"

এইরূপে অনর্থনিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে নাম সাধনে নিশ্চলা স্থিতি লাভ হয়। তখনই সাধকহৃদয়ে "মঙ্গলং মঙ্গলানাম্" যাবতীয় মঙ্গলের পরম মঙ্গলরূপ কুমুদ স্বয়ংই বিকসিত হইয়া উঠে। তাৎপর্য্য এই যে সাধক যখন নামের কৃপায় মায়িকাভিমানরহিত হইয়া আবির্ভূত শুদ্ধ আত্মস্বরূপে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-নাম সাধনে রত থাকেন, তখন সাধক হৃদয়ের কর্ম্মাদি জনিত ক্লেশরূপ অনর্থনাশ পূর্ব্বক ভগবন্নাম চান্দ্র ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া পরম মঙ্গল কুমুদকে বিকসিত করিয়া তুলেন। "চন্দ্রিকাবিতরণং" বলায় শ্রীকৃষ্ণনামকে চন্দ্ররূপকে রূপিত করা হইল। চন্দ্রের ধর্ম্ম প্রকাশকত্ব, আহ্লাদকত্ব, স্নিগ্ধত্ব। এখানে তাৎপর্য্য এই যে তাদৃশ জীবন্মুক্ত সাধকের প্রাকৃত দেহাদি বিষয়ে আন্তরিক অভিমান কুজ্ঝটিকা না থাকায় নির্ম্মল গগনোপম হৃদয়েই শ্রীকৃষ্ণ নাম প্রথমতঃ চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশ পান। অর্থাৎ "অভিন্নাত্মা নামনামিনো" এই শাস্ত্র বাক্যে নাম এবং নামীকে যে অভিন্নাত্মা বলা হইয়াছে তাহাই প্রথমতঃ প্রকাশ পায়। "কৃষ্ণ" এই অক্ষর দ্বয় সাধক হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া ঐ অক্ষরই যেন দ্বিভুজ মুরলীকর শ্যামসুন্দর রূপই ধারণ করিয়া উঠেন। আবার ধ্যানাদিতে স্ফুরিত শ্যামসুন্দর কৃষ্ণমূর্ত্তি কৃ…ষ্ণ এই অক্ষর রূপ ধারণ করিয়াই জিহ্বায় উদিত হন।

তখন নামের অক্ষরই নামীর রূপগুণলীলাকারে, আবার নামীর রূপগুণ-লীলাই নামাক্ষররূপে সাধক হৃদয়ে সাক্ষাৎ হইয়া সন্তত ক্রীড়া করিতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে নাম চন্দ্র নিজের সুধাধারায় সাধক হৃদয় সতত দ্রবীভূত করিয়া রাখেন, যাহাতে আর সংসারদাবানলার্চ্চিঃ উত্তপ্ত করিতে সক্ষম না হয়, এবং স্বীয় মাধুর্য্যানন্দদানে মোক্ষ মঙ্গল হইতেও পরমোৎকৃষ্ট মঙ্গল কুমুদকেও বিকসিত করিয়া থাকেন। নাম সাধনে নিশ্চলা স্থিতিকেই নিষ্ঠা নামে অভিহিত করা হয়। ভক্তি শাস্ত্রে ভক্তির এতাদৃশী অবস্থাকে "শুভদা" ভক্তি বলা হইয়াছে। এখানে "শ্রেয়ঃকৈরচন্দ্রিকাবিতরণং" বলিয়া ভক্তির শুভদত্ব গুণটি শ্রীকৃষ্ণনামকীর্ত্তনসাধনের অন্তর্ভূত আছে তাহাই দেখান হইল। সাংসারিক ঐহিক সুখদুঃখ মান অপমান অভাব স্বাচ্ছন্দ্য শীতোষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব ধর্ম্ম, পারলৌকিক স্বর্গসুখলালসাদি এবং কৈবল্যলক্ষণ মুক্তিসুখাদি বাসনা জনিত কায়িক বাচিক মানসিক যে বিক্ষোভ সেই বিক্ষোভ রহিত হইয়া সাধনে সতত নিযুক্ত থাকার নামই নিশ্চলা স্থিতি, ইহাই নিষ্ঠা। **এই নিষ্ঠায় অবস্থান করিলে সাধকের মোক্ষানন্দ সুখ উপভোগ হইতে থাকে।** এই আনন্দযুক্ত হৃদয়ে যখন নাম সাধন হইতে থাকে তখন ঐ নিষ্ঠাই গাঢ় হইয়া রুচি নাম ধারণ করে। তাই শাস্ত্রে "ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ" বলা হইয়াছে। রুচি বলিতে অভিলাষকে বুঝায়। এই অবস্থাকেই **"নামে রুচি"** বলা যায়। রুচি দুই প্রকার, একটি বুদ্ধিপূর্ব্বিকা রুচি, আর একটি স্বারসিকী রুচি। নাম সাধনে রুচির স্তর দেখাইয়া বলিতেছেন—

"বিদ্যাবধূজীবনম্"

শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন সাধন "বিদ্যারূপ বধূর জীবন।" "বিদ্যা বেদন-পর্য্যায়ং জ্ঞানম্"—বিদ্যা বলিতে জ্ঞানকে বুঝায়। জ্ঞান দ্বিবিধ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান এবং সবিশেষ ভগবজ্‌জ্ঞান, **"একই অখণ্ড জ্ঞান"** সাধকের সাধন ভেদে নির্ব্বিশেষ সবিশেষ ভেদে সাধক হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। যেমন নিস্তরঙ্গ সিন্ধু আর সতরঙ্গ সিন্ধু। একই জলময় রত্নাকর সমুদ্র তরঙ্গশূন্যাবস্থায় শান্ত গম্ভীর প্রসন্নতাপূর্ণ। আবার ঐ জলময় সমুদ্রের জলেরই বিচিত্র তরঙ্গরঙ্গমালা-মণ্ডিতাবস্থায় সেই শান্ত গম্ভীর প্রসন্নতার নর্ত্তনচাতুরীপূর্ণ সমুদ্র একই। অথবা যেমন নির্ণিমেষ বীক্ষণের তুল্য শুদ্ধ "তত্ত্বম্" পদার্থানুভব রূপ জ্ঞান নির্ব্বিশেষ

জ্ঞান, আর অপাঙ্গ বীক্ষণের তুল্য সরস বিচিত্র ভগবদনুভব রূপ জ্ঞান সবিশেষ জ্ঞান। শাস্ত্রজ্ঞান এই উভয়বিধ জ্ঞানের দ্বার। এই উভয়বিধ জ্ঞানই তুরীয় চিদ্বৃত্তি, এই চিদ্বৃত্তিবিদ্যারূপ বধূর জীবন শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন। এই বিদ্যা যতই সুন্দরী, যতই গুণবতী, যতই পতিসোহাগিনী হউন না কেন, জীবিতাবস্থায়ই সব শোভা পায়, আর জীবনশূন্যদশায় সবই শূন্য প্রায় (পতিসোহাগিনীর জীবনশূন্য মুখে ঐ পতিই আগুন দেয়)। ইহা বিবেচনার বিষয় যে শ্রীভগবন্নামসাধনাদি ভক্তি সাধনই উক্ত উভয়বিধ জ্ঞানের জীবন। তাৎপর্য্যার্থ এই যে সাধনে নিশ্চলা স্থিতি লাভ করিয়া জীবন্মুক্তপদ লাভ করিলে শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তনই জীবন বলিয়া অনুভব হইতে থাকে। জীবন যেমন পরম প্রিয়, ক্ষণকাল জীব জীবনরহিত হইতে পারে না, সেইরূপ নিবৃত্ততৃষ্ণ জীবন্মুক্ত ব্রহ্মভূত সাধক নাম ব্রহ্মানন্দের প্রিয়তা জীবনের তুল্য অনুভব করিয়া থাকেন।

বিদ্যা বলিতে শ্রীভাগবতে বলেন, "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।" যাহা দ্বারা শ্রীভগবৎপাদপদ্মে মতি অর্থাৎ বুদ্ধির নিশ্চলা স্থিতি লাভ হয় তাহাই বিদ্যা— "যয়াক্ষরমধিগম্যতে।" বিদ্যারূপ বধূ তাঁহার পরম জীবনী শক্তির আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সাহায্যে কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতমতি উৎপন্ন করাইয়া সাধককে পরম কৃতার্থতার পথে উন্নয়ন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ নাম সাধনে রুচিকে বর্দ্ধিত করিয়া আসক্তি স্তরে লইয়া যান, তাই শাস্ত্রে "অথাসক্তিঃ" বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের আর একটি বিশেষণ বলিতেছেন—

"আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনম্"

শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন আনন্দসমুদ্রকে বর্দ্ধন করেন। এখানে আনন্দ বলিতে **ভগবৎপ্রেমকেই** লক্ষ্য করা হইল। প্রেমের দুইটি অবস্থা। একটি পূর্ব্বাবস্থা, যাহাকে **ভাব** অথবা **রতি** বলা যায়। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া "আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং" বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্যার্থ এই যে সাধক রুচির স্তরে অবস্থান করিয়া নাম সাধনে যে মোক্ষানন্দ উপভোগ করেন, আসক্তির স্তরে সেই আনন্দ বর্দ্ধিত হইয়া ভাবের স্তরে উপস্থিত হইলে ঐ আনন্দ অপার অনন্ত পারাবার তুল্য হইয়া উঠে। তখন নামও চন্দ্রধর্ম্ম পূর্ণ প্রকাশ করিয়া সেই আনন্দসমুদ্রকে বর্দ্ধন করিতে থাকেন। তখন সাধক পরম কৃতকৃতার্থ হয়।

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥
ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিৎ
হসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥"

তখন ভাবচন্দ্রের উদয়ে আনন্দসমুদ্র এতই বর্দ্ধিত হয় যে সাধক মোক্ষানন্দকেও ক্ষুদ্রবোধে তিরস্কার করিয়া থাকেন। তাই ভক্তিশাস্ত্রে "মোক্ষলঘুতাকৃৎ" ভক্তির একটি অবস্থাকে বর্ণনা করা হইয়াছে। এতাদৃশ ভক্তিবাসিত অবস্থা লাভ করা সাধনসহস্রেও দুর্লভ। তাই এই ভক্তিকে **সুদুর্লভা**ও বলা হইয়াছে।

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধন বলায় এই ভাব বা রতি ভাগ্যবান্ ভক্তিরসিকের হৃদয়ে উদয় হইয়া "রসো বৈ স রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি" এই শ্রুতি বাক্যের সার্থকতা সম্পাদক রসাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

তারপর আর একটি বিশেষণ বলিতেছেন—

"প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্"

উদিত বালভাবচন্দ্রকোমলকররঞ্জিত হৃদয়ে যখন নামসাধন হইতে থাকে, অর্থাৎ এই অবস্থায় যখন সাধক নামকীর্ত্তনে রত থাকেন, তখন নামোচ্চারণে, নামকরণে, প্রতি পদে পদে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। তখনই ভগবৎ রসাস্বাদনটি পূর্ণরূপে হইয়া থাকে। ইহাকেই ভাবের দ্বিতীয় অবস্থা বলা যায়, ইহার নামই **প্রেম**।

এই প্রেমাবস্থাকেই "সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা" বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে নামসাধনে চিত্তের বৃত্তি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী হইয়া উঠে। তাহার ফলেই সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন লাভ হয়। ইহারই সুচনা করিয়া নামকীর্ত্তনের অপর বিশেষণ বলিতেছেন—

"সর্ব্বাত্মস্নপনম্"

তখন ভগবৎ রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দসাগরে সাধকের সর্ব্বেন্দ্রিয় অশেষ বিশেষে আপ্লাবিত হইতে থাকে। এই প্রকারে শ্রীভগবন্নাম সর্ব্বোৎকর্ষেতে বিজয় লাভ করিতেছেন।

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তি স্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

সর্ব্বপ্রকার ভগবৎসাধনের মধ্যে পরম মহৎ সাধন একমাত্র **শ্রীভগবন্নামোচ্চারণ**। এমন নিরঙ্কুশ সাধন আর কিছুই নাই। এই নাম সাধনে দেশনিয়ম, কালনিয়ম, উচ্ছিষ্টাদি শুদ্ধি অশুদ্ধি নিয়মাদির অপেক্ষা পর্য্যন্ত নাই। দ্রব্য, জাতি, গুণ, কর্ম্ম জনিত যতপ্রকার দীনতা বা হীনতার চরম স্তরে মনুষ্য পৌঁছাউক না কেন দীনজন বিষয়ে ভগবানের অপার করুণাময় **সাধন** একমাত্র **ভগবন্নামোচ্চারণই** তাহাদের সর্ব্ববিধ কল্যাণ লাভের পরমোপায়।

একদিন হরিদ্বারের মহাত্মা ৺ভোলানন্দ গিরি মহারাজ তাঁহার একটি শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, **"গুরুসে নাম মিলাতো ভগবান্‌ই মিলগয়ে য়্যাসা বিশোয়াস রাখো।"** উপদেশটি আমার বড়ই মধুর লাগিয়াছিল। যাঁহারা কোনও প্রকার সাধন রহস্য অবগত নহেন, এমন কি সৎসঙ্গ সদ্‌গুরু কৃপালাভও সাক্ষাৎ ভাবে প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারাও এই **সর্ব্বার্থনামচিন্তামণির** আশ্রয়ে অতি অচিরেই কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন। এই **নাম সাধনে স্মরণ ধারণা ধ্যান ধ্রুবানুস্মৃতি অষ্টাঙ্গ যোগাদিরও দুর্ল্লভ ভগবৎসমাধি লাভ অনায়াসে স্বয়ংই সম্পন্ন হয়।** বিশেষতঃ কলিহত সর্ব্বতো দুর্গত জনের পক্ষে একমাত্র **নাম সাধনই পরমোপায়।**

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

যাঁহারা দশবিধ নামাপরাধ বর্জ্জিত হইয়া শ্রীভগবন্নাম সাধন করেন তাঁহারা নামের মুখ্য ফল লাভে পরম কৃতার্থ হয়েন—**"সর্ব্বসিদ্ধি করতলে**

তার।” যাঁহারা অজ্ঞানবশতঃ অপরাধের প্রতি অনুসন্ধান রাখেন না অথচ নাম সাধন করেন, তাঁহারা নামের কৃপায় এবং ক্রমশঃ সৎ মহতের কৃপাবলে অপরাধবর্জ্জিত হইবেন, নামের ফলও লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। আর যাহারা জ্ঞানবলদুর্ব্বিদগ্ধতাবশতঃ নামাপরাধ সঞ্চয় করিয়া নাম সাধন করে, তাহারা নামাপরাধ জনিত দণ্ডভোগের অন্তে বহুকাল নাম সাধন করিতে করিতে নামের কৃপায় এবং সৎ মহতের করুণায় অপরাধশূন্য হইয়া নাম ফল লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

আধুনিক শিক্ষিত অনেকে মনে করেন,—সর্ব্বথা নিরঙ্কুশ নামসাধনে আবার অপরাধের বিচার কেন? অপরাধের বিচার থাকিলে আর নিরঙ্কুশতা কোথায় থাকিল? ইত্যাদি। ইহার সমাধানে ইহাই বলা যায় যে **নামসাধনে নামের সম্যক্ স্বরূপ আবির্ভাবের উপযোগিতাই নামাপরাধবর্জ্জন। নামাপরাধটি নামের স্বরূপাবির্ভাবের আবরণ।** এই অপরাধরূপ আবরণে আবৃত চিত্তে নামের আবির্ভাব সম্যক্ রূপে হয় না। অপরাধগ্রস্ত ব্যক্তির নাম সাধন **নামাভাস মাত্র,** অপরাধীর নাম গ্রহণে যাহা নামের আবির্ভাব তাহা নামের **অসম্যগাবির্ভাব।** যাহার যতটুকু পরিমাণে এই নামাপরাধ বর্জ্জন হইয়া নামসাধন হইবে তাহার হৃদয়ে শ্রীনামের আবির্ভাবও তত পরিমাণে **সম্যক্** হইবে। ইহাতে নামের নিরঙ্কুশতার হানি হয় না। যেমন মনে করুন, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্য সদা সর্ব্বত্র অনুস্যূত থাকিলেও মায়াবৃত চিত্তে স্বপ্রকাশতা প্রকাশ পায় না, ইহাতে যেমন ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতার হানি হয় না, সেইরূপ নামাপরাধযুক্ত চিত্তে নামের স্বরূপ সম্যক্ প্রকাশিত না হইলেও নামের স্বপ্রকাশতা বা নিরঙ্কুশতার হানি হয় না। তাই নাম সাধন বিষয়ে শাস্ত্রে নামাপরাধ বর্জ্জনের ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ করিয়াছেন। নামাপরাধ প্রধানতঃ দশবিধ বলিয়াই শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, যথাঃ—

১। **সৎ মহাপুরুষ ভগবদ্ভক্তজনের নিন্দা প্রথম অপরাধ।** “সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে। যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহেত তদ্বিগর্হাম্॥” পদ্মপুরাণে ভগবদ্ভক্ত সাধু মহাপুরুষের নিন্দাকে **পরম অপরাধ** বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। নামসাধনপরায়ণ ব্যক্তি এই নিন্দারূপ ভয়ঙ্কর অপরাধ হইতে অতিশয় সাবধান হইবেন। সাধুমহাপুরুষের কদাচিৎ অস্মদাদির বুদ্ধি

বিচারের অন্তর্গত আপাততঃ দৃষ্টিতে দোষবৎ কার্য্য দেখিলেও তাহার প্রতিকূল ভাবে তীব্র সমালোচনা করিবে না; ঐ প্রকার তীব্র প্রতিকূল সমালোচনা করার নামই নিন্দা করা। অনেকে মনে করেন, "স্বরূপ কথনে দোষ নাই", অর্থাৎ যদি কেহ নিন্দনীয় কার্য্য করে, সেই নিন্দনীয় কার্য্যের যথাবৎ অনুভাষণ করিলে নিন্দা করা হয় না, কেননা উহা সত্য কথাই বলা হইয়াছে, উহাকে "স্বরূপ কথন" বলা যায়, ঐ প্রকার স্বরূপ কথনে দোষ নাই, ইত্যাদি। এই প্রকার ধারণা ভ্রমগ্রস্তা; ইহা সত্য নহে। কেননা **নিন্দা** শব্দের অর্থ **দোষকীর্ত্তন**, "নিন্দনং দোষকীর্ত্তনম্" (শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কঃ প্রথমাধ্যায়ের টীকা, শ্রীস্বামী)। "যদধর্ম্মকৃতং স্থানং **সূচকস্যাপি** তদ্‌ভবেৎ" (শ্রীমদ্ভাগবত, ১ স্কঃ, ১৭ অঃ)। সুতরাং দোষকীর্ত্তনের নামই **নিন্দা**। এই নিন্দারূপ মহাপাপ হইতে নিস্তার লাভ করিয়া যাঁহারা নাম সাধন করেন তাঁহারাই শ্রীশ্রীনামের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন। সাধু ব্যক্তির **গর্হাকারীকে** নাম কৃপা করেন না। কেননা শ্রীভগবন্নামের মহিমা সাধু-মুখেই আমরা শুনিতে পাই, এমন কি সাধু পরম্পরায়ই জগতে আমরা ভগবন্নামের উদ্দেশ পাইয়াছি। যে ভগবদ্ভক্ত সাধু মহাপুরুষদিগের নিকট হইতে নামের উদ্দেশ আমরা পাইলাম, যাঁহারা কৃপাপরবশ হইয়া এই নাম চিন্তামণি আমাদিগকে দান করিলেন, যাঁহাদের দ্বার দিয়া জগতে নামের প্রকাশ হইল, আমরা নামাশ্রয় করিয়া যদি নামদাতা সেই সাধু ভগবদ্ভক্তদিগের গর্হা করি, তাহা হইলে নাম তাহা সহ্য করিবেন কেন? শ্রীনাম এতাদৃশ দৌর্জ্জন্য কখনই সহ্য করেন না। তাই শাস্ত্রে **সাধুনিন্দাকে মহা নামাপরাধ** বলা হইয়াছে। মহদন্তঃকরণ যাঁহাদের তাঁহারা **নিন্দাকে মহাপাপই** বলেন। নিন্দা সম পাপ নাই। এই নিন্দা বর্জ্জন করিয়া নামাশ্রয় করুন, পরমকৃতার্থতা লাভ করিবেন।

"অনিন্দুক হইয়া সকৃৎ কৃষ্ণ বোলে।
অবশ্য অবশ্য কৃষ্ণ তারে তারিবেন হেলে॥
নিন্দায় নাহিক কায সবে মাত্র পাপ।
অতএব নিন্দা নাহি করেন মহা মহা ভাগ॥"

২। **দ্বিতীয় নামাপরাধ—"শিবস্য শ্রীবিষ্ণো র্য ইহ গুণনামাদিক-**

মলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ।” সর্ব্বাত্মক পরম ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবের গুণনাম প্রভৃতি ভিন্ন দেখিলে অর্থাৎ বিষ্ণুশক্তি ভিন্ন শক্ত্যন্তর সিদ্ধ বলিয়া মনে করিলে নামাপরাধ হয়। (ভগবান্ শঙ্কর শ্রীবিষ্ণুরই গুণাবতার, স্বতন্ত্র শক্ত্যন্তর সিদ্ধ নহেন)।

৩। **“গুরোরবজ্ঞা” তৃতীয় নামাপরাধ।** শ্রীগুরুর অবজ্ঞা প্রধানতঃ গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি হইতেই উৎপন্ন হয়। সাক্ষাদ্‌ভগবদ্বুদ্ধি করিয়া সৎ মহাপুরুষের আচরিত শ্রীগুরুপাদের পরিচর্য্যা এবং সৎশাস্ত্রানুমোদিত শ্রীগুরুতত্ত্বানুশীলনের অভাবেই শ্রীগুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি অতর্কিত ভাবে হৃদয়ে উদয় হইয়া সাধককে **অতি ভয়ঙ্কর অপরাধে** নিমজ্জিত করায়।

শ্রীগুরুর ধ্যান ধারণা পূজাদি এবং “গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ” ইত্যাদি পাঠ করিয়াও সহজে শ্রীগুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি জনিত ব্যবহার লোপ পায় না। গুরুকে যাঁহারা কেবল শিক্ষাদাতা আদর্শ পুরুষ জ্ঞানে গুরুমতের আনুগত্য স্বীকার করেন তাঁহাদের পদে পদে গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধির উদয়ের অবকাশ প্রবল থাকে। গুরু শুধু শিক্ষাদাতা আদর্শ পুরুষ নহেন। **শ্রীভগবানের কারুণ্যঘন জ্ঞানময় বিগ্রহই শ্রীগুরু। শ্রীভগবানের প্রকাশ স্থান শ্রীগুরু বিগ্রহ।** পৃথক্ পৃথক্ ব্যষ্টি গুরুর মূল কেন্দ্র স্থানীয় **সমষ্টি গুরু** সকলের এক। ব্যষ্টিভাবে যার যার গুরু বিগ্রহ পৃথক্ পৃথক্ হইলেও সেই মূল এক সমষ্টি গুরু হইতে **গুরুত্ব ধর্ম্ম, গুরুশক্তি** বিকীর্ণ হইয়া ভগবজ্‌জ্ঞানভক্তিময় বপুঃ ধারণ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ব্যষ্টি গুরুরূপে প্রকট হইতেছেন। “য এব ভগবান্ অত্র ব্যষ্টিরূপতয়া ভক্তাবতারত্বেন শ্রীগুরুরূপো বর্ত্ততে” স এব তত্র সমষ্টিরূপতয়া স্ববামপ্রদেশে সাক্ষাদবতারত্বেনাপি তদ্রূপো বর্ত্ততে ইতি শ্রীজীবপাদাঃ। এই শ্রীগুরুতত্ত্ব দৃঢ়তার সহিত ধারণ করিয়া শ্রীগুরুসেবা করিতে পারিলেই গুরুর অবজ্ঞা রূপ অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া শ্রীনামসাধনে কৃতার্থ হওয়া যায়।

৪। **“শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনম্” চতুর্থ নামাপরাধ,** যেমন সৎশাস্ত্রবিগর্হিত পাষণ্ডমার্গাবলম্বন দ্বারা দত্তাত্রেয় ঋষভাদি উপাসকগণ বেদাদি শাস্ত্র নিন্দা করে, যেমন বৌদ্ধচার্ব্বাকাদি মত অবলম্বন পূর্ব্বক তদনুবর্ত্তিগণ

"ত্রয়স্তে বেদকর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ" ইত্যাদি রূপে আর্যশাস্ত্রের অবমাননা করে; ইহার নামই শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দন।

৫।৬। **পঞ্চম ও ষষ্ঠ নামাপরাধ—"অথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।"** শ্রীহরিনামের মহিমা শ্রবণ করিয়া, যেমন মনে করুন "সাঙ্কেতিকভাবে বা পরিহাসচ্ছলেও শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ করিলেও অশেষবিধ পাপ নাশ হয়" এই শাস্ত্র বাক্য শ্রবণ করিয়া, উক্ত নামমহিমা সত্য নহে, কেবলমাত্র নামে শ্রদ্ধা বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্তই শাস্ত্রে ঐ প্রকার নামের মহিমা স্তুতি করা হইয়াছে, ইত্যাদি চিন্তা করাই **পঞ্চম অপরাধ—নামে অর্থবাদ।** সঙ্গে সঙ্গে নামের মহিমাকে লঘু করিবার জন্য অন্য যুক্তি তর্কাদির চিন্তন করা **ষষ্ঠ অপরাধ,—হরিনামে কল্পন।**

৭। **নামবলে পাপে প্রবৃত্তি সপ্তম অপরাধ।** "নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈ র্হি শুদ্ধিঃ।" শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ করিলে সমস্ত পাপ নাশ হয়, ইহা শাস্ত্রের বাক্য। আমি পাপকর্ম্ম করিব, তারপর একবার নামোচ্চারণ করিলেই ত পাপ নাশ পাইবে। এইরূপ বুদ্ধিতে যে পাপ-কর্ম্মে অগ্রসর হওয়া তাহাই সপ্তম অপরাধ—নামবলে পাপে প্রবৃত্তি। যদিও নামবলে কৃতপাপের ক্ষয় সত্যই হয় তথাপি যে নাম অশেষবিধ পাপ নাশ করিয়া পরম পুরুষার্থ স্বরূপ সচ্চিদানন্দসান্দ্র সাক্ষাদ্‌ভগবচ্চরণারবিন্দকে পর্য্যন্ত লাভ করান, সেই পরম মহত্তম শ্রীভগবন্নামকে পরম ঘৃণ্য পাপ কার্য্যের নিমিত্ত নিয়োগ করা **পরম দৌরাত্ম্যই।** এই প্রকার দৌরাত্ম্যভাব পোষণ করিয়া নাম গ্রহণ করা নামের সাধন করা নহে, **ইহা নামের প্রতি কদর্থন করা।** এইরূপে শ্রীনামকে কদর্থিত করায় কোটি কোটি পাপ অপেক্ষাও ভয়ানক নামা-পরাধ সৃজন করাই হয়।

৮। **অষ্টম নামাপরাধ—"ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্ব্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।"** অর্থাৎ সাধারণ পুণ্য কার্য্য ব্রত নিয়ম দান হোমাদির সহিত নামের সমতা বোধ করা, অর্থাৎ শ্রীনাম গ্রহণকেও সাধারণ পুণ্য কর্ম্মের সহিত তুল্য বোধ করা অষ্টম নামাপরাধ।

৯। **নবম অপরাধ—"অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ।"** নামে শ্রদ্ধাহীন জনে নামোপদেশ নবম অপরাধ।

১০। দশম অপরাধ—"শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতো নরঃ। অহংমমাদিপরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ।" শ্রীভগবানের নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও "অহং মম" অভিমানের প্রাবল্যে নামে প্রীতিযুক্ত না হওয়া দশম অপরাধ।

যাঁহারা শ্রীনাম সাধনের আশু পরম ফল লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে বাঞ্ছা পোষণ করেন তাঁহারা সতত সতর্কতার সহিত এই দশবিধ অপরাধ বর্জ্জিত হইয়া নাম সাধন করুন, অচিরেই নামের মুখ্য ফল শ্রীভগবৎপ্রীতি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। শ্রীনামসাধনপ্রয়াসী জন স্মরণ করুন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

"গোপীভাবঃ প্রয়োজনম্"

গোপীভাবঃ

পরম স্নেহাস্পদ—

শ্রীমান্ হেমেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, জমিদার,

মহেড়া, টাঙ্গাইল।

মদীয় **শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে** অর্পিত **কুসুমাঞ্জলির** এই **নির্ম্মাল্য** আমার স্নেহাশিস্ রূপে আপনাকে প্রদান করিলাম। ইহা আপনাকে পরম সৌভাগ্য প্রদান করুক।

শ্রীভাগবতস্বামী।

গোপীভাব বুঝিতে হইলে আত্মপরমাত্ম তত্ত্বের কিছু অনুশীলন থাকা চাই। আত্মা বলিতে চেতন অর্থাৎ প্রকাশস্বভাব জীবাত্মা, আর পরমাত্মা বলিতে ঐ জীবাত্মারও পরমাশ্রয় নিরপেক্ষ স্বপ্রকাশ চৈতন্যকে বুঝায়। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার নিত্যসম্বন্ধের যথার্থ্য জ্ঞানই শাস্ত্রে সম্বন্ধ জ্ঞান নামে কথিত হয় এবং সেই সম্বন্ধানুকূল কায়িক বাচিক মানসিক চেষ্টাই অভিধেয় বা সাধন, আর তাদৃশ সম্বন্ধ জ্ঞান এবং সাধনের ফল স্বরূপ যাহা তাহাই প্রয়োজন বলিয়া কথিত হয়। সংক্ষেপে ইহার পরিচয় দিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে প্রথমতঃ জীবাত্মজ্ঞানের দুইটি ধারা। তার মধ্যে একটি ধারা জীবাত্মতত্ত্বকে চেতন দ্রব্য রূপে গ্রহণ করা। কিন্তু দ্রব্য রূপে গ্রহণ করিলেও ইহা তার্কিকদিগের সম্মত, "আত্মা দ্বিবিধঃ, জীবঃ পরমশ্চেতি," এই প্রকার দুইটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দ্রব্য তত্ত্ব নহে। এক পরমাত্মাই পরম

স্বতন্ত্র, জীবাত্মাদি সমস্তই পরমাত্মার অধীন, জীব তত্ত্বটি দ্রব্যতত্ত্ব হইলেও পরমাত্মদ্রব্যেরই একদেশী উপসর্জ্জনীভূত অংশ স্বরূপ। "মমৈবাংশো জীবলোকে" ইত্যাদি। চিদংশে জীবাত্মপরমাত্মার অভেদজ্ঞানে অংশে অংশীর একদেশিত্বরূপে অনুপ্রবেশ থাকায় "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যের সমানাধিকরণ্য সম্ভব হয়। প্রচুর প্রকাশ সূর্য্য সন্নিকটে যেমন ক্ষুদ্রপ্রকাশ দীপাদির স্বাধীন প্রকাশ ব্যক্ত হইতে পারে না, প্রত্যুত দীপের নিজের প্রকাশটি যেমন সূর্য্যপ্রকাশের অন্তর্ভূর্ত হইয়াই অবস্থিতি লাভ করে, সেইরূপ শুদ্ধ আত্মতত্ত্বজ্ঞানপ্রধান সাধকের সিদ্ধাবস্থায় মায়ানির্ম্মুক্ত জীবাত্মা শুদ্ধ অনুভূতি স্বরূপে মাত্র অবস্থিতি লাভ করিয়া পরম স্বপ্রকাশ পরমাত্মচৈতন্যসান্নিধ্যে নিজ স্বরূপকে স্বাধীনরূপে প্রকাশ করিতে পারে না, প্রত্যুত পরমাত্মপ্রকাশান্তর্ভূর্তত্বরূপে চিদংশে ঐক্য প্রাপ্ত হয়। ইহাকেই সাযুজ্য বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ বলা যায়। ইহাই অভেদজ্ঞানসিদ্ধান্ত-মহামহীরুহের সুক্ষ্মবীজ স্বরূপ।

তার মধ্যে আবার যাঁহারা জীবাত্মতত্ত্বকে পরমাত্মার অংশ চিদ্দ্রব্যরূপে জ্ঞানলাভ করিয়াও ভক্তিপ্রধান সাধন বলে পরমাত্মায়ত্তবৃত্তিকতা, তদংশত্বহেতু তৎশেষতা তদ্দাসতা প্রভৃতি বিশেষ ভাব উপলব্ধি করেন, তাঁহারা সেই সেই ভাবানুযায়ী সিদ্ধ দশায় সাধনোচিত পদ সার্ষ্টি, সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ করেন। এই চতুর্ব্বিধ মুক্তির মধ্যেও আবার দুইটি বিভাগ আছে, একটি ঐশ্বর্য্যোত্তরা, অন্যটি সেবোত্তরা; তাৎপর্য্য এই যে যে ভক্তিসাধনে জীবাত্মজ্ঞানে শুদ্ধ ভগবদ্দাসত্বটি প্রবল হইয়া ভগবৎসেবাপ্রিয়তায় ব্যাকুল হইয়া উঠে, তাদৃশ ভক্তিসাধন ফলে সেবোত্তরা সালোক্যাদি মুক্তি লাভ হয়, আর যে আত্মজ্ঞানে তাদৃশ দাসত্ব ভাবটি প্রবল না হইয়া কেবল তদীয়তা জ্ঞানে ভক্তির সাধন মাত্র প্রবল থাকে, সেবাপ্রিয়তা প্রবল হয় না, তাদৃশ ভক্তিসাধনে ঐশ্বর্য্যোত্তরা চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। ভেদবাদের অপূর্ব্ব সৌধের মূল ভিত্তি এই সিদ্ধান্তের উপরই ন্যস্ত হইয়াছে।

এখন দ্বিতীয় ধারার কথা বলি। এই দ্বিতীয় ধারানুসারে জীবাত্মতত্ত্বটি শক্তিপদার্থরূপে ভাসমান হয়। বিচার করিলে দেখা যায় জীবাত্মতত্ত্বটি

শক্তিতত্ত্ব, ইহাকে জীবশক্তি বলা যায়। এই জীবনাম্নী শক্তিটি চিদ্রূপা হইয়াও তটস্থা, অর্থাৎ অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তি, এই দ্বিবিধ ভগবৎ শক্তির মধ্যবর্ত্তী শক্তিবিশেষ। শক্তি প্রকৃতি, ভোগ্যতত্ত্ব। কাহার ভোগ্য? যাহার প্রকৃতি তাহারই ভোগ্য। জীব পরমাত্মার শক্তি, সুতরাং জীবমাত্রেই তত্ত্বতঃ পরমাত্মারই ভোগ্য। এই মূল তাত্ত্বিক সম্বন্ধজ্ঞান বিস্মৃত হওয়া বশতঃ মায়াশক্তির গুণে রঞ্জিত হইয়া নিজে ভোক্তৃত্বাভিমানে জড়প্রকৃতির বিকৃতীভূত জাগতিক স্ত্রীপুত্রাদি দেহগেহাদি ভোগে আসক্ত হইয়া জীব অনাদি সংসার দুঃখে নিপীড়িত হইতেছে। যদি কোনও সৌভাগ্যে সাধুগুরু-করুণায় জীবের প্রকৃত স্বরূপজ্ঞানের উদয় হয় তাহা হইলে বিপরীত মায়িক কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের অভিমান নষ্ট হইয়া আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হয়। কিন্তু এখানে ভাবিবার বিষয় এই যে কেবল মাত্র আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই জীবের মুখ্য পুরুষার্থ নহে, কারণ কেবল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি পূর্ব্বকথিত অভেদ জ্ঞানেও সম্পন্ন হইতে পারে; আর যদি আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি এবং যৎকিঞ্চিৎ সামান্য পরমানন্দ প্রাপ্তিকেই পুরুষার্থ বলা যায় তাহা হইলেও সামান্য ভগবৎ-প্রেমে পূর্ব্বকথিত সার্ষ্টি আদি চতুর্ব্বিধ মুক্তির কোন একটি লাভে তাদৃশ পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে। সুতরাং দ্বিতীয় ধারা জীবতত্ত্বকে শ্রীভগবানের শক্তিতত্ত্ব রূপে অবগত হওয়ার বিশেষ কোন সার্থকতা থাকে না। অথচ শাস্ত্রে জীবাত্মতত্ত্বকে প্রকৃতি (শক্তি) তত্ত্ব রূপে জানিবার উপদেশ সুস্পষ্ট দেখা যায়।

"অপরেয়মিত **স্ত্বন্যাং প্রকৃতিং** বিদ্ধি মে **পরাং**।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥" শ্রীগীতা।
"বিষ্ণোঃ শক্তিঃ পরা পোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥" শ্রীবিষ্ণুপুরাণ।

শ্রীগীতায় "বিদ্ধি" এই ক্রিয়াপদে "লোট্" বিভক্তির প্রয়োগে জীবতত্ত্বকে শক্তিতত্ত্ব বলিয়া অনুজ্ঞা বিধিই পাওয়া যাইতেছে। এখানে একটি সন্দেহ আসিতে পারে, জীবাত্মতত্ত্বকে "দ্রব্য" এবং "শক্তি" বলা হইতেছে, কোন্‌টি সত্যদর্শন? উত্তর—দুইটিই সত্যদর্শন; জীবশক্তিটি চিৎশক্তি, সুতরাং চিদংশপ্রধান যে অনুভব তাহা দ্রব্যরূপ, আর শক্তি অংশ প্রধান যে অনুভব তাহা প্রকৃতি

বা শক্তিরূপ। যেমন মায়ার অবিদ্যাংশ শক্তিরূপ, ঐ মায়ারই আবার মহদহঙ্কারাদি প্রাধানিকগণ দ্রব্যরূপ তদ্বৎ।

এখন দেখুন যাঁহারা শাস্ত্রানুগত সাধন বলে জীবতত্ত্বকে শক্তিতত্ত্বরূপে অনুভব করেন তাঁহারা সর্ব্বশক্তির পরমাশ্রয় এবং সর্ব্ব কর্ত্তা ভোক্তা নিয়ন্তার পরমাশ্রয় শ্রীভগবানে শক্তি স্বরূপ নিজ আত্মাকে তাঁহারই ভোগ্যরূপে নিবেদন করিয়াই পরমপুরুষার্থ লাভ করেন।

জীবাত্মাকে নিরুপাধি পরমপ্রীত্যাস্পদ মূল পরমাত্মা স্বয়ং ভগবানের ভোগোপযোগী করিবার **আদর্শ** কোথায়? তাহার যোগ্য **সাধন** কি? কি প্রকারে এই অনাদি অবিদ্যাগ্রস্ত প্রাকৃত কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি বিপরীত স্বভাবে অনুরক্ত স্বস্বরূপবিস্মৃত জীবকে ভগবদ্‌ভোগাধিকারী করা যাইবে?

বিচার করুন, শ্রীভগবত্তত্ত্ব শুদ্ধ স্বরূপশক্তিতেই মাত্র সাক্ষাৎ রমণ করেন— "স্বধামনি ব্রহ্মণি রংস্যতে নমঃ।" স্বরূপ শক্তিতেই শ্রীভগবানের ভোগবৈচিত্রী, অন্য জীবশক্তি বা মায়াশক্তিতে তাঁহার ভোগ নাই; জীবশক্তি তটস্থাখ্যা, মায়াশক্তি বহিরঙ্গাখ্যা, ইহারা ভগবৎ স্বরূপশক্তি নহে। স্বরূপশক্তি শ্রীভগবানের আত্মা হইতে অভিন্ন এবং তাহাতেই তাঁহার ভোগবৈচিত্রী, তাই তিনি আত্মারাম। ভগবৎস্বরূপশক্তির পরম মধুর সুকোমল বৃত্তির বিলাসসার প্রীতি, এই প্রীতিতেই ভগবানের ভোগবৈচিত্রী। তাই জীবপ্রকৃতিকে শুদ্ধ করিয়া স্বরূপ শক্তির বিলাসানুগৃহীতা করিয়া প্রীতিমসৃণা করিতে পারিলেই সাক্ষাৎ প্রীতিস্বরূপ ভগবানের ভোগের যোগ্য হইতে পারে। তখন সেই জীবপ্রকৃতিতে পরমাত্মা আত্মারাম হইয়াও রমণ করেন, তখন জীবপ্রকৃতি নিজপতিকে লাভ করিয়া নিজের সর্ব্বস্ব দিয়া পতিসেবায় কৃতকৃতার্থ হয়।

এ স্থলে আরও বিচার করুন যে ভগবানের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানসাধনে যে জীবতত্ত্বজ্ঞান উদ্ভাসিত হয় তাহার ফল যে ব্রহ্মে জীবের মিলন তাহা কেবল চিদংশে সাযুজ্য মাত্র। ইহাতে শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বিচিত্রতা বা জীবে ভগবৎ স্বরূপশক্তির মসৃণতা প্রকাশ পায় না। সুতরাং ভগবান্ এবং জীবের ভোক্তৃভোগ্য ইত্যাদি আস্বাদন তথায় নাই। ভগবানের সর্ব্বজীবনিয়ন্তৃলক্ষণ কর্ম্মফলপ্রদ পরমাত্মজ্ঞানে যে সাধন তাহার ফল যে পরমাত্মা জীবাত্মার মিলন তাহাও শুদ্ধ চিদাত্মমিলন, ইহাতেও বিচিত্রতার প্রকাশ নাই। আবার

ভগবানের চিদংশ ভগবানেরই অধীন দাস রূপে জীবাত্মজ্ঞানে যে জাতীয় সাধন করা যায় তাহার ফলে যে ভগবৎপ্রেমবৈচিত্রীলাভ তাহাও সম্যক্ নহে, নিঃসঙ্কোচ পূর্ণ মিলন নহে। **জীবাত্মার পরমাত্মাতে সম্যক্ পূর্ণ পরমানন্দের মিলন শক্তিশক্তিমান্ রূপেই সম্পন্ন হয়।**

পরমানন্দঘন স্বয়ং পরমাত্মবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র; তাঁহাতে বিশুদ্ধ পরমানন্দের মিলন লাভই জীবশক্তির চরম পরম পুরুষার্থ। এই পুরুষার্থ লাভের **আদর্শ একমাত্র গোপীভাব।** শ্রীভগবানের চিদানন্দরসপ্রতিভাবিতা হ্লাদিনী-শক্তিসার মহাভাব মূর্ত্তিমতী নিজবিলাসরূপা গোপীকার **ভাবে** যদি সাধক নিজ জীবাত্মাকে ভাবিত করিতে পারেন তাহা হইলেই এই অপূর্ব্ব চমৎকারময় শক্তি শক্তিমানের মিলন সম্পন্ন হইতে পারে।

পারমহংস্য সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপদেশ **গোপীভাব। গোপীভাবে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিই মহাপারমহংস্যের চরম গতি।** গোপীর পারমহংস্য কর্ম্মসন্ন্যাস ব্রহ্মতন্ময়জ্ঞান পরমাত্মযোগ ও ভগবৎ-প্রেমের অপূর্ব্ব মিলন। এই কর্ম্মসন্ন্যাস শুষ্ক বৈরাগ্য নহে; কৃষ্ণসুখকামনাসুধা-সলিলে অবগাহমানা গোপীর কর্ম্মসন্ন্যাস কেবল কৃষ্ণসুখ ভিন্ন সর্ব্বত্র নিষ্কামতা। কৃষ্ণসুখলালসায় উন্মাদিনী তাঁহারা যুক্ত বা অযুক্ত ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম লোক বা বেদ স্ব বা পর কোন কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া স্বভাবতঃ প্রিয়তমের সুখের জন্য কায়িক বাচিক মানসিক সর্ব্ববিধ কর্ম্ম করেন। কৃষ্ণসুখের জন্য তাঁহারা সর্ব্ববিধ ভোগতৎপরা হইয়াও সর্ব্বত্যাগিনী। কৃষ্ণ ভিন্ন নিজ আত্মা আত্মীয় ধন জ্ঞাতি স্নেহ পাশ মুক্ত পরম সন্ন্যাসিনী।

> "লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম।
> লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহ সুখ, আত্মসুখমর্ম্ম॥
> দুস্ত্যাজ্য আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
> স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
> সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
> কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম সেবন॥
> আত্মসুখদুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
> কৃষ্ণসুখহেতু করে সব ব্যবহার॥

কৃষ্ণ লাগি আর সব করি' পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ।"

গোপী যাহা সুন্দর বোধ করেন তাহা তাঁহাদের শ্যামসুন্দরকেই অগ্রে করিয়া, শ্যামসুন্দরকেই মধ্যে রাখিয়া, শ্যামসুন্দরকেই সকল সুন্দরের অন্তে পর্য্যবসিত করিয়া। গোপী যে দ্রব্যটিকে সুন্দর বলিয়া বোধ করেন তাহা শ্যামসুন্দরের জন্যই; গোপী যে গুণটিকে মধুর বলিয়া ভালবাসেন তাহা শ্যামসুন্দরের জন্যই; গোপী যে ক্রিয়াটিতে আসক্তি প্রকাশ করেন তাহা তাঁহাদের শ্যামসুন্দরের জন্যই; সর্ব্বদ্রব্যে সর্ব্বগুণে সর্ব্বকর্ম্মে গোপীর কোটি কোটি প্রাণ পরার্দ্ধ হইতেও অধিক আসক্তি মমতা কেবল মাত্র কৃষ্ণসুখের জন্য। আর কৃষ্ণ ভিন্ন দেহ মন প্রাণ আত্মীয় গৃহ পরিবার এমন কি আত্মা পর্য্যন্তও তাঁহারা শূন্য বোধ করেন। **এই অপূর্ব্ব কর্ম্মসন্ন্যাস বৈরাগ্যের চরম আদর্শ একমাত্র গোপীভাব।**

আহা মরি মরি, কি কৃষ্ণতন্ময়তা! "পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন। মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥" "কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে। এই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে॥" ইহা কেবল জ্ঞানতন্ময়তা নহে। কোটি কোটি জ্ঞানের পরমদুর্ল্লভ প্রিয়তন্ময়তা। সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে এইরূপ প্রিয়তন্ময়তার পরাকাষ্ঠা একমাত্র গোপীপ্রেমেই সম্ভব, অন্যত্র নহে।

কিন্তু জীবের স্বভাব তাহার বিপরীত। জীব প্রথমে যাহা সুন্দর বোধ করে তাহা তাহার সঙ্কীর্ণ নিজ ভোগলালসা পূর্ত্তির জন্যই। জীব অপূর্ণ, ভগবদ্বহির্মুখতা দোষে কেবল নিজেরই "চাই চাই খাই খাই" দুষ্ট স্বভাবে পূর্ণ। জীব এই মায়াগ্রস্ত "চাই চাই খাই খাই" মায়িক পদার্থ দ্বারা পূর্ণ করিতে নিরন্তর লালায়িত। তাই জগতে যাহা সুন্দর দেখে তাহা নিজেরই অতৃপ্ত "খাই খাই" ভাবের আহুতির যোগ্য যখন যাহা মনে করে তখন তাহাকেই সুন্দর বলিয়া বোধ করে। আবার দুদিন পরে সেই "খাই খাই" যখন অন্য আকার ধারণ করে তখন ঐ সুন্দর আবার অসুন্দর হইয়া উঠে। এইপ্রকারে নিজেন্দ্রিয়সুখলালসাতৎপর জীব ক্ষুদ্র স্বার্থমূলক কামপঙ্কে হাবুডুবু খাইয়া মরিতেছে। এই কামের নিবৃত্তি নাই। এই কামের নিবৃত্তির পরম উপায় **ভগবৎপ্রেম।** এই ভগবৎপ্রেমের চরম আদর্শ গোপীভাব দর্পণ।

ভাব কাহাকে বলে? মনের অবস্থা বিশেষকে ভাব বলা যায়। ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ প্রাপ্ত বিষয়ের বা মানসিক চিন্তনাদি দ্বারা স্মৃত বিষয়ের সহিত তন্ময়বৃত্তি মনের যে অবস্থা তাহাকেই সামান্যরূপে ভাব বলা যায়। অর্থাৎ বিষয়াকারে আকারিত হইয়া মনটি যখন দ্রবাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং সেই সেই বিষয় ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ের জ্ঞান রহিত হইয়া একাগ্রতা প্রাপ্ত হয় তখন মনের সেই অবস্থাকে ভাব বলা যায়। মনটি জতুর তুল্য স্বভাবতঃই কঠিন, কিন্তু বিষয়ের যোগে অগ্নি আদির তাপে গলিত জতুর সদৃশ মনও গলিত হয়। এই গলিত মনে বিষয়টি আহিত হইয়া বিষয়ে মনে একাকারতুল্য একটি মনের অবস্থা হয়, যাহাকে আমরা একাগ্রতা বলিয়া থাকি। মনের এতাদৃশ একাগ্রতাবস্থায় বেদ্যান্তর বোধ থাকে না। **এই বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য বিষয়াকারাকারিত মনোবৃত্তিই ভাব বলিয়া কথিত হয়।** ভাবশূন্য মনে কোনও বিষয় অনুভূত হয় না।

এই ভাব দ্বিবিধ, বিষয়ের প্রতি আনুকূল্যাত্মক, আর বিষয়ের প্রতি প্রাতিকূল্যাত্মক। **বিষয়ের প্রতি আনুকূল্যাত্মক মানসিক ভাবই একমাত্র বিষয়ের মাধুর্য্যাস্বাদনের কারণ।** মনে আনুকূল্যস্পৃহা না থাকিলে অনুভূত বিষয়ের মাধুর্য্যাদি আস্বাদিত হইতে পারে না। বিষয়ের মাধুর্য্যাদি আস্বাদন নাই যে অনুভবে তাদৃশ অনুভবও অপুরুষার্থ প্রায়। প্রাকৃত জাগতিক বিষয় সম্বন্ধে যে মানসিক ভাব উদয় হয় এবং তন্নিবন্ধন রাগ দ্বেষ হর্ষ বিমর্ষ যাহা মনের উপর অনুভবের তরঙ্গ আনে তাহা প্রকৃতির গুণ সত্ত্বরজস্তমোবিকারময় মনের **প্রাকৃত উদ্দাম বিশেষ।** কিন্তু শ্রীভগবানকে বিষয় করিয়া ভগবন্নামগুণাদি শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি জনিত যে মনের ধারাবাহিক ভগবদাকারতা জাত হয় তাহা প্রাকৃত সত্ত্বরজস্তমঃশূন্য বিশুদ্ধ **চিদানন্দ আত্মবৃত্তি বিশেষ।** ইহা **শুদ্ধাত্মার স্বরূপভূত গুণ বিশেষ।** ইহা জড়ীয় প্রাকৃত গুণ নহে। কারণ ভগবদ্‌ভক্তি সাধন দশায় ভগবৎশ্রবণকীর্ত্তনস্মরণাদি দ্বারা চিত্তের রজস্তমঃসত্ত্ব তিরোহিত হইতে থাকে, ক্রমশঃ আত্মার শুদ্ধতা প্রকাশ পাইতে থাকে। ভক্তি সাধনের চরম দশায় সাধক উপস্থিত হইলে প্রকৃতিগুণ হইতে নির্ম্মুক্ত পরম নির্ম্মল, বিশেষতঃ সাধনকালে ভক্তিসাধনা সংস্কারে সংস্কৃত আত্মস্বরূপে ভগবন্মাধুর্য্যাস্বাদনের যোগ্যতা সম্পাদক, ভগবদ্‌ভাব উদয় হয়।

ভগবদ্রূপ, অহো, মধুর হইতেও সুমধুর! অহো, ভগবদ্রস পরমানন্দঘন! অহো ভগবদ্গন্ধ! অহো ভগবৎস্পর্শ! ইত্যাদি নবনবায়মান ভগবদ্রূপরসগন্ধ-স্পর্শমাধুর্য্যাস্বাদনের নিঃসীম বৈচিত্রী কি প্রকারে আস্বাদিত হইবে, যদি ভক্ত হৃদয়ে এই **ভাবচন্দ্রের** উদয় না হয়? ভক্তহৃদয়ে উদিত এই ভাবচন্দ্রই ভগবন্মাধুর্য্যসিন্ধুকে উদ্বেলিত করিয়া অভিনবরূপে আস্বাদনের যোগ্য করিয়া তুলে।

এই ভাব শুদ্ধ আত্মস্বরূপে উদিত হইয়া আত্মানন্দরসের বৈচিত্রী রচনা করে। ভাবসংস্কারশূন্য ব্রহ্মানন্দে আনন্দরসের বৈচিত্রী অনুভব হয় না। ইহাই জ্ঞান সাধন এবং ভক্তি সাধনের পার্থক্যের কারণ। একই অনন্তাখণ্ড ব্রহ্মানন্দই জ্ঞানসাধনসম্পন্ন ভাবসংস্কাররহিত সাধকের সম্বন্ধে ব্রহ্মাত্মৈক্য রূপে নিস্তরঙ্গ আনন্দসিন্ধুবৎ লক্ষিত হয়। আর শুদ্ধভক্তিসাধনসম্পন্ন সাধকের সম্বন্ধে ঐ একই অনন্তাখণ্ড ব্রহ্মানন্দই সাধকের হৃদয়ে জাতভাবসংস্কার বলে অনন্তরূপে স্বরূপবৈচিত্রী ধারণ করিয়া সতরঙ্গ আনন্দসিন্ধুবৎ পরিলক্ষিত হয়। ইহারই নাম **ভগবদানন্দ**।

তাহা হইলে এখন বুঝুন, এই ভাবই যখন একমাত্র ভগবদানন্দরসাস্বাদনের কারণ তখন এই ভাবের জাতি এবং পরিমাণের তারতম্যানুসারে শ্রীভগবন্মাধুর্য্যা-স্বাদনেরও তারতম্য স্বীকৃত হয়। তাই শাস্ত্রে "শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর" ভাবের উল্লেখ দেখা যায়। সর্ব্বোপরি মধুর ভাবে শ্রীভগবদানন্দাস্বাদনই চরম পুরুষার্থ। শ্রীভগবন্নামগুণাদি শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি জনিত জাত ভগবদা-কারতাময় মনোবৃত্তি মনের প্রাকৃত বিকার নহে। ইহা সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মের চিৎ শক্তির সারাংশ মিলিত আনন্দ শক্তির সারাংশের বিলাস, শ্রবণাদিজনিত ভক্তের শুদ্ধচিত্তে আবির্ভূত হইয়া চিত্তের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করে।

মধুরভাবের চরম নিদর্শ স্থান গোপীভাব, এই গোপীভাবের সাধন যাবতীয় ভগবদ্‌ভক্তি ভাব সাধনের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। **গোপীর যে ভাব,** অর্থাৎ বিশুদ্ধ কৃষ্ণমাধুর্য্যামৃতের চরম আস্বাদন হইতে পারে যে ভাবের প্রাবল্যে তাহার নামই **গোপীভাব**। **আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতা ব্রজবনিতার ভাবসাধন প্রাকৃত কামসাধন নহে।** অনাদি বিষয়-

বিদূষিত ভগবদ্বিমুখ মূঢ় চিত্তে এই শ্রীভগবদিতরসর্ব্বপ্রপঞ্চাপ্রপঞ্চস্বার্থত্যাগী পরম নিষ্কিঞ্চনের চরম আদর্শ, মহা পারমহংস্যভাবের পরাকাষ্ঠা, গোপীভাব সামান্য কামভাব বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কেননা ব্যামোহ-গ্রস্ত হৃদয়ের ইহা স্বভাব। সর্ব্বানন্দকদম্বাবলম্ব পরমানন্দকন্দ শ্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দের নিঃসীম মাধুর্য্য উপভোগ করিতে হইলে এই গোপীভাব সাধনের প্রয়োজন অনিবার্য্য। গোপীর ভাবে ভাবিত অন্তঃকরণেই শ্রীভগবন্মাধুর্য্যের পূর্ণতম আবির্ভাব। যে ভাগ্যবান্ জন শ্রীগোপীভাবের চমৎকারিতা আস্বাদন করিতে চান তিনি যেন কলিযুগপাবনচরণানুচর শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণের "উজ্জ্বলনীলমণি" নামক গ্রন্থের "স্থায়িভাব" প্রকরণ অবশ্যই পাঠ করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

নমঃ শ্রীব্রজদেবীভ্যঃ শ্রীগুরুভ্যো নমো নমঃ।

"প্রীতিঃ ভগবতঃ সর্ব্বনৃ্ণাং হৃর্থপরা মতা"

ভগবৎ-প্রীতিঃ

পরম স্নেহাস্পদ—

শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন গোস্বামী, বি, এ, ভক্তিভূষণ,

পরম স্নেহাস্পদ—

শ্রীমান্ অচ্যুতানন্দ গোস্বামী, বি, এল,

উকিল, কিশোরগঞ্জ, মৈমনসিংহ।

মদীয় **শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে** অর্পিত **কুসুমাঞ্জলির** এই **নির্ম্মাল্য** আমার স্নেহাশিস্ রূপে আপনাদিগকে প্রদান করিলাম। ইহা আপনাদিগকে পরমামৃত দান করুক।

শ্রীভাগবতস্বামী।

প্রীতি চেতনের স্বাভাবিক নিত্য ধর্ম্ম। চেতন জীব মাত্রেই প্রীতি চায়, অর্থাৎ সে অপরের দ্বারা নিজেকে প্রীতি করাইতে চায় এবং নিজের দ্বারা অপরকে প্রীতি করিতে চায়, এই প্রকার প্রীতির আদান প্রদান চেতনের স্বধর্ম্ম। এই প্রীতি ধর্ম্মটি আনন্দমূলক ধর্ম্ম, অর্থাৎ আনন্দ হইতেই ইহার প্রকাশ এবং আনন্দকে বৈচিত্র্য দান করিয়া পরমোচ্ছলিত করাই ইহার কার্য্য। তাই এই প্রীতিকে গৌড়ীয় দর্শন শাস্ত্রে আনন্দাংশের আহ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি বলা হইয়াছে।

এই প্রীতিই চেতন জীবের প্রয়োজন অর্থাৎ পুরুষার্থ; যে যাহা কিছু করে, যে যাহা কিছু চায়, সকলেতেই প্রীতির সম্বন্ধ নিশ্চয়ই থাকে, কোথাও সাক্ষাৎ ভাবে, কোথাও বা পরম্পরা ভাবে। যাহাতে প্রীতি নাই সেই কার্য্য বা বস্তু কাহারও সুখপ্রদ হয় না, সুতরাং সুখটিও প্রীতিমূলক। এমন কি বিষভক্ষণাদি দুঃখকর কার্য্যও লোকে প্রীতির অনুসন্ধানেই করে, অর্থাৎ মনে ভাবে আমি মরিলেই শান্তি অর্থাৎ সুখ পাইব, তখন মরণোপায় বিষভক্ষণাদি কার্য্যও তাহার প্রীতিকর হইয়া উঠে। সুতরাং সুখের মূল যে প্রীতি ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, সুতরাং প্রীতিই জীবের পরম পুরুষার্থ।

পূর্ব্বে "চেতন জীব" এই যাহা বলা হইয়াছে, তাহা শুদ্ধ চেতন মাত্র নহে, তাহা আনন্দস্বরূপ এবং নিত্য। তাহা হইলে "সৎ-চিৎ-আনন্দই" চেতন জীব শব্দের অর্থ, এই সচ্চিদানন্দই জীবাত্মার স্বরূপ। তাহা হইলে তাৎপর্য্য এই যে সচ্চিদানন্দ আত্মার স্বরূপগত স্বাভাবিক ধর্ম্মই প্রীতি।

চেতনাত্মার প্রকাশের তারতম্যানুসারে প্রীতি প্রকাশের এবং প্রীতির কার্য্যব্যবহারাদিরও তারতম্য হয়। আধুনিক বিজ্ঞানে বৃক্ষাদি দেহে চেতন আছে ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত; তাদৃশ বৃক্ষাদিতে চেতন থাকিলেও আবৃত চেতন স্থলে চেতনধর্ম্ম প্রকাশের সহায়ক পরিকর সামগ্রীর ন্যূনতা এবং অস্বচ্ছতা থাকায় চেতনের স্পন্দন অতি অল্প, অতএব আনন্দের উদ্রেকও অতিশয় স্তিমিত থাকায় তাদৃশ প্রীতির প্রকাশ বা প্রীতির ব্যবহারাদি সুস্পষ্ট প্রতীত হয় না। তদপেক্ষা পশুপক্ষী প্রভৃতি দেহে চেতনের স্পন্দনাধিক্য বশতঃ প্রীতির ব্যবহারাদি সুস্পষ্ট অনুভূত হয়, মনুষ্যাদি দেহে তদপেক্ষা অধিক প্রকাশ পায়; আবার মনুষ্যাদি দেহের মধ্যে যে সকল দেহে পরিকর সামগ্রী যত পরিমাণ স্বচ্ছত্ব এবং পূর্ণতার দিকে অগ্রসর, তত পরিমাণেই সেই সেই দেহস্থ চেতনের প্রকাশ বাহুল্যে প্রীতিরও প্রকাশ এবং ব্যবহারাদির আধিক্য সুস্পষ্ট হয়। কিন্তু এই প্রীতির পূর্ণতা নিরাবৃত চেতন ভিন্ন স্থলে সম্ভব হয় না। এই নিরাবৃত চেতন একমাত্র ভগবান্। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে ভগবান্‌কে নিরাবৃত চেতন বিগ্রহ রূপেই গ্রহণ করা হইয়াছে। এই ভগবদ্‌বিগ্রহে প্রীতিটি পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, সুতরাং ভগবৎপ্রীতিই পরমপুরুষার্থ;

ভগবান্‌কে প্রীতি করা এবং ভগবানের প্রীতি লাভ করাই প্রীতির পরম পূর্ণতা, সেইটিই প্রয়োজন।

আবৃতচেতন জীবদেহে চৈতন্যের তারতম্যানুসারে প্রীতির তারতম্যের হেতু চেতনধর্ম্ম প্রকাশের সহায়ক সামগ্রী বলিতে দেহ এবং দেহস্থ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ বুদ্ধি আদি বুঝিতে হইবে। ইহাদের তারতম্য বলিতে সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক ভাবের প্রাচুর্য্য এবং অপ্রাচুর্য্য নিবন্ধন দেহাদি বুদ্ধির পূর্ণতা এবং অপূর্ণতাই বুঝিতে হইবে। বেদান্ত শাস্ত্রের পরিভাষায় বলিতে হইলে ইহাদিগকে অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ বলিতে পারা যায়। ইহাদের অবয়বের পূর্ণতা অপূর্ণতা, স্পষ্টতা অস্পষ্টতাদির তারতম্যানুসারেই আনন্দময় কোষ স্থানীয় চৈতন্যের তারতম্য প্রকাশ পায়। সেই চেতনধর্ম্ম প্রকাশের তারতম্যবশতঃ চেতনের আনন্দাংশের উদ্রেকেরও তারতম্য হয়, এবং তন্নিবন্ধন প্রীতিকার্য্যব্যবহারাদিরও তারতম্য প্রকাশ পায়। ইহাই এই জাগতিক আবৃতচেতনের জীবদেহের পরস্পর প্রীতিব্যবহারের তারতম্যের কারণ। কিন্তু ভগবৎপ্রীতির তারতম্যের কারণ ইহা হইতে ভিন্ন। **শ্রীভগবান্‌ নিরাবৃত সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ।** বিভু বিজ্ঞানানন্দ শ্রীভগবানে প্রীতিই পূর্ণ পরমপুরুষার্থ। "নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্।"

প্রীতি কাহাকে বলে। প্রিয়তার নামই প্রীতি। **বিষয়ে আনুকূল্যাত্মক** একটি মানসিক অবস্থা বিশেষকে প্রীতি বলে। অবস্থা বিশেষ বলিতে "উল্লাসময় জ্ঞান বিশেষ" বুঝিতে হইবে। কোন বস্তুতে প্রীতি আছে, ইহা বলিলে সেই বস্তু বিষয়ে মনের একটি আনুকূল্যভাবাত্মক উল্লাসময় জ্ঞান ইহাই বুঝা যায়। মনের এই আনুকূল্যভাবটি যে বস্তুকে বিষয় করিয়া প্রবর্ত্তিত হয় সেই বস্তুকেই প্রীতির বিষয় বলা যায়। ঐ প্রকার "আনুকূল্যাত্মক ভাবের" মধ্যে একটি "স্পৃহা"ও আছে। অর্থাৎ যে বস্তুতে প্রীতি আছে সেই বস্তুকে বিষয় করিয়া মনের একটি স্পৃহা উদয় হয়; ঐ স্পৃহাটি বস্তুর আনুকূল্যরূপে উদয় হইলেই প্রীতি বলা যায়। বস্তুর আনুকূল্যে না হইয়া যদি কেবল মাত্র নিজের আনুকূল্যের নিমিত্ত স্পৃহার প্রাবল্য হয় তাহা হইলে তাহাকে আর প্রীতি বা প্রেম বলা যায় না, তখন তাহা **কাম** বলিয়াই খ্যাত হয়। তাৎপর্য্য এই, বিষয়ের আনুকূল্যের অনুগত যে বিষয়ের স্পৃহাময়

উল্লাসময় জ্ঞান তাহাই প্রীতি। এই প্রকার বিষয়ানুকূল্যাত্মক বিষয়েরই অনুগত আনুকূল্যের যে স্পৃহাময় জ্ঞান তাহাই বস্তুর প্রকৃত অনুভবের কারণ। প্রীতি না থাকিলে কোনও বস্তুর অনুভব প্রকৃতভাবে হয় না। **সর্ব্বানন্দকদম্বাবলম্ব শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দকে বিষয় করিয়া জীবের এতাদৃশ মনোভাব উদয় হইলে জীব অসমোর্দ্ধ পরমানন্দ লাভে কৃতকৃতার্থ হইতে পারে।** এই প্রীতি প্রকৃতিজাত বস্তুকে বিষয় করিয়া উদয় হইলে তাহাকে প্রাকৃত প্রীতি বলে। প্রাকৃত প্রীতিটি শুদ্ধ নহে। প্রাকৃত মনের সত্ত্বাবস্থাতে যে পুত্রাদির প্রতি প্রীতির উদয় হয় তাহাতেও রজস্তমের অংশও বর্ত্তমান থাকে, উহা শুদ্ধ সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম নহে, এবং যিনি প্রীতি করেন তিনি **স্বয়ং অপূর্ণ,** দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণে সর্ব্বথা অপূর্ণ। এই সর্ব্বথা অপূর্ণ দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণাদির ব্যাপার দ্বারা যাহার প্রতি প্রীতি করা যায় সেই বিষয় পুত্র, পতি, ভ্রাতা প্রভৃতিও সর্ব্বথা অপূর্ণ। এক অপূর্ণ অপর অপূর্ণকে পূর্ণ করিতে সক্ষম হয় না। সকলেই আমরা কামনাবাড়বানলে দগ্ধ, কে কাহাকে প্রীতিমাধুর্য্যধারায় শীতল করিবে? বস্তুতঃ প্রাকৃত বিষয়ে যে প্রীতি ব্যবহার আমাদের দেখা যায় তাহা শুদ্ধ প্রীতি নহে এবং সম্যক্ প্রীতি নহে, উহা কামমিশ্র প্রীত্যাভাস মাত্র। ভগবদ্ভক্তহৃদয়ে ভগবদ্বিষয়ক যে প্রীতির উদয় হয় তাহা প্রাকৃত নহে, সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানের চিদংশসার সমবেত আহ্লাদাংশের সার বিশেষ। এই প্রীতিই ভক্ত ভগবান্ উভয়কেই অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যানন্দে নিমজ্জিত করিয়া পরস্পরকে প্রিয়তাসূত্রে গ্রথিত করে।

ভগবৎপ্রীতি ভক্তহৃদয়ে উদয় হইয়া ক্রমবৈচিত্র্যে ভক্তচিত্তকে উল্লাস-চমৎকারিতায় উল্লসিত করে, ভগবানে মমতাতিশয় যোজনা করে, ভক্তভগবানে একান্ত বিশ্বাস স্থাপন করে, প্রিয়তাতিশয়কে ব্যক্ত করিয়া ভক্তভগবানে পরস্পরের প্রতি অভিমান উদয় করে, হৃদয়কে দ্রবীভূত করে, প্রীতির বস্তুতে অভিলাষাতিশয় যোজনা করে, প্রীতির বিষয়কে প্রতিক্ষণে নবনবরূপে অনুভব করায়, অসমোর্দ্ধ চমৎকারিতা দ্বারা দিব্যোন্মাদ জন্মায়। **এই ভাগবতী প্রীতিই জীবের পরম--পুরুষার্থ।** ভক্তিশাস্ত্রে এই প্রীতিকেই রতি বা ভাব বলা হইয়াছে। শ্রীভগবদ্বিষয়া এই প্রীতি পঞ্চ প্রকার। শান্ত,

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার ভেদে এই পাঁচ প্রকার প্রীতিই রসরূপে ভক্তহৃদয়ে আবির্ভূত হইলেই পুরুষার্থের চরমানন্দ প্রকাশ পায়—"রসো বৈ স রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" সকল প্রীতিজাতিচূড়ামণিরূপা পরা প্রীতির নিদর্শন একমাত্র গোপীদিগের প্রীতি, যে প্রীতির মহিমা স্বয়ং ভগবান্ বলিতেছেন—

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥"

"প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ।
যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কোন্বু পরঃ প্রিয়ঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগত। ১০।২৩।২৭।

"প্রাণ বুদ্ধি মন আত্মা স্ত্রীপুত্র ধনাদি যাঁহার পরম্পরা সম্পর্ক বশতঃ কোথায়ও স্বীয়াংশ পরমাত্মার ভিন্নাংশরূপ জীবের অধ্যাস সম্বন্ধ পরম্পরা সম্পর্ক বশতঃ প্রিয় হইয়াছে সেই পরম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ আমা হইতে অধিক প্রিয় আর কে আছে?"

"চিদানন্দময়ী ভক্তিঃ ভগবতঃ প্রকাশিকা"

ভক্তিঃ

উৎসর্গ

পরম স্নেহাস্পদ—

শ্রীযুক্ত **নিখিলানন্দ গোস্বামী,** কাব্যব্যাকরণতর্কতীর্থ,

বাণীগ্রাম, মৈমনসিংহ।

পরম স্নেহাস্পদ—

শ্রীযুক্ত **গৌরগোপাল গোস্বামী,** কাব্যব্যাকরণতীর্থ, ভাগবতশাস্ত্রী,

নবদ্বীপ।

পরম স্নেহাস্পদ—

শ্রীযুক্ত **জিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী,** কাব্যবিনোদ, ভক্তিশাস্ত্রী,

নবদ্বীপ।

মদীয় **শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে** অর্পিত **কুসুমাঞ্জলির** এই **নির্ম্মাল্য** আমার স্নেহাশিস্ রূপে আপনাদিগকে প্রদান করিলাম। ইহা আপনাদের ভক্তিশাস্ত্র-জ্ঞানময় ভগবদ্‌ভজনে পরম সহায় হউক।

শ্রীভাগবতস্বামী।

প্রশ্ন—অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

"সেবোন্মুখে" এই শব্দটির তাৎপর্য্য কি?

উত্তর—সেবায়ৈ উন্মুখম্ সেবোন্মুখম্ অর্থাৎ সেবার নিমিত্ত উন্মুখ। এখন সেবা কাহাকে বলে? সেব্যের আনুকূল্যানুশীলন অর্থাৎ তাহার সুখোৎপত্তি-

বিধানের নামই সেবা। কোনও কার্য্যের জন্য ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু চেষ্টা এখনও আরম্ভ হয় নাই, তাদৃশ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারের প্রাথমিক প্রবৃত্তি বিশেষের নাম উন্মুখতা। কাযেই সেবোন্মুখ শব্দের তাৎপর্য্য হইল সেব্যের সুখোৎপত্তি-বিধানের ইচ্ছা হইয়াছে এবং তজ্জন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে মাত্র।

কোনও বিষয়ের ইচ্ছা হইয়াছে বলিলেই বুঝিতে হইবে তৎসম্বন্ধে ইতঃ-পূর্ব্বেই আমার জ্ঞান রহিয়াছে ; জ্ঞান অর্থে আমরা সাধারণতঃ যাহাকে জ্ঞান বলি সেই শ্রেণীর জ্ঞান নয়। বস্তুর বস্তুত্ব ধর্ম্মে বা শক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাসের নামই প্রকৃত জ্ঞান। আবার এই প্রকার প্রকৃত জ্ঞানই শুধু কিন্তু ইচ্ছার কারণ নহে। বস্তুর শক্তিতে প্রকৃত জ্ঞান হওয়ার পর তৎসম্বন্ধে ইষ্ট সাধনতা জ্ঞানও চাই, প্রয়োজনীয়তা বোধও চাই। যেমন জল সম্বন্ধে আমার ইচ্ছা হইতে হইলে জলের পিপাসানিবারকত্ব গুণ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান থাকা চাই এবং পিপাসারও বোধ থাকা চাই।

ঠিক এই প্রকারে যখন কোনও সৎ মহাপুরুষের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া শ্রীহরিনামের সর্ব্বপাপবিনাশিনী এবং প্রেমপ্রদায়িনী শক্তি সম্বন্ধে আমার জ্ঞান হইয়া রহিয়াছে, এমত অবস্থায় যখন আমি সংসার মহাদাবানলের ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ হইয়া সর্ব্বপাপতাপ বিনিবৃত্তি চাহিতেছি এবং ভগবৎপ্রীতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে থাকি তখনই শ্রীহরিনাম সম্বন্ধে একটি ইচ্ছার উদ্গম হইবে। এই প্রকার ইচ্ছা হইতেই নাম গ্রহণে প্রবৃত্তির উদয় হইয়া শেষে জিহ্বাদির চেষ্টা প্রকাশ পায়।

উপরে যাহা বলা হইয়াছে যে সৎ মহাপুরুষের শ্রীমুখ হইতে ভগবন্নাম-মহিমাদি শ্রবণ করিলে আমার নামাদি বিষয়ে প্রথম জ্ঞান হইবে, ইহার অর্থ এই নহে যে নাম শ্রবণ মাত্রই নামজ্ঞানের কারণ। সৎ মহাপুরুষের কৃপাই প্রকৃত নামজ্ঞানের একমাত্র পরম কারণ। যতক্ষণ সৎ মহাপুরুষের কৃপা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর না হয় ততক্ষণ তাঁহার মুখনিঃসৃত নাম বা তাঁহার শক্তির কথা শ্রবণ করিয়াও আমার নামের সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইবে না। অবশ্য সৎ মহাপুরুষের শ্রীমুখ হইতে যতটুকু শ্রীভগবন্নামাদি শ্রবণ করিতেছি তাহাও সেই সৎ মহাপুরুষের করুণাই। কিন্তু যাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার উপদিষ্ট শ্রীনামাদিতে কার্য্যকরত্ব বোধে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত না হয় তাবৎকাল

কৃপার পূর্ণতা হয় না। শ্রীভগবন্নামাদিতে দৃঢ় বিশ্বাসই সাধু মহাপুরুষের করুণার পরিচায়ক।

এখন এই কৃপা বস্তুটি কি? কি প্রণালীতেই বা এই কৃপাটি সাধিত হয়? "ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।" ভক্তের হৃদয়ে যখন যে সদ্‌বাসনার উদয় হয় ভগবান্ তখনই তাহা জানিতে পারেন এবং তখনই তাহা তিনি পূরণ করেন। জীবের বিষয়াসক্তি এবং কৃষ্ণবহির্মুখতা দেখিয়া সাধু মহাপুরুষ কারুণ্যপরবশ হইয়া ইচ্ছা করেন, "আহা, ভগবন্, এই লোকটি তোমারই জীব, তোমারই নিত্যদাস, আজ তোমাকে ভুলিয়া গিয়া মায়াজালে জড়িত হইয়া এত দুঃখ পাইতেছে, তুমি একবার কৃপা কর।" সাধুর হৃদয়ে এই প্রকার জীব প্রতি করুণ ভাবের স্পন্দন হওয়া মাত্রই ভগবৎপাদপদ্মকারুণ্যকেন্দ্র কাম্পত হইয়া উঠে। ভগবদ্‌ভক্তিসূত্রে গ্রথিত সাধুহৃদয় শ্রীভগবৎপাদ-পদ্মের সহিত সর্ব্বদা তাদাত্ম্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সাধুমহাপুরুষেচ্ছোদ্বো-ধিত শ্রীভগবৎকরুণাপ্রণোদিত ভক্তিদেবী তখন সেই জীবহৃদয়ে আবির্বুভূষু হইয়া উঠেন, সেই জীবের ভগবন্নামাদি গ্রহণের ইচ্ছাকে লক্ষ্য করিয়া তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অবস্থান করিতে থাকেন। পূর্ব্বে মহৎকরুণায় নামাদিমহিমাশ্রবণপ্রাপ্ত জীব যদি ইচ্ছা করে, "আমি শ্রীনামাদি গ্রহণ করিব," তাহা হইলে এই প্রকার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্ব হইতেই সৎ মহাপুরুষের করুণা প্রেরিত হইয়া আবির্ভূত হইবার অপেক্ষায় অবস্থান করিতেছেন যে ভক্তিদেবী তিনি তখন তাদৃশ জীবের জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারের সহিত তাদাত্ম্য ভাবে অবস্থান করেন। এইরূপ ভক্তিতাদাত্ম্য জিহ্বাদিতে শ্রীহরিনাম স্বয়ং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়েন।

"সেবোন্মুখ জিহ্বাদি" বলায় বিশুদ্ধ কেবলমাত্র শ্রীভগবৎপ্রীত্যানুকূল্য ভাব ভিন্ন যদি সামান্য ধর্ম্ম অর্থ কামাদি বাঞ্ছার প্রেরণায় নাম গ্রহণের ইচ্ছার উদ্রেক হয় তাহা হইলে তাদৃশ ব্যক্তির জিহ্বাদিতে নামাদি স্বয়ংপ্রকাশতা সম্যক্ প্রকাশ করেন না, সে স্থলে নামাদি নিজের প্রকাশতাকে আভাসিত করেন। অর্থাৎ অন্যবাঞ্ছাবিশিষ্টহৃদয় ব্যক্তির জিহ্বাদিতে যে নামাদি উদয় হয়েন উহা ভক্তির **আভাস মাত্র**।

ভক্তিবৎ আভাসন্তে যে তে ভক্ত্যাভাসাঃ অর্থাৎ যাহা প্রকৃতস্বরূপতঃ ভক্তি না হইয়াও ভক্তির তুল্য প্রকাশ পায় তাহার নামই ভক্ত্যাভাস। নামাভাস শব্দ উপলক্ষণ, বস্তুতঃ ভক্তি মাত্রই শুদ্ধ ভক্তি ভিন্ন অন্য তাৎপর্য্য সঙ্গে আভাসত্ব রূপে প্রকাশ পায়। ইহাকে "ভক্ত্যাভাস" বলা যায়। যাঁহারা ইহলোক-পরলোক-ধর্ম্ম-অর্থ-যশঃ-প্রতিষ্ঠাদি-কামনা-চরিতার্থ-লালসা-প্রবণচিত্ত, তাঁহাদের জিহ্বাতে যে শ্রীভগবন্নাম উচ্চারিত হন বা চক্ষুরাদি অন্য ইন্দ্রিয় ব্যাপারে যাহা ভক্ত্যঙ্গ উদয় হন তাহা অসম্যক্ উদয়। তাদৃশ ব্যক্তিদিগের জিহ্বাদিতে শ্রীভগবন্নামাদির সম্যগাবির্ভাব হয় না। যদ্যপি ভক্তির স্বরূপ সচ্চিদানন্দময় স্বপ্রকাশ তথাপি সাধকহৃদয়স্থ অন্য বাসনা কুজ্ঝটিকায় হৃদয় আচ্ছন্ন থাকায় সেই বাসনা কুজ্ঝটিকা হইতে **জাত ভগবন্নামাদিগ্রহণের ইচ্ছাটিও কুজ্ঝটিকাসমাচ্ছন্ন থাকে,** সেই ইচ্ছা প্রেরিত ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি বশতঃ শ্রীভগবন্নামাদি যাহা গ্রহণ করা যায় তাহা ঐ কুজ্ঝটিকা সমাচ্ছন্ন নামাদির আভাস মাত্র, তাদৃশভাবে নাম গ্রহণের ইচ্ছায় নামের **প্রকৃত স্বরূপের আবির্ভাব হয় না** এবং তজ্জন্য তাদৃশ নামগ্রহণেও নামগ্রহণের প্রকৃত পরম ফলের সাক্ষাৎকার হয় না। শ্রীভগবানের বিত্তি বেদন অর্থাৎ জ্ঞান জ্ঞাপন শক্তির সারাংশ মিলিত হ্লাদ শক্তির সারাংশের বিলাসরূপা ভক্তির পরম শুদ্ধ ফল ভক্তহৃদয়ে শ্রীভগবান্‌কে প্রকাশ করিয়া পরমানন্দ দান করা। নামাদি গ্রহণ যদি আভাসিত হয় তাহা হইলে ঐ মুখ্য ফল স্থগিত হইয়া যায়। তথাপি তাদৃশ নামাদি গ্রহণ রূপ ভক্ত্যাভাস মাত্রেও কর্ম্মজ্ঞানযোগাদিসাধন জনিত প্রচুর আয়াসসাধ্য ইহলোক পরলোক ধর্ম্ম অর্থ যশঃ কাম স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট ভোগাদি এমন কি মুক্তি পর্য্যন্ত ফল অনায়াসেই লাভ হয়। ইহার দৃষ্টান্তের শাস্ত্রাদিতে প্রচুর প্রচার আছে। ইহা শ্রীভগবন্নামাদির অচিন্ত্য মহিমা।

এস্থলে আরও একটু বিচার্য্য আছে। শ্রীভগবদ্ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তি, স্বতঃপ্রকাশরূপা স্বতোনিরাবরণা, ইঁহাকে কেহ আবরণ করিতে পারে না। শ্রীভগবন্নামাদি স্বতঃসিদ্ধপ্রকাশ, তাঁহার কোন আবরণ হইতে পারে না, সুতরাং তাঁহার আভাস কিরূপে সম্ভব হয়? উত্তর,—যেমন প্রাকৃত অন্যান্য প্রকাশশীল বস্তুর মধ্যে স্বপ্রকাশ সূর্য্য বহু যোজন উর্দ্ধে বহু যোজন আয়ত, ক্ষুদ্র যোজন পরিমিত কত নিম্নে স্থিত মেঘখণ্ড বা কুজ্ঝটিকাসমূহ বস্তুতঃ তাহাকে আচ্ছাদন

করিতে সক্ষম হয় না, কেবলমাত্র দ্রষ্টার পরিমিত নয়ন পথকে আবরণ করিয়া থাকে বলিয়া, সেই নয়ন পথে পতিত সূর্য্যকিরণ সমূহ দ্রষ্টার নয়নে অসম্যক্ উদয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ স্বতঃপ্রকাশ শ্রীভগবদ্ধর্ম্ম ভগবন্নামাদিও গ্রহীতার কামকলুষাচ্ছন্ন হৃদয়ের পথে উদিত হইলেও গ্রহীতার গ্রহণ দোষে ঐ উদয় সম্যক্ না হইয়া আভাসিতই হয়। ঐ প্রকার আভাসিত হইলেও ভগবদ্ধর্ম্ম পাপনাশাদি পূর্ব্বক মোক্ষপ্রদত্ব শক্তি ধারণ করেন।

এই প্রকার আভাসতাদিরহিতা শুদ্ধস্বরূপভূতা ভগবৎস্বপ্রকাশতা শক্তি মাখা ভক্তির আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কালেই জীবের মন প্রাণ ইন্দ্রিয়াদির জাড্যতা নাশ করিয়া শ্রীভগবন্নামাদি জীবের জিহ্বাদি করণে প্রকাশিত হন। **"পুরুষকরণানি তদীয় স্বপ্রকাশতাশাক্ততাদাত্ম্যাপন্নতয়ৈব তৎপ্রকাশতাভিমানবন্তি স্যুঃ"** অর্থাৎ তখন জীবের ইন্দ্রিয়াদি করণবর্গ সেই ভগবৎস্বপ্রকাশতাশক্তির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া "আমার জিহ্বা নাম গ্রহণ করিতেছে" ইত্যাদি অভিমান করে; বস্তুতঃ জড়জিহ্বা নাম গ্রহণ করিতেছে না, যেমন জড়লৌহ দগ্ধ করিতে পারে না, অগ্নিতাদাত্ম্য লৌহ দগ্ধ করে তদ্বৎ॥

"অখণ্ডপরমানন্দরসাস্বাদনতৎপর-
গৌরাকৃতিপরব্রহ্মশ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ"

শ্রীগৌরাঙ্গঃ

বিখ্যাত 'দিদি' 'অন্নপূর্ণা' প্রভৃতি সদুপন্যাস লেখিকা বিদুষী পরম স্নেহাস্পদ **শ্রীমতী নিরুপমা দেবী,** উকিল পাড়া, বহরমপুর,

তথা

বিদুষী ভক্তিমতী পরম স্নেহাস্পদ **শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী দেবী** ভক্তি-সরস্বতী, বুড়া শিবতলা, নবদ্বীপ।

মদীয় **শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে** অর্পিত **কুসুমাঞ্জলির** এই **নির্ম্মাল্য** স্নেহাশিস্ রূপে আপনাদিগকে দান করিলাম। আপনারা আমি নিতান্ত অযোগ্য হইলেও আমার মুখে আপনাদের প্রাণের অন্তরঙ্গ পরম দেবতা শ্রীগৌরগোবিন্দের তত্ত্ব রহস্য কথা শ্রবণ করিতে ভালবাসেন, তাই এস্থলে আমার এই আশীর্ব্বাদ।

শ্রীভাগবতস্বামী।

আস্বাদ্য, আস্বাদক, আস্বাদন এই তিনটি না হইলে কোন বস্তুর আস্বাদন হয় না। কেহ কিছু আস্বাদন করিতেছেন, ইহা বলিলেই বুঝিতে হইবে যে, যাঁহাকে আস্বাদন করা হইতেছে (আস্বাদ্য) তিনি আছেন, যিনি আস্বাদন করিতেছেন (আস্বাদক) তিনি আছেন এবং আস্বাদন ক্রিয়াটিও আছে। জগতে চেতন জীব মাত্রেরই ভালমন্দ একটা কিছু আস্বাদন আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে আস্বাদ্য, এবং আস্বাদকেরও অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতেছে। অতএব আস্বাদ্য, আস্বাদক এবং

আস্বাদন এই তিনটি বস্তুরই নিত্যতা স্বীকার করিতে হয়। বিশেষতঃ পরতত্ত্ববিষয়ক আস্বাদ্য, আস্বাদক, আস্বাদন ভাব পরম নিত্য। এই তিনটি বস্তুকে ভক্তগণ বলেন, ভগবান্, ভক্ত এবং ভক্তি ; জ্ঞানিগণ বলেন, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এবং জ্ঞান। এই তিনটি বস্তু নিত্য হইলেও পরস্পর আবার অবিচ্ছিন্ন। ভগবান্ না থাকিলে, জগতে ভক্ত থাকা সম্ভব হইত না। আবার ভক্ত না থাকিলে, ভগবান্ আছেন, এই কথারও কোন সার্থকতা থাকিত না। ভক্তই ভগবদস্তিত্বের প্রমাণ। **ভক্ততেই ভগবানের প্রকাশ।** ভক্তেতে যে ভগবানের প্রকাশ, **ভক্তের ভাবই তাহার কারণ।** এই ভাবেরই সাধারণ নাম ভক্তি অর্থাৎ ভক্ত ভগবানের সম্পর্ক। ভক্তহৃদয়স্থিত ভাব দর্পণে ভগবানের রূপগুণ লীলা মাধুর্য্যাদি প্রতিভাত হয়। এই ভাবের তারতম্যেই, ভগবানের রূপগুণাদি প্রকাশের তারতম্য হয়। কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি রূপে যে ভগবানের অনন্ত প্রকাশ, ভক্তহৃদয়স্থিত ভাবের আনন্ত্যই ইহার একমাত্র কারণ। ভগবান্ ভিন্ন ভিন্ন নহেন, ভিন্ন ভিন্ন ভাবানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়েন মাত্র। বাস্তবিক তাঁহারা একই পরব্রহ্মের একই স্বরূপের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

এখানে আর একটি রহস্য এই যে, ভক্ত যে নিজ ভাবধারা দ্বারা ভগবান্‌কে দর্শন করেন, ইহা নির্ব্বিকার দর্শন নহে। দর্শন মাত্র ভক্তের ভাবও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। ভগবান্ যে রসময়, এখানেই এই বাক্যের সার্থকতা।

রসো বৈ স রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি ইতি শ্রুতিঃ। ভগবান্‌কে "রস" বলা হইয়াছে। রস্যতে অসৌ ইতি রসঃ, রসয়তীতি রসঃ। রস শব্দের এই দুই প্রকার অর্থ হয়। আস্বাদ্য রূপে তিনি রস, আস্বাদক রূপেও তিনি রস। এই যে রস এবং ভাব, ইহাদের পরস্পর হুড়াহুড়ি। রসের গুণ ভাবকে বর্দ্ধন করা, এবং ভাবের গুণ রসকে উচ্ছলিত করিয়া তোলা। ভক্ত যখনই ভগবান্‌কে দর্শন করেন, তিনি ভাবে গদগদ হইয়া উঠেন এবং এই প্রকার গদগদ ভাবে তিনি পুনরায় যখন ভগবদ্দর্শন করেন তখন ভগবদ্রূপটি তাঁহার নিকট অননুভূতরূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে, অর্থাৎ প্রতিবার দর্শনেই যেন নবনবায়মানরূপে উপলব্ধি হয়।

ভক্তহৃদয়স্থিত এই যে ভাব, যাহা দ্বারা তিনি ভগবদ্দর্শন করেন, রসা-

স্বাদন করেন, তাহা দাস্য বাৎসল্যাদি ভেদে চারি প্রকার। ভাবের পূর্ণতায় রসের পূর্ণতা। ভক্তের ভাবটি যখন গাঢ়তম অবস্থায় উপনীত হয়, পূর্ণতম হইয়া উঠে, তখনই শুধু ভগবান্ পূর্ণতমরূপে প্রকাশিত হন। **এই ভক্তভাবের পূর্ণতম বিকাশের নামই মহাভাব এবং শ্রীমতী রাধিকাই মহাভাবস্বরূপিণী।**

ভগবানের এই যে পূর্ণতম প্রকাশ, রসের পূর্ণতম আস্বাদনের বস্তু, ইনিই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ। এই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্ এবং মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধা পূর্ণ শক্তি। এই পূর্ণশক্তি ও শক্তিমানের মিলনেই পূর্ণ আস্বাদন। এই মিলনটি কি প্রকারে হয়, তাহাই অধুনা আলোচনা করা যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রস ভাবকে বর্দ্ধন করে এবং ভাব রসকে উচ্ছলিত করিয়া তুলে। এই মিলনের যোগসূত্র আমরা পাই "কৃষ্ণ" শব্দটির ভিতর। কৃষ্ + ণ = কৃষ্ণ। "কৃষ্" ধাতুর অর্থ কর্ষণ, "ণ" এর অর্থ আনন্দ, অর্থাৎ আনন্দ দ্বারা যিনি আকর্ষণ করেন, তিনিই কৃষ্ণ।

শক্তিমান্ আনন্দ দান করিয়া শক্তিকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করেন। আবার শক্তিও আনন্দ দান করিয়া শক্তিমান্‌কে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। এইভাবে উভয়ে উভয়ের আনন্দে আত্মহারা অবস্থায় পরস্পর পরস্পর কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া, উভয়ে উভয়ের সন্নিকর্ষতা প্রাপ্ত হইতে থাকেন। যতই এই প্রকার ঘনীভূত আনন্দের আদান প্রদানের দ্বারা পরস্পর পরস্পরের নৈকট্য অপেক্ষাও নৈকট্যের অবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকেন, ততই ইঁহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন অভিমানও ক্রমশঃ কোন অনির্ব্বচনীয় একত্বাভিমানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। মহারসানন্দের এই প্রকার আদান প্রদানের দ্বারা কোন এক অভিনব বিচিত্রতার যে চরম ছড়াছড়ি, **ইহাই মহারাস**। এই মহারাস অবস্থাতেই উভয়ে বিশেষতঃ শ্রীরাধিকাতেই কোন অনির্ব্বচনীয় মাদন ভাবের আবির্ভাব হয়। এই মাদনরসানন্দাকৃষ্ট মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চরম রসরাজ মূর্ত্তি প্রকটন পূর্ব্বক ঐ মাদন রসে যেন আত্মবিসর্জ্জন করিয়া নিজ অভিমান হারাইয়া ফেলেন। আবার মাদনবতী শ্রীরাধিকা মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণকে এই মাদনরস-সীধু পান করাইতে করাইতে তাঁহাকে নিজের অভ্যন্তরে গ্রহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণানন্দে বিভোর হইয়া নিজের অভিমানকেও হারাইয়া ফেলেন। উভয়ের

এই বিমিশ্র একাভিমানযুক্ত রসবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ। ইহাই পরব্রহ্মের রসানন্দের চরম প্রকট মূর্ত্তি।

শক্তি ও শক্তিমানের এই মহামিলন—কৃষ্ণ রাধা অঙ্গে প্রবেশ করিলেন, রাধা কৃষ্ণ অঙ্গে প্রবেশ করিলেন,—ইহা একটি অপূর্ব্ব আস্বাদনীয় বস্তু। রাধা কৃষ্ণ উভয়ে মিলিত হইয়া যে অভিনব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন ইহাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর। এই একীভূত বিগ্রহে চিনিবার উপায় নাই, কতটুকু রাধা এবং কতটুকু কৃষ্ণ, অর্থাৎ কোন্ অংশ রাধা, কোন্ অংশ কৃষ্ণ। উভয়ে উভয়ের মনঃপ্রাণ ইন্দ্রিয়াদির প্রতি অবয়বে অবয়বে প্রবেশ করিয়াই যেন এই অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছেন। রাধা-উপাসকগণ এখানে যদি রাধাকে অনুসন্ধান করেন, তবে রাধাকে চিনিতে পারিবেন, কিন্তু রাধাকে পাইবেন কৃষ্ণময়; আবার যদি কৃষ্ণ-উপাসকগণ এই স্বরূপেতে কৃষ্ণকে অনুসন্ধান করেন, তবে কৃষ্ণকে চিনিতে পারিবেন, কিন্তু কৃষ্ণকে পাইবেন কেবল রাধাময়। রাধাকৃষ্ণের এতাদৃশ উভয়তন্ময়তাময় মহামিলনটি যেন পরস্পর পরস্পরকে বলিতেছেন, "ঐ তুমি কি আমি? এই আমি কি তুমি?" এই যে ভেদেতে অভেদ এবং অভেদেতে ভেদ, ইহা একটি অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় রসাস্বাদনের ধারা। **পরব্রহ্মের এই অপূর্ব্ব আস্বাদনের রূপটিই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু।** ইহাই অভিনব বিবর্ত্ত অদ্বৈত বাদ। ইহা নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত-বাদীর অদ্বৈতবাদ নহে। ইহা আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের আনন্দ শক্তি পরম ভগবতীর সহিত অখণ্ড রসাস্বাদনের "ভ্রমাভঃ কোঽপি বৈচিত্রীময়ঃ" যুগলের একীভাব অদ্বৈত। ইহাই রসতাৎপর্য্যক শ্রুতির চরম পর্য্যবসান। ইহাই গৌড়ীয় দর্শন শাস্ত্রকে অন্যান্য দর্শন শাস্ত্র অপেক্ষা উজ্জ্বলতম করিয়াছে।

আপনাদিগকেই উদ্দেশ করিয়া, আমার প্রতি ভক্তিমতী যে সমস্ত সৎ মহিলাবর্গ আমার প্রতি স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমার মুখে অনেক সময় ভগবৎ কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, গৌরাকৃতি শ্রীমদনগোপাল পাদপদ্মে তাঁহাদের ঐকান্তিক মঙ্গল প্রার্থনা ক্রমে আশীর্ব্বাদ করিতেছি,—শুভমস্তু, আমার সমর্পিত শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের এই নির্ম্মাল্য তাঁহাদেরও পরম শুভ বিধান করুন।

কৃতজ্ঞতা

যাঁহারা শ্রীভগবৎপাদপদ্মসেবালিপ্সু, শ্রীভগবৎপ্রেমসেবারূপ পরম পঞ্চম পুরুষার্থ প্রাপ্তি কামনায় যাঁহারা ক্ষুদ্র মনুষ্যানন্দ হইতে গন্ধর্ব্বদেবাদি প্রাজাপত্যানন্দ কোটী হইতেও উৎকৃষ্ট ব্রহ্মানন্দরূপ মুক্তি-আনন্দ পর্য্যন্তকেও তৃণতুল্য তুচ্ছ বোধ করতঃ শ্রীগুরুপাদপদ্ম সমাশ্রয় পূর্ব্বক শ্রীভক্ত সঙ্গে শ্রীভগবদারাধনায় সর্ব্বতঃ উন্মুখ হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রথমতঃই ভগবদারাধনার পরম সহায় ভাগবতীয় গুণগণমুকুটমণি "কৃতজ্ঞতা" নামক গুণটির সঞ্চয়ের প্রতি মুখ্যরূপে লক্ষ্য রাখাই কর্ত্তব্য, ইহাই আমার ক্ষুদ্র ধারণা। যে হেতু এই "কৃতজ্ঞতা" নামক গুণটিই যাবতীয় সদ্‌গুণের আকর। এই কৃতজ্ঞতা গুণকে আশ্রয় করিয়াই সাধুহৃদয়ে অন্যান্য যাবতীয় সদ্‌গুণসমূহ অবস্থান করতঃ নিজ সৌরভে চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডকে আমোদিত করিয়া তদূর্দ্ধ বৈকুণ্ঠাদি গোলক পর্য্যন্ত সুবাসিত করিয়া শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্‌কে পর্য্যন্ত উন্মাদিত করিয়া তুলে। বস্তুতঃ কৃতজ্ঞতার মত গুণ নাই, আর অকৃতজ্ঞতার সমান দোষ নাই। মহতের মহত্ত্বই কৃতজ্ঞতা, ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রতার চরম নিদর্শন অকৃতজ্ঞতা। যিনি যত মহৎ তাঁহার হৃদয় ততই কৃতজ্ঞতায় ভরা। যে হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা স্থান পায় না, সে হৃদয় অতি সঙ্কীর্ণ, তাদৃশ ক্ষুদ্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র অতি সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে শ্রীভক্তি-দেবীর আবির্ভাব হয় না, ভাগবতীয় গুণসমূহও অবস্থান করিতে পারে না। অতএব হৃদয়ে শ্রীভক্তিদেবীর উপবেশনের উপযুক্ত সিংহাসন স্থাপন করিতে হইলে প্রথমতঃই সাধকের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জনের দিকে লক্ষ্য রাখাই কর্ত্তব্য।

বিশেষতঃ শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে কৃতজ্ঞতাই শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির পরম সহায়। সাধন ভজন অকৃতজ্ঞ হৃদয়ে কখনই সম্ভব হয় না। বাহ্যিক সাধনের ভান বা আড়ম্বর মাত্র প্রকটিত করা যাইতে পারে, কিন্তু শ্রীভগবৎবশীকরণ সাধন

তাদৃশ হৃদয়ে কখনই প্রকটিত হইতে পারে না। অধিক কথা আর কি? অনন্তকল্যাণগুণবরুণনিলয় শ্রীভগবানের যাবতীয় গুণ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর যে "ভক্তবাৎসল্য" গুণ, যে ভক্তবাৎসল্য গুণের অভাব স্বীকৃত হইলে শ্রীভগবানের যাবতীয় গুণ সকল শ্রীহীন হইয়া পড়ে, শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ দর্শনাদি শাস্ত্র সিদ্ধান্ত দ্বারা সংস্থাপিত শ্রীভগবন্মহিমাগ্রণী যে ভক্তবাৎসল্য গুণটির মহিমাতিশয়ে বিষমতারহিত সর্ব্বত্র সমদর্শন শ্রীভগবান্‌ও ভক্ত-পক্ষপাতিত্বরূপ পরম মধুরতা নিরন্তর স্বীকার করিতেছেন, এমন যে ভক্ত-বাৎসল্য গুণ, সেই ভক্তবাৎসল্য গুণটিও যে পরম গুণের মহিমা বর্দ্ধন করিতেছে, সেই পরম গুণটির নামই "কৃতজ্ঞতা"।

শ্রীভগবান্ কৃতজ্ঞতা গুণে পরিপূর্ণ, সুতরাং মহতেরও পরম মহৎ, যাঁহা অপেক্ষা আর মহীয়ান্ কেহ নাই। কৃতজ্ঞতা গুণ হেতুই তাঁহার পরম মহত্ত্ব। আহা মরি মরি! জাতিতে রাক্ষসী, কর্ম্মেতে বালঘাতিনী, আচারে রুধিরাশনা পুতনাকেও যিনি মাতৃজনোচিত সদ্বেশ ধারণের গুণাভাস মাত্র গ্রহণ করিয়া পরম দুর্লভ সর্ব্বোর্দ্ধ পরমধাম শ্রীগোলকে মাতৃভাবময়ী ধাত্রীগতি দানে কৃতার্থ করিয়াছেন, ধন্য তাঁহার কৃতজ্ঞতা গুণ! তাই শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহার মহিমামৃত ধারা জীবের পাপতাপদগ্ধ হৃদয়ে অভিষেচন করিয়াই যেন আশার বীজ বপন করিতেছেন,—

"কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্
ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।"

ধন্য শ্রীভগবানের কৃতজ্ঞতাগুণ! অহো, এমন কৃতজ্ঞতা আর কাহার আছে? এমন কৃতজ্ঞতার মধুর মেঘমন্দ্রধ্বনি আর কাহার কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হওয়ার সম্ভব আছে?

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"
"তুলসীদলমাত্রেন জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥"
"কৃষ্ণকে তুলসী জল দেয় যেই জন।
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন॥"

লাভ করিয়া ভক্তের প্রেমসেবার অল্পমাত্রই গ্রহণ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে নিজ আত্মা পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়াও অতৃপ্ত হৃদয়ে "পরমকৃতজ্ঞতা" গুণে ভক্তবাৎসল্য প্রকটন করিয়া থাকেন,—"হা মদীয় সর্ব্বস্ব ভক্ত! আমি তোমাকে কি দিব? তুমি যে আমার নিকট নিজের জন্য কিছুই চাও না, কেবলমাত্র আমারই জন্য আমাকেই ভালবাসিতে চাও! তোমার এই নির্হেতু প্রীতির দানে আমার আত্মা দান করিয়াও আমি পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছি না।"

"নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্ব্বিনা।"

ভক্ত ভগবানের পরস্পর কৃতজ্ঞতার বিজয়দুন্দুভি ব্রজপুরেই বাদিত হইয়াছিল—

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥"

এমন বাজনা আর কোথাও বাজে না। তাই শ্রীঠাকুর নরোত্তম কলকণ্ঠে গান করিয়াছেন,—

"ব্রজপুর বনিতার চরণ আশ্রয় সার
কর মন একান্ত করিয়া।"

আহা! সেই গোপীপ্রেমকৃতজ্ঞ ব্রজরাখাল শ্রীমদনগোপাল শ্রীগোপীজন-বল্লভ, তাঁহার গোপীজনবল্লভত্ব কি চমৎকাররূপে জগতে প্রকটিত করিলেন! গোপীগুণে মুখরিত, গোপীরূপে সুশোভিত, গোপীভাবে বিভাবিত, গৌরাকৃতি শ্রীমদনগোপাল কি কৃতজ্ঞতাই দেখাইলেন! জয় গোপীপ্রেমকৃতজ্ঞ গোপীজনবল্লভ গৌরাকৃতি শ্রীমদনগোপালের জয়! জয় গৌর হরি!

তাই মনে হয়, শ্রীমদনগোপাল চরণারবিন্দ প্রেমসেবাকাঙ্ক্ষী সাধক ভক্তের শ্রীগুরু শ্রীবৈষ্ণব পাদপদ্মে কৃতজ্ঞতার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রধান কর্ত্তব্য। শ্রীভগবানের কারুণ্য প্রকটমূর্ত্তি শ্রীগুরুদেবের ও শ্রীবৈষ্ণব ঠাকুরের কৃপাবলেই জীবের শ্রীভগবদ্ভক্তিবীজ লাভ হয়। শ্রীভগবৎসাধনভজন, শাস্ত্রজ্ঞান, বিজ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতির শিক্ষালাভ ইঁহাদের নিকট হয়। ইঁহাদের করুণায়ই ঐ সকল ফলীভূত হয়। অথচ সাধন শিক্ষা করিয়া আমি সাধক হইলাম, শাস্ত্র-

জ্ঞানাদি লাভ করিয়া আমি জ্ঞানী পণ্ডিত হইলাম, আমি বিষয়ত্যাগী বৈরাগী হইলাম, আমার যশঃসৌরভে দিগন্ত সুরভিত হইয়া উঠিল, আমি গুরু হইলাম, উপদেষ্টা হইলাম, পণ্ডিত হইলাম, লোকজন আমাকে স্তবস্তুতি যশঃ মান অর্থাদি অর্পণ করিতে লাগিল, আমি সেই স্তব স্তুতি যশঃ মানাদি নিজেই বেশ উপভোগ করিতে লাগিলাম, কিন্তু যাঁহাদের করুণায় আমার এই সকল, তাঁহাদের নিকট ঐ লোকপ্রদত্ত স্তবস্তুতি আদির এক কণিকাও পাঠাইয়া দিলাম না, নিজেই সমস্ত উপভোগ করিতে থাকিলাম, এবং ক্রমশঃ সেই মদিরায় মত্ত হইয়া উঠিলাম। এমন অকৃতজ্ঞ হৃদয়ে কি ভগবতী ভক্তি বিরাজমানা হইতে পারেন? হইতে পারেন না। ইহাই আমার ক্ষুদ্র বিশ্বাস।

শ্রীগুরুবৈষ্ণব শ্রীভগবানের পাদপদ্মে কৃতজ্ঞতা শিক্ষা করিতে হইবে। সর্ব্ব-জগদ্‌গুরু শ্রীগৌরভক্তের মধুর চরিত্র অনুশীলন করিতে হইবে। শ্রীগৌরগোবিন্দ-পাদপদ্মৈকজীবাতু শ্রীগৌরভক্তের শ্রীচরণানুগত হইয়া তাঁহাদের চরিত্র অনুশীলন করিলে কোন শিক্ষার অভাব থাকে না। এই কৃতজ্ঞতাগুণের একটি দৃষ্টান্ত শ্রীগৌরভক্তের চরিত্র হইতে দিতেছি।

"এত কহি কহে প্রভু শুন সনাতন।
কৃষ্ণ বড় দয়াময় পতিত পাবন॥
মহা রৌরব হৈতে তোমা করিল উদ্ধার।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার॥
সনাতন কহে আমি কৃষ্ণ নাহি জানি।
আমার উদ্ধার হেতু তব কৃপা মানি॥"

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বলিতেছেন, "আমি কৃষ্ণ জানি না, কৃষ্ণ চিনি না, আমার উদ্ধারের কারণ বিমর্য্যাদ কারুণ্যঘন মূর্ত্তি তুমিই।" আহা মরি! কি গম্ভীরতায় পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতার রহস্যরস। ধন্য শ্রীগৌর, শ্রীগৌরভক্ত। এমন সুগভীর কৃতজ্ঞতা শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ ভিন্ন অন্য কোথায়ও সম্ভব, হয় কি? জয় গৌর, জয় গৌরভক্তবৃন্দ।

এই ক্ষুদ্র জীবনে অনেক বিশিষ্ট সাধু মহাপুরুষের শ্রীচরণরজে নিজেকে অভিষিক্ত করিয়াছি বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদিগের অলৌকিক শক্তির পরিচয়ও জীবনে বহুশঃ উপলব্ধি করিয়াছি। অনেক স্থলে তাঁহাদের দিব্য শক্তির

প্রভাবে কুতর্ককর্কশ কঙ্করময় পর্ব্বতায়মান গর্ব্বোন্নত মাদৃশ হতভাগ্যের হৃদয় শোধিত হইয়া তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম পরাগরাগে রঞ্জিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। তাঁহাদের পরমামৃতধারাতুল্য বিমল স্নেহাশীর্ব্বাদ সুরসরিৎ, মাদৃশ পুতিগন্ধপূর্ণ পাপপঙ্কিল হৃদয়কেও আপ্লাবিত করিয়াছে। তাঁহাদিগের স্নিগ্ধ কারুণ্যামৃত জ্যোৎস্না আমার হৃদয়গুহার অবিশ্বাস তমোরাশিকে বিদূরিত করিয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত সম্মার্গে বিচরণের যোগ্যতা দান করিয়া আমার অন্তরাত্মাকে কৃতার্থের পথে উন্নীত করিয়াছে। হায়, যাঁহাদের শ্রীচরণরজঃকণা-স্পর্শগুণে আজ আমি পরমামৃত আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান পথের অনুসন্ধান পাইয়া আনন্দে মত্তবৎ অধীর হইয়া বালসুলভ চপলতারই চরম নিদর্শন এই কোলাহল করিলাম সেই মূর্ত্তিমৎ ভগবৎপরমবিভূতিবিগ্রহ জ্ঞানদাতা সাধু মহাপুরুষগণের শ্রীচরণোদ্দেশে ভূয়োভূয়ঃ প্রণত হইতেছি। আজ তাঁহাদের পদোপান্তে হতভাগ্য আমি কি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিব? হায়, তাঁহাদের চরণোদ্দেশে আজ আমি কি দিব? আমার ত কিছুই নাই। যাহা আছে বলিয়া মনে করি সবই যে তাঁহাদেরই দেওয়া কৃপারসাঞ্জনে রঞ্জিত, তাঁহাদেরই করুণালতিকা প্রসূত। নির্হেতুকারুণ্যঘন বিগ্রহ তাঁহারা নিজেদেরই কারুণ্যপ্রসূত আমার এই সঙ্কলিত উপহার গ্রহণ করুন।

৺কাশীবাসী বেদান্তাধ্যাপক শিবতুল্য জ্ঞানদাতা গুরু শ্রীমৎ পরমানন্দ তীর্থ স্বামিমহারাজের কৃপাস্নেহাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। ৺হরিদ্বার-বাসী শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিরি মহারাজের সঙ্গলাভে বহু সদুপদেশ লাভ করিয়াছি। বৃন্দাবনবাসী (গুদড়ী বাবা) শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দাস মহারাজ ও শ্রীজগদীশ দাস মহারাজের পূত সঙ্গলাভে শ্রীকৃষ্ণভজনানন্দ রসের আস্বাদনে অভিমুখী হইতে চেষ্টা করিয়াছি। বৃন্দাবনস্থ কেওয়ারী বন নিবাসী শ্রীমৎ রামদাস কাটীয়া মহারাজের নিকট বহুবার কৃপাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছি। তাঁহারই ভজনাশ্রমের নিকট মদীয় শ্রীগুরুবিষ্ণুপাদের সন্ন্যাসাশ্রমের ভজন কুটীর। তখন শ্রীমৎ সন্তদাস জী মহারাজের আশ্রম প্রভৃতি কিছুই হয় নাই। তখন তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল তারাকিশোর বাবু। কাটীয়া বাবা আমাকে বালক জ্ঞানে "বাচ্চা" "ব্যাটা" ইত্যাদি সস্নেহে সম্বোধন করিতেন। তৎকালীন শ্রীবৃন্দাবনপ্রিয় বাঙ্গালী বৈষ্ণব মহাত্মাগণের শ্রীচরণ-

রজঃকণা লাভ করিয়া নিজেকে পরম কৃতার্থ বোধ করিতাম। বস্তুতঃ জীবনের দিকে যদি কিছু জীবনীয় পদার্থ থাকে তাহা একমাত্র তাদৃশ মহাপুরুষদিগের কৃপা প্রসূত ভিন্ন আর কিছুই নহে। পঁয়ত্রিশ বর্ষ কাল ব্যাপিয়া ব্রজবৃন্দাবন ভূমিতে শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞান পিপাসু হইয়া ভগবদ্‌ভজনদৈন্যের ঝুলি স্কন্ধে বহন করিয়া ব্রজবৃন্দাবনবাসী বহু মহাপুরুষের শ্রীচরণোপান্তে উপস্থিত হইয়াছি। তাঁহাদের শ্রীচরণকৃপালাভে কোথাও বঞ্চিত হই নাই, সর্ব্বদাই মহাপুরুষগণের কৃপা লাভ করিয়াছি। কিন্তু ঝুলি ত পূর্ণ হইল না, বুভুক্ষা ত মিটিতেছে না। হায় আজ আমি নিঃসম্বল! কোথায় তত্ত্বজ্ঞান! কোথায় ভগবদ্‌ভজন! কোথায় শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভক্তি? কোথায় সাধু মহাপুরুষের কৃপা লাভে আকুতি! হায়! কি হইল! আমার জীবনের চরম দশায় আমারই দুর্দ্দৈব সবই কি অপহরণ করিয়া আমাকে নিঃসম্বল করিয়া তুলিল! আমার যে কিছুই নাই, সব হারাইয়াছি। দম্ভ গর্ব্ব লাভ যশঃ প্রতিষ্ঠা লালসায় উন্মত্ত হইয়া নিজেই সাধু মহাপুরুষ সাজিবার লোভে হাতভাগ্য আমি মহাপুরুষ-কৃপামৃত হইতে বঞ্চিত হইতে বসিয়াছি। ভুবনপাবন ভগবজ্জন সাধু মহাপুরুষগণের প্রতি ঔদ্ধত্যময় অপরাধ জনিত দুর্দ্দশাগ্রস্ত এই অধমজনের এখন উপায় কি? উপায় একমাত্র তাঁহাদেরই নির্হেতু নিঃসীম করুণা। যদিও মহা-পুরুষদিগের করুণার প্রতি অবহেলা করিয়া করুণাকে মুহুর্মুহুঃ কদর্থিত করিয়া, আজ হতভাগ্য শেষ জীবনে মহাদুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া সাধন ভজন জ্ঞান বৈরাগ্য সম্পত্তিশূন্য নিঃসম্বল বহির্মুখ হইয়া মহদপরাধ জনিত দুর্ব্বার ফলভোগ করিতেছি, তথাপি **মহদ্‌গণের দীনজনপাবনী করুণার প্রতি আশা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এই আশাই আমার হতভাগ্য শেষ জীবনের সম্বল। নমো সদ্ভ্যো মহদ্‌ভ্যঃ।** একবার ৺পুরীধামে মহাত্মা শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রমে তদীয় শিষ্য শ্রীমৎ কুলদা ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত ভগবচ্চর্চ্চা প্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম, "আপনি ত মহাপুরুষের কৃপাপাত্র।" তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, "মহাপুরুষের কৃপা দেখিয়াছি বটে, কিন্তু পাত্র হই নাই।" তাই এখন আমার জীবনেও বেশ উপলব্ধি হইতেছে, মহাপুরুষগণের কৃপা অজস্র লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু দুর্দ্দৈবহত আমি তাঁহাদের কৃপার পাত্র হইতে চেষ্টা করি নাই। **স্বতন্ত্রেচ্ছ**

মহাপুরুষ ভগবদ্ভক্তগণই আমার মত দীনজনের পরম উপায়। তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মোদ্দেশে আমার সহস্র কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সাধু মহাপুরুষগণের অলৌকিক শক্তি জীবনে বহুশঃ সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছি, সাধারণ লোকে বা শাস্ত্রে যাহাকে সিদ্ধি বলে। সেই সমস্ত অলৌকিক চরিত্র বা প্রভাব এখানে কিছুই আমার বক্তব্য নহে। তাহা ব্যক্তি-গত অনুভব, সুতরাং সাধারণের নিকট তাহা ব্যক্ত করিয়া লোককে আকৃষ্ট করা আমার অভিপ্রেত নহে। যাবতীয় সিদ্ধির মধ্যে মহাপুরুষদিগের সেই সিদ্ধিই পরম সিদ্ধি, যাহা দ্বারা আধ্যাত্মিক পরমজ্ঞান লাভ করিয়া শ্রীভগবত্তত্ত্বোপলব্ধি হয়, যে সিদ্ধির প্রভাবে তাঁহারা ত্রিতাপদগ্ধ মায়া-প্রপীড়িত জীবনিচয়কে **জ্ঞানামৃত ধারায় অভিষিক্ত করিয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞান সাম্রাজ্য সিংহাসনে অধিষ্ঠাপিত করিয়া শ্রীভগবদ্ভক্তি মাধুর্য্য সম্পত্তির অধিকারী করিয়া তুলিতে পারেন; ইহাই সাধু মহাপুরুষের মহা-পুরুষত্ব।** তাঁহারা অধ্যাত্ম জ্ঞানামৃতের **ভাণ্ডার,** ভগবদ্ভক্তির **প্রস্রবণ,** ভগবৎপাদপদ্ম পীঠপরিসরে গমনেচ্ছু জীবের পক্ষে **ভগবানের আলোক,** জীবের উচ্ছৃঙ্খল মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়াদিকে সুশৃঙ্খলে রাখিবার **পরম আদর্শ।** ইহাই প্রকৃত **সাধুর সাধুত্ব।**

সাধুদিগের **সাধুত্ব** অনেক ক্ষেত্রে অস্মদাদির দুরধিগম্য। যাঁহারা ভাগ্য-বান্ তাঁহারাই দুরধিগম্যতার রহস্য ভেদ করিয়া পরম ফল লাভে কৃতার্থ হইতে সক্ষম হয়েন। আমার জীবনে ইহা মুহুর্মুহুঃ অনুভূত হইয়াছে। এ স্থলে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ৩০।৩২ বৎসর পূর্ব্বের কথা। আমি এক সময়ে নিয়মিত ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীমথুরাবাস সঙ্কল্প করিয়া মথুরায় কৃষ্ণগঙ্গা নামক যমুনাতীর্থের উপকূলে একটি আশ্রমে একমাস অবস্থান করি। সেই আশ্রমের অধ্যক্ষ একজন হিন্দুস্থানী বৃদ্ধ সাধু আমাকে অতিশয় স্নেহে সেই আশ্রমের একটি নির্জ্জন কুটীরীতে বাস করিতে দিয়াছিলেন। সেই নির্জ্জন কুটীরীর নিকটবর্ত্তী আর একটি কুটীরীতে একটি বৃদ্ধ পরমহংস থাকিতেন। তাঁহার সুশান্ত স্নিগ্ধ বদনখানিতে যেন সর্ব্বদাই প্রসন্নতার একটা বিমল মৃদু জ্যোৎস্নার রেখা অঙ্কিত থাকিত, তাঁহার পানে চাহিলে আমার অন্তরাত্মা পরম শীতল হইয়া উঠিত। আমি তাঁহাকে অতিশয়

শ্রদ্ধাভক্তির সহিত দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিতাম, "বাচ্চাকো পর কৃপা কীজিয়ে।" তিনি মৃদু মধুর হাস্য করিয়া বলিতেন, "কৃপা, কৃপা, ক্যা কৃপা, আচ্ছা দেখ্ যায়্গা।" যখনই আমি তাঁহাকে প্রণাম করিতাম তখনই তিনি ঐরূপ বলিতেন। কিছুদিন পরে আমার একটি অলক্ষিত ধারণা বদ্ধমূল হইল,—ইনি শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ। সেই আশ্রমে মধ্যে মধ্যে বহু সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী বৈষ্ণব প্রভৃতি আগমন করিয়া অবস্থান করিতেন। তখন চাতুর্ম্মাস্য ব্রত ছিল; হঠাৎ আমার শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধীয় চাতুর্ম্মাস্যব্রতধারী মুনিবৃন্দের কথা স্মরণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকটিও স্মরণ হইল—

"উচ্ছিষ্টলেপানন্বুমোদিতো দ্বিজৈঃ
সকৃৎস্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ।
এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতস
স্তদ্ধর্ম্ম এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে॥"

আমার চিত্ত সেই আশ্রমবাসী মহাপুরুষদিগের উচ্ছিষ্টলেপনাদি শুশ্রূষণ কার্য্যে অতিশয় ব্যগ্র হইল। আমি সেইদিন হইতে তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট পাত্রাদি অতি যত্নের সহিত গ্রহণ করিতাম এবং উচ্ছিষ্ট স্থানাদি লেপন মার্জ্জনা করিতাম। প্রথম প্রথম অনেক মহাত্মা একটু প্রতিবাদ করিলেন। আমি দণ্ডবৎ প্রণাম এবং কাতর প্রার্থনাদি দ্বারায় তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া কৃপাদেশ গ্রহণ করিলাম। এইরূপ করার ৪।৫ দিন পর একদিন তত্রত্য সাধুদিগের ভোজনাবশেষে যখন আমি তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করিয়া স্তূপ করিতেছিলাম, হঠাৎ আমার পশ্চাদ্‌ভাগে সেই পরমহংস মহোদয়কে অবস্থিত দেখিলাম। তিনি অতি মৃদুস্বরে বলিলেন "তোম্ য়্যায়্সা কাঁহা শিখ্ হ্যায় ?" আমি বলিলাম, "আপ্‌সব মহাত্মন্‌কো কৃপাগুরুই মুঝকো শিখ্‌লায়া হ্যায়।" পরমহংস মহারাজ বলিলেন, "ফের কৃপা, কৃপা; নেহি হ্যায়, সাধন সংস্কার তোম্‌কো শিখ্‌লায়া হ্যায়।" আমি বলিলাম, "হম্ য়্যায়সা সমঝ্‌তা হুঁ যো কুছ সৎসংস্কার হো ওহি সব মহাপুরুষকোই কৃপা প্রভাব হি হ্যায়।" আর কোনও কথা হইল না, পরমহংসজী খুব স্বল্পভাষী ছিলেন। তারপর দিন আশ্রমের অধ্যক্ষ আমাকে সাধুদিগের উচ্ছিষ্ট পত্র উঠাইতে নিষেধ করিলেন, আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা

করিলাম, তিনি উক্ত পরমহংস মহারাজের নিষেধ বলিলেন, এবং বলিলেন, "পরমহংস মহোদয় সামান্য মনুষ্য নহেন, অসাধারণ দৈব পুরুষ।" এই শব্দটি শ্রবণমাত্রেই কি জানি অপ্রত্যাশিত কি আকাঙ্ক্ষায় আমার হৃদয় নাচিয়া উঠিল, শরীর পুলকে কণ্টকিত ভাব ধারণ করিল, চক্ষুতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল, মনে কেমন একটা তীব্র আশার সঞ্চার হইল যেন মহাপুরুষের কৃপা আমার প্রতি বর্ষিত হইবে, আমার যেন শ্রীমথুরাবাস ব্রতনিয়ম সাফল্য-মণ্ডিত হইবে। আমি দৌড়িয়া গিয়া শ্রীল পরমহংস মহারাজের কুটীরের দ্বারে লুণ্ঠিতকলেবরে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম। কিয়ৎকাল পরই স্নিগ্ধ মধুর স্বর আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া আমাকে আনন্দলহরীতে নিমজ্জিত করিয়া দিল,—

"চক্রুঃ কৃপাং যদ্যপি তুল্যদর্শনাঃ
শুশ্রূষমানে মুনয়োঽল্পভাষিণি।"

আমি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পরমহংস মহোদয়ের চরণতলে লুণ্ঠিত হইলাম, ক্ষণকাল পরেই তাঁহার দীনপাবনী করুণাই তাঁহার আলিঙ্গন পাশে আমাকে আবদ্ধ করিয়া দিল, মনে হইতে লাগিল আমার মনুষ্য জীবন কৃতার্থ হইল। পরমহংস মহারাজ বলিলেন,—আজ হইতে তুমি আমাকে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা কিছু শুনাইবে। আমি কাতরভাবে জানাইলাম,—আমি অযোগ্য জ্ঞান-বিদ্যাহীন; কিন্তু পরমহংস মহারাজের অকুণ্ঠ কৃপা তাহাতে বারণ মানিল না, আমাকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইতেই হইল। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কালে শ্রীল পরমহংসদেবের অপূর্ব্বভাবাবেশ দর্শন করিতাম, অদ্ভুত প্রেমবিকার সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াপ্লুত হইয়া পড়িতাম, এক এক সময় 'কৃপা' 'কৃপা' শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক বিহ্বল হইয়া পড়িতাম। "লেও লেও ব্যাটা কৃপা লে লেও" বলিয়া তিনি আমার মস্তকে শ্রীচরণ ন্যস্ত করিতেন, মনে হইত আমি যেন অপাস্ত-কিল্বিষ হইয়াছি। একমাস পরে ব্রত পূর্ণ হওয়ায় পরমহংসজী আদেশ করিলেন,—বৃন্দাবন যাইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম সন্দর্শন করিয়া শ্রীগুরু-আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া গোবর্দ্ধন তীর্থে যাইয়া এক বৎসর মৌন ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক নির্জ্জনে ভজন কর এবং শ্রীমদ্ভাগবত আস্বাদন কর, কৃপা, কৃপা। তাঁহারই কৃপাদেশ গ্রহণ করিয়া গোবর্দ্ধন তীর্থে এক বৎসর পরমানন্দেই ছিলাম। কি পাইয়াছি?

কৃপা নিশ্চয়ই পাইয়াছি, হতভাগ্য আমি কৃপা রাখিতে পারি নাই। পরমহংস মহারাজের নাম ছিল দেবগিরি মুনি। জানিয়াছিলাম ইনি ৺কাশীস্থ প্রসিদ্ধ ৺ভাস্করানন্দ স্বামীজির গুরুভ্রাতা।

আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ প্রায়। পরম কল্যাণাস্পদ মদীয় স্নেহপ্রতিম ৺নবদ্বীপ রামসীতাপাড়াস্থিত লীলাবতী ভক্তিশাস্ত্রপীঠ নামক বিদ্যালয়ের কাব্যব্যাকরণাধ্যাপক **শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ!** তথা তত্রত্য অন্যতর অধ্যাপক পরমকল্যাণগুণনিলয় মদীয় স্নেহপ্রতিম **শ্রীমান্ নলিনীকান্ত গোস্বামী তর্কতীর্থ!** বৎসযুগল! তোমাদিগের প্রতি আমার আশীর্ব্বাদ কি? আমার মনে হয় তোমাদিগকে শ্রীমদনগোপাল শ্রীপাদপদ্মে আমি সমর্পণ করিয়া দিয়াছি। আমি জ্ঞানভক্তিসম্পদ্দরিদ্র হইলেও আমার যথা সর্ব্বস্ব একমাত্র শ্রীমদনগোপাল শ্রীপাদনখজ্যোতি তোমাদের হৃৎকমলকে নিরন্তর উদ্ভাসিত করুন। তোমরা উভয়ই সদ্বংশজাত, উভয়ই সংশিক্ষিত এবং বিদ্বান, বাল্যকাল হইতে সর্ব্বস্ব ত্যাগ পূর্ব্বক কেবলমাত্র মদেকনিষ্ঠ হইয়া জ্ঞান সম্পত্তি লাভাকাঙ্ক্ষায় আমাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছ। হায়! আমি তোমাদিগকে কি দিব? আমি অধ্যাত্ম পথে নিঃসম্বল দরিদ্র, তথাপি তোমাদের মহান্ গুণ এবং প্রবল ঐকান্তিকতার সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভক্তিই তোমাদের সর্ব্বপ্রকার জীবন প্রবাহের পূরবর্ত্তিনী হইয়া শ্রীমদনগোপাল শ্রীপাদপদ্মের সন্তোষ বিধান করুক। **শ্রীরাধিকানাথ মদন-গোপাল তোমাদের পরম মঙ্গল বিধান করুন।**

আমি সর্ব্বতঃ অযোগ্য হইলেও কৃতিমান্ সদ্গুণসম্পন্ন উদারচেতা যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞান এবং ভগবদ্ভজনপিপাসু হইয়া আমাকে নিরতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি করেন সেই শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশতিলক শ্রীমান্ যদুগোপাল গোস্বামী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, মদেকনিষ্ঠ শ্রীমান্ গৌরগোপাল গোস্বামী কাব্যতীর্থ ভাগবত শাস্ত্রী, শ্রীমদদ্বৈতবংশাবতংস শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী কাব্যবিনোদ, শ্রীমান্ নবকুমার গোস্বামী কাব্যতীর্থ, শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী কাব্যতীর্থ, শ্রীমান্ প্রাণকৃষ্ণ কাব্যব্যাকণতীর্থ, শ্রীমান্ গোপালচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীমদ্বৈতবংশভূষণ শ্রীমান্ রামগোপাল গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তি জননীর সুসন্তান মদীয়ান্তেবাসী

বিদ্যার্থীদিগকে শুভ স্নেহাশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীমদনগোপাল মঙ্গল বিধান করুন। অন্যান্য যাঁহারা মাদৃশ দীনজনের প্রতি স্নেহানুরক্ত শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন সহৃদয় জন, আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি।

পরিশেষে শ্রীনবদ্বীপ ধাম নিবাসী মদীয় পরমসুহৃৎ অকৃত্রিম নির্হেতু কৃপা স্নেহ ক্ষমাদি অশেষ সদ্‌গুণালঙ্কৃত পরম ভাগবত সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীল হরিদাস গোস্বামী মহোদয়ের নিকট আমি অশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে চিরবদ্ধ। এই মহাপুরুষের মহত্ত্ব মাদৃশ জনকে সর্ব্বদাই অভিভূত করিয়াই যেন রাখে ইহাই শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা।

মদীয় স্নেহাবদ্ধহৃদয় শ্রীল নৃত্যগোপাল গোস্বামী মহোদয়ের স্নেহ পাশে আমি চির ঋণী। যাঁহাদের শুভবাসনায় প্রেরণায় আমার এই লেখনীর নর্ত্তন, শ্রীমদনগোপাল তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করুন।

ওঁ শ্রীমদ্ রাধিকানন্দ রাধিকানাথের সন্ন্যাস বিগ্রহের শ্রীপাদ-পদ্মোদ্দেশে মদীয় যাবতীয় কৃতি সমর্পিত হইয়া তাঁহারই সন্তোষ বিধান করুক। ওঁ শ্রীগুরুবিষ্ণুপাদেভ্যো নমো নমঃ।

সমাপ্তম্

শুদ্ধিপত্র

			শুদ্ধ	অশুদ্ধ
৭ম	পৃষ্ঠা	২১শ লাইনে	মহাবিপদে	মহা বিপদ
	”	২৬শ লাইনে	অন্তস্তল	অন্তস্থল
৬০	”	২২শ লাইনে	বলিলেন	ববিলেন
৬৬	”	৪র্থ লাইনে	পারমার্থিক	পরমার্থিক
৮৭	”	২৩শ লাইনে	করযোরে	করজোরে
৮৭	”	পাদ টীকা	ওপসানযাতি	ওপসানাযাতি
৮৮	”	১৪ লাইনে	যত	যত
৯৬	”	২৩শ লাইনে	গাত্রোত্থান	গাত্রোত্তান
৯৮	”	২য় লাইনে	করিতেছিল	করিতেছিলেন
১১৪	”	পাদটীকা ৯ লাইনে	বস্তুভিঃ	বস্তুতি
১২১	“	২য় লাইনে	নির্হেতুঃ	নির্হেতু
১২৭	“	৮ লাইনে	শ্রেয়ঃ কৈরব	শ্রেয়কৈব
১৩৬	”	১৩শ লাইনে	যাথার্থ	যথার্থ